প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাংলা **স্নাতক পাঠক্রম (সাবসিডিয়ারি)**

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
SBG ঃ 01 ঃ 1-5

গ্রন্থনা

পর্যায় 1 ☐ ড. সুকুমার দেব
পর্যায় 2 ☐ ড. সুকুমার দেব
পর্যায় 3 ☐ ড. দিলীপকুমার নন্দী
পর্যায় 4 ☐ অধ্যাপক দেবকুমার বসু
পর্যায় 5 ☐ ড. জীবেন্দু রায়
অধ্যাপিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলন ও সম্পাদনা
বাংলা স্নাতক বিষয় সমিতি'র পক্ষে
অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী
ড. শক্তিনাথ ঝা
ড. বাণীমঞ্জরী দাস
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল
আব্দুল কাফি ও
ড. মননকুমার মণ্ডল

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা ঃ ড. মননকুমার মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SBG—1

(স্নাতক পাঠক্রম—সাবসিডিয়ারি—বাংলা)

পর্যায় 1

একক 1 ❑ বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাংলা ভাষার উদ্ভব 7-14

একক 2 ❑ বাঙালির লেখা সংস্কৃত—অপভ্রংশ কবিতা ও চর্যাপদ 15-26

একক 3 ❑ তুর্কী আক্রমণ—বিজয় ও বাঙালির সমাজজীবন ও সাহিত্যে তার ফলাফল 27-31

একক 4 ❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ইসলামি সাহিত্য—'ইউসুফ-জোলেখা' 32-42

একক 5 ❑ চণ্ডীদাস সমস্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস 43-57

পর্যায় 2

একক 6 ❑ অনুবাদ সাহিত্য 58-73

একক 7 ❑ মঙ্গলকাব্যধারা 74-95

একক 8 ❑ চৈতন্যদেব—জীবনীসাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলি 96-113

একক 9 ❑ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি—ভারতচন্দ্র রায় শাক্ত পদাবলি—কবিগান 114-133

পর্যায় 3

একক 10 ❑ আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্য 134-156

একক 11 ❑ যুগসন্ধির কবি ও কাব্য 157-165

একক 12 ❑ আধুনিক বাংলা কাব্য 166-180

একক 13 ❑ নাট্যমঞ্চ ও নাটক 181-206

পর্যায় 4

একক 14 ❑ উপন্যাস—সূচনা-প্রতিষ্ঠা 207-225

একক 15 ❑ রবীন্দ্রনাথ 226-241

একক 16 ❑ রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র উত্তর বাংলা সাহিত্য 242-260

একক 17 ❑ স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর 261-265

পর্যায় 5

একক 18 ❑ বাংলা ভাষার বিবর্তন 266-275

একক 19 ❑ আধুনিক বাংলা উপভাষা 276-282

একক 20 ❑ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা 283-286

একক 21 ❑ শব্দার্থতত্ত্ব 287-298

একক 22 ❑ বাংলা শব্দভাণ্ডার 299-311

একক 1 ❑ বাঙালি জাতির উদ্ভব বাংলা ভাষার উদ্ভব

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য
1.2 প্রস্তাবনা
1.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস
1.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
1.5 অনুশীলনী 1
1.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ বাংলা ভাষার উদ্ভব
1.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
1.8 অনুশীলনী 2
1.9 উত্তর সংকেত
1.10 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে পাঠ করলে আপনি বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের মতামত জানতে পারবেন এবং বাংলা ভাষা কিভাবে সৃষ্টি হ'ল তার রূপ-রেখাটি স্পষ্ট ধরতে পারবেন।

1.2 প্রস্তাবনা

এই একক পাঠে বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিক, গবেষক ও ভাষাবিদ্‌গণের মূল্যবান তথ্যাদি জেনে উভয় বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হবে তার সাহায্যে আপনি দু'টি বিষয়েই নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

1.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে বাঙালি জাতির বাসস্থানের সীমারেখা নিম্নরূপ চিহ্নিত করেছেন—

উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য, উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারকা পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণসমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্ঝর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এই ভূখণ্ডেই ঐতিহাসিকগণের মতে বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং কর্ম-ধর্ম-নর্মভূমি।

গবেষক ও বিশিষ্ট সমালোচকের বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি, শুধু পশ্চিমবাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই বাঙালি জাতির বসবাস নয়। এই দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড়; বিহারের পূর্ণিয়া, মানভুম, সিংভুম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলও প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইতিহাসের গতিপথে বহুবার রাজনৈতিক কারণে বাংলার সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। সুপ্রাচীন এই দেশের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত, বৈদিক ধর্মসূত্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। আর্যভূমির প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত বঙ্গভূমির প্রাচীনতম স্বীকৃতি রয়েছে 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। আর্যদের গ্রন্থে ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটি আছে। 'বঙ্গ' শব্দটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে এই শব্দটির মূলে ছিল চীন-তিব্বতীগোষ্ঠীর শব্দ এবং শব্দটির 'অং' অংশের সঙ্গে গঙ্গা, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদী নামের 'অং' অংশের মিল দেখে অনুমান ভিত্তিক 'বঙ্গ' শব্দের মৌলিক অর্থ 'জলাভূমি' ধরেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে মৌলিক অর্থটির সামঞ্জস্য আছে। 'বঙ্গ' শব্দ ঋগ্‌বেদে নেই—আছে 'ঐতরেয় আরণ্য'কে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশের নাম জাতিনাম থেকে এসেছে। যেমন 'বঙ্গ' থেকে 'বঙ্গদেশ' 'বগধ' থেকে 'মগধ' হয়েছে। অস্ট্রিক শ্রেণীভুক্ত কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল এদেশে। এদের প্রিয় দেবতার নাম 'বোঙ্গা'। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই 'বোঙ্গা' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' শব্দের উদ্ভব। 'বঙ্গ' শব্দজাত বিশেষণরূপে 'বঙ্গাল' শব্দটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। অনেকের ধারণা 'বঙ্গ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, এর সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে 'বঙ্গাল' হয়েছে। নদীমাতৃক, কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে নদী ও সমুদ্রের জল যাতে জমির ধান নষ্ট করতে না পারে তার জন্য বড় বড় 'আল' বা বাঁধ দেওয়া হ'ত। এই কারণেই বঙ্গ + আল = 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' হয়েছে। কিন্তু ড. সুকুমার সেন 'বঙ্গাল' শব্দটিকে অর্বাচীন বলে চিহ্নিত করে 'রাখাল' ' গোয়াল' ' ঘোষাল' 'সাঁওতাল' ইত্যাদির মত 'পাল' অন্তক সমাস নিষ্পন্ন শব্দের তদ্ভব রূপ হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্রাচীন বঙ্গদেশের নানা অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন উত্তরবঙ্গ-পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণবঙ্গ -সমতট ও হরিকেল এবং পূর্ববঙ্গ বঙ্গালা। উত্তরপ্রদেশের এক গুহালিপিতে 'বঙ্গ পাল' অধিচ্ছত্রার রাজারূপে পাওয়া যায়। 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে 'গৌড় বঙ্গাল' কথাটির উল্লেখ আছে। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে' লিখিত আছে— 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ। তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি'। এই সমস্ত স্থানে তীর্থ যাত্রা ছাড়া গমন করতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। বিজয়ী আর্যজাতি এই সব অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্কে নানা কটূক্তি করেছে। জৈনগ্রন্থে এমনকী মহাভারতেও এরূপ ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখা যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশ ও সেন-বর্মণ রাজবংশের কালে রচিত সাহিত্য, শিলালিপি ও সরকারি প্রমাণপত্রে 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। মোগল আমলে 'বঙ্গ'-পৃথক সুবা রূপে চিহ্নিত হয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'বঙ্গাল' শব্দের উল্লেখ আছে। পালবংশের রাজত্বকালে বাঙালি জাতি পৃথক জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা হ'ল : নৃতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালি, আর্য ব্যতিরিক্ত অস্ট্রিয়, কোল, মোঙ্গল রক্তপ্রবাহের বিচিত্র সংকর। ফলে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও প্রত্যন্তবাসী—'বঙ্গে'র জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা আর্য সংস্কৃতিকে

পরিবর্তিত করে এক 'মিশ্র সংস্কৃতি' গড়ে তোলে। এই সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই 'বঙ্গ' 'গৌড়' 'বঙ্গাল' নামে ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই বাঙালি জাতিরূপে চিহ্নিত এবং মিশ্র শোণিত বাঙালি জাতি আপন স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হ'য়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

1.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি আলোচ্য অংশে—এ সম্পর্কে মুল তথ্যাদি কি আছে।

মূলপাঠে বাঙালি জাতির বাসস্থানের ভৌগোলিক বিবরণ আছে। এ সম্পর্কে গবেষকদের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। উত্তরে হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাঙালির ধর্ম-কর্ম ধারা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবাংলা ও অধুনা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিহার, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলও বাঙালি জাতির কর্মধারার সাক্ষ্য বহন করছে। এই সব অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সীমানা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে বাংলাদেশের নাম পাওয়া যায়। 'বঙ্গ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। 'বঙ্গ' শব্দজাত—'বঙ্গাল' শব্দের অর্থও নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলার জনজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধান করলে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা হ'ল আর্য-জাতি ভিন্ন দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণেই আদি বাঙালি জাতির উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি—মিশ্র জাতি।

1.5 অনুশীলনী 1

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর দানের পর 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. 'বঙ্গ' শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষকদের মতামত আলোচনা করুন।
2. নিম্নের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে (✓) টিক চিহ্ন দিন এবং এককের শেষে দেওয়া 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

   (ক) কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে?

   (1) আর্য ও অনার্য জাতির মিশ্রণে

   (2) আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মিলনে

   (3) দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণে

   (খ) বাঙালি জাতিকে কি জাতীয় বলে চিহ্নিত করা যায়? সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন।

   (1) মিশ্র জাতি

   (2) মৌলিক বা অবিমিশ্র জাতি

(গ) বাঙালি জাতি পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে—
   (1) মোগল আমলে
   (2) সেন রাজাদের সময়
   (3) পাল রাজত্বকালে
   (4) গুপ্তযুগে

3. নিম্নের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।
   (ক) 'বঙ্গ'কে পৃথক সুবারূপে চিহ্নিত করা যায়..................।
   (খ) 'বঙ্গাল' শব্দটির উল্লেখ আছে.......................।
   (গ) 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক.................।
   (ঘ) 'গৌড়-বঙ্গাল' কথাটির উল্লেখ.......................... গ্রন্থে আছে।

4. নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন। উত্তর শেষে এই এককের 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

   (ক) 'বোঙ্গা দেবতা' প্রিয় ছিল—
   (1) আর্য জাতির
   (2) দ্রাবিড় জাতির
   (3) অস্ট্রিক জাতির

   (খ) 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়—
   (1) একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে
   (2) মধ্যযুগে
   (3) আধুনিক কালে

   (গ) 'বঙ্গপাল' নামটি পাওয়া যায়—
   (1) অজন্তায়
   (2) উত্তরপ্রদেশের এক গুহালিপিতে
   (3) বৌদ্ধবিহারে

1.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষার উৎস ও যুগবিভাগ

সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত সমস্ত ভাষাকে যে কয়েকটি ভাষাবংশে বর্গীকৃত (Classification) করা হয়েছে তাদের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য-ভাষাবংশটি নানা কারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। তবে বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষা-বংশ থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই জন্ম নেয়নি। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দশটি শাখায় ভাগ হ'য়ে যায়, তাদের মধ্যে 'আর্য' নামে নিজেদের অভিহিত করে ইন্দো-ইরানীর ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি আবার দুটি শাখায় ভাগ হ'য়ে যায়—(1) ইরানীয় এবং (2) ভারতীয়। ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ

করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ। সেই দিন থেকে ভারতীয় আর্য ভাষার সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্য ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করে চলেছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের এই বিবর্তনের স্তরভেদকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়।

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (O.I.A.) আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ — ৬০০ খ্রিঃ পূঃ

(2) মধ্য ভারতীয় আর্য (M.I.A.) আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ—৯০০ খ্রিঃ

(3) নব্য ভারতীয় আর্য (N.I.A.) আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ—আধুনিক কাল পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল। (1) সাহিত্যিক বা ছান্দস্ ভাষা এবং (2) কথ্যভাষা। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক রূপ দেখা যায়। সেগুলি হলো—(ক) প্রাচ্য, (খ) উদীচ্য, (গ) মধ্যদেশীয়, (ঘ) দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে সাধারণ পরিবর্তন লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল, তখন থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হ'ল। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে প্রাকৃতের এই কথ্য উপভাষাগুলির জন্ম অনুমান করা হয়। এই ভাবে (ক) প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত এবং প্রাচ্য-মধ্যাপ্রাকৃত। (খ) উদীচ্য থেকে উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃত। (গ) মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত।

প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন প্রবেশ করল, তখন মূলত এই চার রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হ'ল। যেমন

(ক) উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে পৈশাচী প্রাকৃত। (খ) পশ্চিমা বা দক্ষিণ পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রিক প্রাকৃত। (গ) প্রাচ্যা প্রাকৃত থেকে—মাগধী প্রাকৃত। (ঘ) প্রাচ্য-মধ্যাপ্রাকৃত থেকে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত। পৈশাচী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত।

প্রাকৃতের তৃতীয় স্তরে এই সব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় প্রাকৃতের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হল। এই অপভ্রংশের শেষ স্তরে এলো অবহট্‌ঠ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে সেই স্তরের অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের জন্ম। এ ভাবেই মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের পর ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল। সময়কাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ। এই সময় এক একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করল। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি ভাষার জন্ম হ'ল।

সাধারণের ধারণা হ'ল সংস্কৃত থেকে বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষার জন্ম। এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ সংস্কৃত হ'ল বৈদিকের পরবর্তী একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ভাষার বিভিন্ন কথ্য রূপকে অবলম্বন করে বৈয়াকরণ পাণিনি যে শিষ্টরূপ নির্দিষ্ট করেন, সেই শিষ্ট বা সংস্কৃত রূপটিই 'সংস্কৃত' ভাষা নামে পরিচিত। ফলে কথ্যভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয়নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্মও হয়নি। বস্তুত কথ্য বৈদিকের বিবর্তন ধারার মধ্যবর্তী স্তর হয়ে বাংলা প্রভৃতি আর্য-ভাষাগুলির জন্ম। সুতরাং বাংলা ভাষার অব্যবহিত জন্ম-উৎস কথ্য বৈদিক ভাষাকে বলা যায় না। ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠই হ'ল নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অব্যবহিত উৎস। এর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

তবে বাংলা ভাষার উৎস যে স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে লিখিত তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্ম-উৎসকে নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

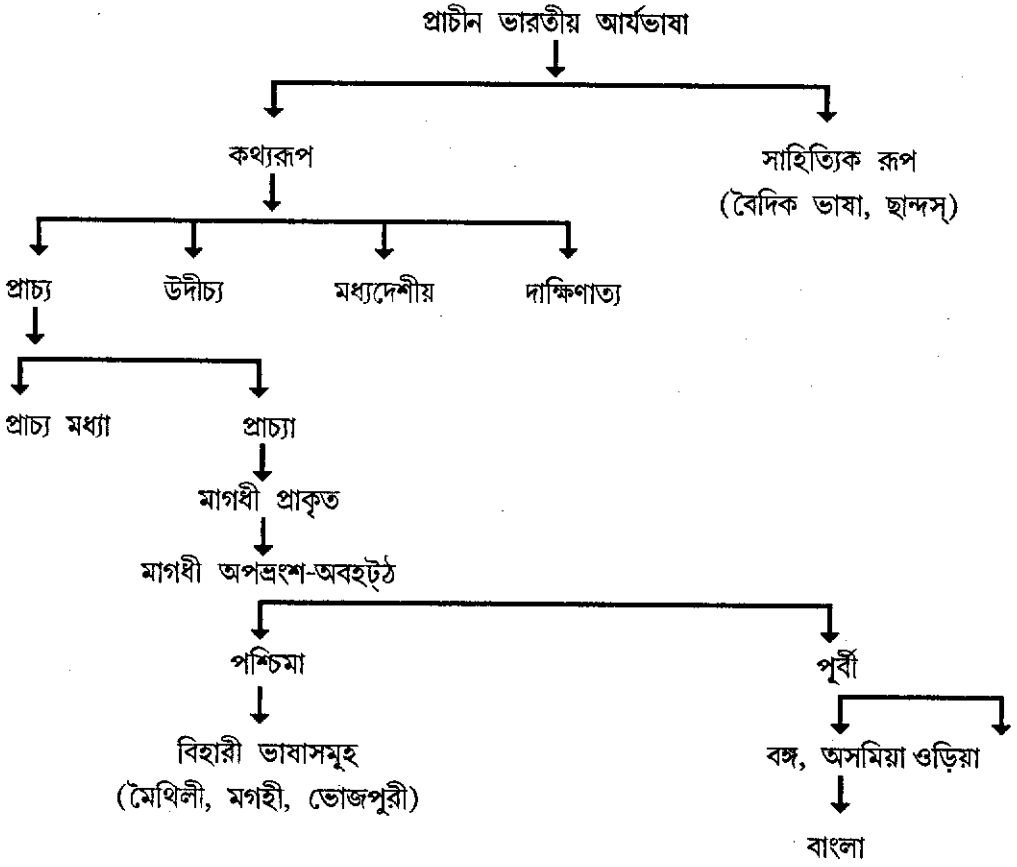

1.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা—বাংলাভাষা। এই ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—নানা বিবর্তনের পথ ধরে মাগধী-অপভ্রংশের পূর্বধারা অর্থাৎ 'পূর্ব মাগধী' থেকেই নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এই ভাষা পালবংশীয় রাজাদের আমলেই সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরে পৌঁছায়। এই স্তরই হ'ল—নন ভারতীয় আর্যভাষার উৎস।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা ১০টি শাখায় ভাগ হয়। এদের মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে চিহ্নিত করে। এরা দুটি ভাগে বিভক্ত। একটির নাম 'ভারতীয় আর্য'। এই 'ভারতীয় আর্য' উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই আর্য ভাষা নানা পরিবর্তনের

পথ ধরে এগিয়ে চলে। বিবর্তনের স্তর অনুসারে (১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য, (২) মধ্য ভারতীয় আর্য, (৩) নব্য ভারতীয় আর্য—এই তিনটি যুগে আর্য ভাষা বিভক্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় সাহিত্যিক ও কথ্য—এই রূপ পাওয়া যায়। কথ্য ভাষা চারটি আঞ্চলিক রূপ নেয়। লোকমুখে এই ভাষা প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করে। এই প্রাকৃত ভাষা প্রথমে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা এবং দ্বিতীয় স্তরে সাহিত্যিক ভাষার জন্ম দেয়। পরে প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম। এই স্তরের মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

1.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান। ১৪ পৃষ্ঠার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি ভাষা।	☐	☐
(খ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সময় আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূর্ব—৯০০ খ্রিস্টাব্দ।	☐	☐
(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুই রূপ।	☐	☐
(ঘ) প্রাচ্য প্রাকৃত থেকে মাগধী প্রাকৃতের জন্ম।	☐	☐
(ঙ) ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ।	☐	☐
(চ) বাংলা ভাষার উদ্ভব শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে।	☐	☐

2. নিম্নের কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য তিনটি উত্তর থেকে বেছে টিক ( ) চিহ্ন দিন। উত্তর করার পর এককের শেষে দেওয়া ১৪ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে জন্ম—
1. মাগধী প্রাকৃত
2. পৈশাচী প্রাকৃত
3. শৌরসেনী প্রাকৃত

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাল—
1. আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ
2. আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূর্ব—৯০০ খ্রিস্টাব্দ
3. আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূর্ব—৬০০ খ্রিঃ পূর্ব

(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'কথ্য ভাষার' আঞ্চলিক রূপ ছিল—
1. দু'টি
2. তিনটি
3. চারটি

(ঘ) বাংলা ভাষার জন্ম—
1. পৈশাচী প্রাকৃত থেকে
2. মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে
3. মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে

1.9 উত্তর সংকেত

1.5 অনুশীলনী 1

1. কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির প্রিয় দেবতার নাম—'বোঙ্গা'। ঐতিহাসিকদের মতে এই 'বোঙ্গা' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' শব্দের উদ্ভব।
2. (ক) 1, (খ) 1, (গ) 3।
3. (ক) মোগল আমলে।

   (খ) আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।

   (গ) ড. নীহাররঞ্জন রায়।

   (ঘ) মান মোল্লাস গ্রন্থে।
4. (ক) 3, (খ) 1, (গ) 2

1.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।
2. (ক) 2, (খ) 3, (গ) 3।

1.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন।
2. ভাষার ইতিবৃত্ত : ড. সুকুমার সেন।
3. বাঙলা ভাষা পরিক্রমা : পরেশচন্দ্র মজুমদার।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : ড. ভূদেব চৌধুরী।
5. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
6. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
7. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 2 ❑ বাঙালির লেখা সংস্কৃত—অপভ্রংশ কবিতা ও চর্যাপদ

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য
2.2 প্রস্তাবনা
2.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
2.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
2.5 অনুশীলনী 1
2.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
2.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
2.8 অনুশীলনী 2
2.9 উত্তর সংকেত
2.10 গ্রন্থপঞ্জি

2.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙালি সংস্কৃত ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় যা যা লিখেছিলেন তার পরিচয় পাবেন। এই সব লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন।

2.2 প্রস্তাবনা

প্রাক্ তুর্কী বিজয় যুগে সংস্কৃতে লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, শরণ-ধোয়ী-গোবর্ধন—উমাপতি ধরের কাব্য-কবিতা, জয়দেবের গীত গোবিন্দ, প্রাকৃত পৈঙ্গল, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃত ইত্যাদির মধ্যে আর্য ব্রাহ্মণ্য ও অনার্য অব্রাহ্মণ্য—বাংলার এই পৃথক দুই ধারার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি বয়ে চলেছিল তার রূপরেখা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত প্রাকৃত পৈঙ্গলে বীর রসাত্মক ও প্রেমবিষয়ক ছড়ার মধ্যে ভাষামাধুর্য লক্ষণীয়। প্রেম ও প্রকৃতির একাত্মতায় সমৃদ্ধ। চর্যাপদে—রূপকের মোড়কে গীতিধর্মী মূর্ছনায় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধন সংগীতগুলি সমৃদ্ধ। ধর্মমত, সমাজজীবন চিত্র, সাহিত্যিক মূল্য, ভাষাগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চর্যাপদের নানাদিক উদঘাটিত হয়েছে।

2.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

আদিযুগে উন্মেষপর্বের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বাঙালির সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। এই সময় বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভব ঘটেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই ভাষাকে সাহিত্যরচনার উপযুক্ত ভাষা বলে গ্রহণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত উপরতলার মানুষ বিশেষ করে

রাজসভাকবি ও শিক্ষিত সমাজ ভাষ্যকেই উপযোগী মনে করেছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছিল—তা বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা শক্তিশালী হয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাসংগীত, অনুবাদসাহিত্য, সাধনগীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তবে এই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে বাঙালির লেখা সংস্কৃত-অপভ্রংশ রচনার অবদান রয়েছে। নিম্নে এই শ্রেণীর সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।

পাল-সেন বংশের রাজত্বকালে অনুশাসন ও স্তম্ভলিপিতে ছোট ছোট প্রশস্তিমূলক কবিতার সন্ধান মেলে। পাল রাজাদের আমলে বিশিষ্ট কবি অভিনন্দ দেবপালের সভাকবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে 'রামচরিত' লেখেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়, কবি হনুমানের মুখে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীও পাল রাজাদের সভাকবি ছিলেন। তিনিও 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় কাব্যিক সুষমা ও কলা-কৌশলের নিদর্শন আছে। রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের তথ্যাদি মিশ্রিত করে কাব্যের শ্লোকগুলি রচিত। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকগুলিতে কবির লেখনী-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধোয়ীর প্রধান কাব্য 'পবনদূত'। মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূতম্'-এর ছন্দ-আদর্শে এটি রচিত। এছাড়া কবির 20টি শ্লোক—শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ পাওয়া যায়।

উমাপতি ধর—তিন পুরুষ ধরে সেন রাজাদের রাজমন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর হাতে একাধিক রাজার প্রশস্তি প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববঙ্গে পলায়নের পর তিনি তুর্কী-রাজাদেরও স্তুতিমূলক শ্লোক রচনা করেছেন। শৃঙ্গাররসের বাড়াবাড়ি থাকলেও তাঁর লেখায় কবিচিত গুণাবলি দেখা যায়। শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি ধরের ৯১টি শ্লোক আছে। কাব্যসৃষ্টিতে কবির শব্দচেতনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়দেব—কবি জয়দেবের সঙ্গে সেন-রাজসভার নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' 24টি সংস্কৃত পদ—সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা গ্রথিত। রাধা-কৃষ্ণ-দূতী এই তিন পাত্র-পাত্রীর সংগীত-সংলাপে কাব্যখানি রচিত। প্রাচীন লোকপ্রচলিত নাট-গীতির আদর্শে এটি রচিত। জয়দেব সংস্কৃত কাব্য-ভাষাকে প্রাকৃত ছন্দের সাহায্য নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন। এছাড়া পদরন্ধের ক্ষেত্রেও কবি সংস্কৃত রীতির শ্লোকের বদলে বাঙলা ও অপভ্রংশের আদর্শে—কাব্যখানিতে ভিন্ন স্বাদ এনেছেন। তাঁর কাব্য—প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নব্য সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। অলৌকিক দেব-কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক প্রেমের সার্থক সমন্বয় এই কাব্যে আছে।—এই সমন্বয়ের ওপর দাঁড়িয়েই মধ্যযুগে গড়ে ওঠে মানবিক মূল্যবোধ। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' জয়দেবের ৩১টি শ্লোক যুক্ত আছে।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়— এই গ্রন্থে ১১১ জন কবির ৫২৫ টি শ্লোক আছে। সর্বভারতীয় কবিদের সঙ্গে বহু বাঙালি কবির কবিতাও এতে সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে গৌড়-অভিনন্দ, ধর্মকর, বিনয়দেব, শুভংকর প্রমুখ কবি আছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবনছন্দের জীবন্ত চিত্র এতে আছে। এছাড়া 'ব্রজলীলা'কে কেন্দ্র করেও কয়েকটি শ্লোক রচিত হয়েছে—যার মধ্যে পরবর্তী বৈষ্ণব-কাব্যধারার সেতুসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সদুক্তিকর্ণামৃত—শ্রীধর দাস ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে এই শ্লোকগ্রন্থ সংকলন করেন। ৪৮৫ জন কবির লেখা

শ্লোক এতে আছে। মোট শ্লোকের সংখ্যা দুই হাজার তিনশ'র বেশি। এই সংকলনে ৮০ জন বাঙালি কবির কবিতা আছে। এঁদের মধ্যে মহানিধি কুমার, কঙ্ক দত্ত, ইন্দ্রদেব, শ্রীধর নন্দী, ঈশ্বর ভদ্র, বসুসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।—রাজসভার শৃঙ্গার রসের আধিক্য ও প্রশস্তির ভিড়ের মধ্যেও বাংলাদেশের বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও জীবনলীলার চিত্র সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কতকগুলি শ্লোকে বীররসের অভিসিঞ্চন আছে।

প্রাকৃত পৈঙ্গল—প্রাকৃত পৈঙ্গল ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ। ড. সুকুমার সেন এই গ্রন্থকে "মূলতঃ প্রাচীন বাঙালা অথবা বাঙালার ঠিক পূর্ববর্তী অপভ্রংশ" বলে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থটি চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সংকলিত হলেও এতে নবম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বহু কবিতাও আছে। বীররসের পাশাপাশি প্রেমের মধুররসের ধারাও বহমান।

প্রেম-বিষয়ক ছড়ার দৃষ্টান্ত—

"সোমহ কন্তা
দূরদিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলাএ।।"

(আমার সে কান্ত এখন দূরদিগন্তে, প্রাবৃট আসে, চিত্ত হয় চঞ্চল।)

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার পাশাপাশি বইটির একটি শ্লোকে হর-পার্বতীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পারিবারিক চিত্রও আছে। প্রেম ও প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধনে এবং ভাষামাধুর্যে কবিতাগুলি যেমন শ্রুতিমধুর তেমন হৃদয়স্পর্শী। এই গ্রন্থখানিই একমাত্র অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত। বাকি সব গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

2.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

সংস্কৃতে লেখা পাল রাজাদের সভাকবি অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণ গ্রন্থ অবলম্বনে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অভিনন্দের রামচরিত দেবী মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। তবে সে মাহাত্ম্য কীর্তন রামচন্দ্রের পূজার মাধ্যমে নয়—হনুমানের মুখে স্তবের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমকালের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কুড়িটি শ্লোকের সংকলন গ্রন্থ। ধোয়ীর 'পবনদূত'—কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের আদর্শে রচিত। চিত্র-সৌন্দর্য ও কল্পনামাধুর্যে গ্রন্থখানি ভরা। সেন রাজাদের নিয়ে উমাপতি ধর প্রশস্তি কাব্য রচনা করেছেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে লেখকের ৯১ টি শ্লোক আছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'—রাধা-কৃষ্ণ ও দূতী এই তিন পাত্র-পাত্রীর সংগীত-সংলাপে প্রাণবন্ত। রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নব্য সাহিত্যের সেতুবন্ধন করেছেন জয়দেব। অলৌকিক দেব কাহিনীকে কবি লৌকিক প্রেমগাথার সঙ্গে সার্থকভাবে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন। দুই ঐতিহ্যের সমন্বয়ে জয়দেবের সৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণীয়। 'কবিন্দ্রবচনসমুচ্চয়' 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-সংস্কৃত খণ্ড শ্লোকের প্রাচীন সংকলন গ্রন্থের দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবনছন্দের পাশাপাশি যুদ্ধাদির বর্ণনাও আছে। কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত শ্লোকগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' কবিতা সংকলনে বীররসের

পাশাপাশি প্রেমমাধুর্যও ছড়িয়ে আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে একটি শ্লোকে হর-পার্বতীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পারিবারিক চিত্রও আছে।

2.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের দেওয়া তথ্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) উমাপতি ধরের সদুক্তিকর্ণামৃতে ৯১টি শ্লোক আছে।	☐	☐
(খ) জয়দেবের সঙ্গে সেন রাজাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না।	☐	☐
(গ) জয়দেবের কাব্যখানি প্রাচীন নাট-গীতির আদর্শে রচিত।	☐	☐
(ঘ) প্রাচীনতার দিক থেকে শ্রীধর দাসের শ্লোক সংকলন গ্রন্থ প্রথম।	☐	☐
(ঙ) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে ১১১ জন কবির ৫২৫ টি শ্লোক আছে।	☐	☐
(চ) প্রাকৃত-পৈঙ্গল সংস্কৃত ভাষায় লেখা।	☐	☐

2. মূলপাঠ গভীরভাবে পাঠ করে সংক্ষেপে নিম্নের টীকাগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।
   প্রাকৃত-পৈঙ্গল, গীতগোবিন্দ, রামচরিত, সদুক্তিকর্ণামৃত।

2.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

ভূমিকা ঃ সাহিত্য গবেষকদের মতে শুধু বাংলা ভাষা নয়—সমগ্র পূর্ব ভারতের নব্য ভাষার প্রথম গ্রন্থ হ'ল—'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। আদিযুগের ধর্মপ্রধান বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ চিহ্নিত। বাংলা ভাষায় রচিত বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থাদির মধ্যে এটি যে প্রাচীনতম গ্রন্থ এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারে পুঁথি সংগ্রহশালায় তিনখানি দোঁহাগ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথির সঙ্গে টীকাকার মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকা ছিল। এই টীকার সাহায্যেই পরবর্তিকালে বৌদ্ধ-সহজিয়া-সিদ্ধাচার্যদের রহস্যময় ভাষায় লেখা পদগুলির গূঢ় অর্থ উদ্ধার কিছুটা সহজ হয়েছে।

১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে নিজের সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', সরহবজ্রের দোঁহা, কৃষ্ণাচার্যের দোঁহা এবং ডাকার্ণব—এই চারখানি পুঁথি একত্রে প্রকাশ করেন। তবে এই চারখানি গ্রন্থের মধ্যে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'-এর ভাষা প্রাচীনতম বাংলার নিদর্শনরূপে বিশিষ্ট ভাষাবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপর গ্রন্থগুলি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে রচিত।

গ্রন্থ-পরিচয় ঃ চর্যা সংগ্রহটিতে মোট ৫১টি পদ ছিল। তার মধ্যে মুণি দত্ত একটি পদের ব্যাখ্যা করেননি। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ অর্থাৎ

২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যা পদ পাওয়া যায়নি। আর ২৩ সংখ্যক পদের শেষাংশ খণ্ডিত। এর ফলে মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকা অনুসারে মোট ৫০ টি পদ-এর সাড়ে ছেঁচল্লিশটি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তিকালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থ থেকে টীকাকারের বাদ দেওয়া পদটির পরিচয় উদ্ধার করেন। তবে চর্যাপদের মুল পুঁথিতে ২৪ টি বিভিন্ন ভণিতায় লিখিত ৪৬.৫ পদের পরিচয় আমরা পাই। মোট ২৪ জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গেলেও ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে পদগুলির ভণিতা অনুযায়ী পদকর্তাকে চিহ্নিত করা সঠিক নয়। তাঁদের মতে কেউ কেউ গুরুর ভণিতা দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা'-এর যোগে। কতকগুলি স্পষ্টতই ছদ্মনাম বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কুক্কুরী; বীণা, তন্ত্রী, ডোম্বী, তাড়ক, কঙ্কণ, শবর ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তাড়ক, কঙ্কণ—অলংকারের নাম আর 'তন্ত্রী' অর্থাৎ 'তাঁতি' জাতি নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মোট যে ২৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে লুইপাদ দু'টি, ভুসুকুপাদ আটটি, কাহ্নপাদ তেরোটি, সরহপাদ চারটি এবং শান্তিদেব ও শহরপাদ দু'টি করে পদ রচনা করেছেন। অন্যান্য কবি-সাধকগণের একটি করে পদ আছে। তাঁদের কয়েকজনের নাম—বিরুআ, চাটিল, কামলি, কঙ্কণ, ডোম্বী, শবর প্রমুখ। মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে শান্তিদেব, ভুসুকু এবং রাউতু একই ব্যক্তি ছিলেন। ড. সুকুমার সেন লুইপাদ ও মীননাথকে একই ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বত থেকে তালপাতার পুঁথিতে কয়েকজন নূতন কবির চর্যাগীতি এবং চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের পরিচিত দু-একটি চর্যাগীতির পাঠান্তরও পেয়েছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের পুঁথিতে বিনয়শ্রী, সরুঅ, অবধূ—এই তিনজন নূতন কবির নাম পাওয়া যায়। তবে নবাবিষ্কৃত এই পদসমূহের ভাষা অর্বাচীন এবং প্রাচীন চর্যাপদের রূপ ও রূপকের অন্ধ অনুকরণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই পদগুলি প্রাচীন চর্যাগীতিকারদের পরবর্তিকালে রচিত।

চর্যার ভাষা ঃ চর্যাপদের ভাষারীতি রহস্যময়। গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত হ'লেও, আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এর রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সংকলনের প্রথম পদকর্তা 'লুইপাদ'—দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পদের ভাষা দেখেও মনে হয়, এ ভাষা দশম শতাব্দীর অথবা তার সামান্য পূর্ব সময়ের। মাগধী-অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার যে মুহূর্তে জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্তের অপরিণত ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণ সহজিয়াপন্থীদের জন্য এই পদগুলি লিখেছেন। চর্যাপদের ভাষার ভিত্তিমূলে মাগধী-অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীন বাংলা থাকলেও এতে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে চর্যাপদের বেশিরভাগ শব্দই যে মাগধী-অপভ্রংশজাত এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। শৌরসেনী-অপভ্রংশ ছিল সর্বভারতীয় গণ-সাহিত্য রচনার সাধারণ মাধ্যম। এই ধারার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই চর্যাপদের ভাষাতেও দেখা যায়। তবে চর্যার ভাষায় এমন কতকগুলি 'শব্দ' ও 'ব্যবহার' পাওয়া গেছে যার দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় এইসব 'শব্দ' ও 'ব্যবহার' একমাত্র বাংলা ভাষাতেই সম্ভব। এইজন্যই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষার 'আদিসুরী'—বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে চর্যার ভাষা 'বঙ্গালী' না 'রাঢ়ী' এ নিয়েও মতভেদ আছে। মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যার ৪৯ নং পদে—

"বাজনাবপাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ" চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের মহানদী বা 'পদ্মানদী'র আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। 'ভুসুকুপাদ'কে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া ভুসুকু'র একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির ওপরও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদ মূলত পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ 'রাঢ়ী' উপভাষার ওপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো—কতক অন্ধকার। কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। অর্থাৎ হেঁয়ালি ভাষা। কিন্তু কোথাও কোথাও টীকাতে 'সন্ধ্যা' ভাষা বলা হয়েছে। 'সন্ধ্যা' শব্দটি সম-ধ্যৈ ধাতু থেকে এসেছে—যার অর্থ—সম্যকরূপে ধ্যান করে বোঝা। দুর্বোধ্য-রহস্যময় হেঁয়ালি এই 'সন্ধ্যা ভাষা'র মর্মার্থ দুর্বোধ্যই থেকে যেত, যদি না মুণি দত্তের টীকা পাওয়া যেত। সহজিয়া বৌদ্ধদের বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রতিকূল শক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সহজিয়া বৌদ্ধদের গূঢ় ধর্মাচারকে বাঁচাতেই সিদ্ধাচার্যগণ এইরূপ অস্পষ্ট—কুহেলিকাচ্ছন্ন ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চর্যার ভাষাগত দিকটি অনুধাবনের জন্য নিম্নে ১৫ নং পদাংশ তুলে ধরা হ'ল।

"বাম দাহিন দোবাটা ছাড়ী শান্তি বুল থেউ সংকেলি উ
ঘটনাগুমা ঘড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাই উ।।"

[বাম-ডানের দুই পথই বাদ দিয়ে (সোজা পথে) শান্তি কেলি করে ফিরছে—এই পথে ঘাট-তৃণ-গুল্ম কিছুই নেই, চোখ বন্ধ করে সোজা চলে যাও।]

এই ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্যই উড়িয়া ও মৈথিল ভাষিগণ চর্যা সাহিত্যের দাবিদার হয়েছেন। তবে ভাষাবিদ্‌গণ তত্ত্ব-তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, চর্যাপদ বাংলার ও বাঙালির সম্পদ। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই।

ছন্দ ঃ চর্যাপদে মোটামুটি তিন রকমের ছন্দ পাওয়া যায়। অধিকাংশই ১৬ মাত্রার 'চৌ পাই' ছন্দে লেখা। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের আদি নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—

= – x x x x – x x – –
কাঅ/তরুবর/পঞ্চবি/ডাল।
– x x – – x x – – –
চঞ্চল/চীত্র/পইঠো/কাল।।   ১নং চর্যা
[x=১ মাত্রা;–= দুই মাত্রা বা দীর্ঘ মাত্রা]

পয়ার ছন্দের পূর্বে প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রা প্রধান পাদাকুলক ছন্দের নিদর্শন এটি। চর্যার সব পদই এই ছন্দে রচিত। এই ছন্দে প্রতিটি চরণে ১৬ মাত্রা থাকে। চর্যার প্রতিটি চরণ প্রধানত চারটি ভাগে বিন্যস্ত। মাত্রা প্রধান ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দে যখন অক্ষর প্রাধান্য পায়—তখনই ১৬ মাত্রার পরিবর্তে ১৪ অক্ষরের পয়ারের সৃষ্টি। এই জাতীয় পয়ারের উৎস চর্যাপদ।

ধর্মমত ঃ চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন-সংকেতই রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যখন নানা আবর্ত সৃষ্টি হয়, তখনই রহস্যময় সাধন পদ্ধতি মহাযান বৌদ্ধধর্ম সাধনার বিবর্তিত রূপ সহজযান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। হীনযানী দার্শনিক মতবাদ রক্ষণশীল ছিল। শূন্যতাময় নির্বাণ লাভ ছিল হীনযানীদের মূল লক্ষ্য। মহাযানী

সাধন পন্থার আদর্শ ছিল বুদ্ধত্ব লাভ অর্থাৎ বোধি-চিত্তের অধিকার লাভ। এই মতবাদে উদারতা ও ব্যক্তি প্রাধান্য দেখা যায়। মতবাদটি জনপ্রিয় হলেও এর মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার শিথিলতা দেখা দেওয়ায় মহাযান মতবাদ বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানের পরবর্তী স্তরটিই হ'ল সহজযান। বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্যপথ ধরে কায়া-সাধনার ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজিয়া কবিগণ বেদ-পুরাণ-ধর্মাচারের নিন্দা করলেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ধর্মমত-বিদ্বেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোথাও প্রকাশ পায়নি। কোনো কোনো পণ্ডিত চর্যাপদে তীব্র ধর্ম বিদ্বেষের উল্লেখ করে ১০ নং পদের—

"নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছই যাই সো ব্রাহ্মণ-নাড়িআ।" অংশটিতে

'নাড়িয়া' অর্থাৎ 'নেড়ে' শব্দটির মধ্যে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তবে সম্পূর্ণ পদটি গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায় কাহ্নপাদ এই পদটিতে আন্তর-সাধনার গভীর বাসনাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

লুইপাদের ২২ নং চর্যাপদে দেখা যায়—

"জাহের বাণ চিহ্নরূপ ণ জানী
সো কই সে আগম-বেএঁ বখানী।।"

("যার বর্ণ চিহ্ন কিছুই জানা যায় না, বেদ—আগম দ্বারা তার ব্যাখ্যা হবে কি করে?") এই পদেও বেদ-আগমের প্রতি উপেক্ষার চেয়ে কবির তন্ময়-মন্ময় চিত্তের অনির্বচনীয়তা বিশেষভাবে তুলে ধরার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় সহজযানী ভাবনায় পর-ধর্ম বিদ্বেষ কোথাও প্রকাশ পায়নি। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, আনন্দ-বেদনার তালে তালে বহমান বাস্তব জীবনের জরা-মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পথেরই পথিক। তবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাঁরা নির্বাণলাভের জন্য গূঢ়-তান্ত্রিক-আচার-আচরণের কথাই চর্যাপদে বলেছেন।

চর্যার সাহিত্যিক রূপরেখা ঃ ভাব জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন সাধনই প্রকৃত সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। চর্যা গীতিকারগণও তাঁদের অন্তরের গভীর উপলব্ধিজাত সম্পদকে সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। সহজিয়া সাধকগণ সাধন-ভজনের তত্ত্বকথা বললেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। চর্যায় তত্ত্বের কূল ছাপিয়ে তত্ত্বগত উপলব্ধির আনন্দই প্রাধান্য পেয়েছে। লোক-জীবনের সাধারণ-ভাষায় সমাজচিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে সহজিয়া তত্ত্বকে সার্বিক রূপ দিয়েছেন। এক কথায় চর্যাপদে সত্য ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। ভাষা, শব্দ ও রূপ নির্মিতিতে চর্যাকারগণ দক্ষ ছিলেন। দুরূহ দার্শনিকতা ও রহস্যময়-আচার-আচরণকে তাঁরা কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করেছেন। ভুসুকু পাদের—

"ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।।"

২৭ নং চর্যার এই পদাংশে মহাখুসলীলার যে বার্তা ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃত

সাহিত্যের পরিবেশ—পরিমণ্ডল। সিদ্ধাচার্যগণ তন্ময়চিত্তের অনুভূতিকে সকলের গ্রহণীয় করে তুলতেই বাস্তব জীবনের পটভূমিকে গ্রহণ করেছেন। স্বচ্ছ-স্বাভাবিক জীবনের ভাষায় ডোম-ডোমনির জীবনচিত্র—নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌকাবাওয়া, সাঁকো তৈরি, চ্যাঙ্গাড়ী বোনা, 'তুলোধুনা', নাচ-গান, শবর-শবরীর অনন্ত প্রেম ইত্যাদি চিত্রের মাধ্যমে গূঢ় ধর্ম-সংকেতকে কবিগণ আভাসে-ইঙ্গিতে তুলির টানে ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন। রূপকের মধ্য দিয়ে ধর্ম সংকেতকে প্রকাশ করেছেন। নানা শব্দের মালা গেঁথে, যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস, রূপক ইত্যাদি নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সাহায্যে বাস্তব জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনানুভূতিকে সার্থকভাবে রূপদান করেছেন। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভিত্তিভূমিতে বাস্তব-জীবনমুখী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা গীতি কবিতার মিষ্টিক-অনুভূতির কাব্যধর্মও চর্যাপদে আছে। এর বাক্-বিন্যাস ও ছন্দরীতি বহু স্থানেই বর্তমান যুগের কবিতাকে স্মরণ করায়।

সমাজচিত্র ঃ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধিকে পেতে চেয়েছেন। এই অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন—তার উপাদান সাধক কবিগণ সংগ্রহ করেছেন লোক জীবন থেকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন্ত চিত্র এতে ধরা পড়েছে। ভুসুকুপাদের (৪৯ নং পদে) রূপকের মোড়কে বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী পদ্মা ও নৌ-সৈন্য অথবা জলদস্যুদের লুণ্ঠনের চিত্র আছে।

"বাজ-ণাব-পাড়ী পঁইআ খাঁলে বাহি উ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসু[কু] বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।"

[বজ্র নৌবাহিনী পদ্মার খালে বয়ে চলল। নিষ্ঠুরভাবে ডাকাত দেশ লুঠ করল। আজ তুই ভুসুকু বংগালী হ'লি, নিজ ঘরনি চণ্ডালের দ্বারা অপহৃত হ'ল।]

ডোম-ডোমনির নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু ইত্যাদির চিত্রও চর্যাপদে আছে। কিছু পদে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে ডাকাতি ইত্যাদির মধ্যে নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ দেখা যায়। ৫ সংখ্যক পদে চাটিল পাদ বলেছেন—

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল-মাঝে ন থাহী।।"

ভুসুকুপাদের একটি পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পদেই কবি বলেছেন—

"আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"

সেকালের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র ঢেন্ঢন পাদের গানে—

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।" অংশে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করত। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হ'ত। চুরির ভয়ে গৃহস্থের ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে। সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। অস্পৃশ্য অন্ত্যজশ্রেণীর বাস ছিল নগরের বাইরে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করত। সবর পদের ভণিতাযুক্ত ২৮ নং পদে দেখা যায়—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।"

[উঁচু উঁচু পর্বত— সেখানে বাস করে শবরী বালিকা] শবরদের উপজীবিকা ছিল হরিণ শিকার। ডোমজাতি বেত বা বাঁশের ধামা, কুলো তৈরি করে কিংবা খেয়া-নৌকার মাঝিগিরি করত। তবে এ ব্যাপারে ডোমনিরা ছিল পারদর্শিণী। এদের কেউ কেউ নৃত্যবিদ্যায় নিপুণা ছিল। সমাজের সচ্ছল পরিবারের বিবাহাদি ধূমধাম করে হ'ত। বাসরঘরে মেয়েরা বরকে ঘিরে হাস্য-রসের প্লাবন বইয়ে দিত সারারাত ধরে। অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কার্পাসের চাষ হ'ত, এই কার্পাস দিয়ে বস্ত্র ও মাদুর তৈরি হ'ত। কাঠের নৌকা ছিল। জলপথে নৌকাই ছিল একমাত্র সম্বল। খেয়া পারাপারের জন্য কড়ি লাগত। জলপথ ও স্থলপথে দস্যুদের আক্রমণ ঘটতো। নানা স্থানে শুল্ক সংগ্রহকারীদের উপদ্রবও ছিল। শান্তিরক্ষকদের উৎপীড়নের দৃষ্টান্তও আছে। হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হ'ত। ধার্মিক লোক পুঁথি পড়ত, পূজা করত, মালাও জপত। নাচ, গান ও নাটকাদির অভিনয় হ'ত। কাহ্নপাদের একটি পদে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

"একসো পদুমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তাই, চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।"

সাধক কবি চৌষট্টি পাঁপড়ির এক পদ্মফুলের ওপরে বাউলি ডোম্বীর অপূর্ব নৃত্যলীলার রূপটি কল্পনা করেছেন। 'বুদ্ধ নাটক' অভিনয়ের কথাও আছে। 'হেরুয়াবীণা' অর্থাৎ এক জাতীয় একতারা বাজিয়ে একশ্রেণীর গায়ক গান গেয়ে বেড়াত।

মেয়েরা আয়না, কাঁকন, মুক্তাহার, কুন্তল ব্যবহার করত। দাবা খেলার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তিরা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। মদ্যপানের রেওয়াজও ছিল।

চর্যাপদে বৃহত্তর বাংলাদেশের আদি মৃত্তিকাশ্রয়ী নরগোষ্ঠীর জীবনচিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে কামনা-বাসনাকীর্ণ পারিবারিক জীবনপ্রবাহ—অন্যদিকে আদিবাসী অস্ট্রিক জীবন চিত্র শবর-শবরীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এদের নারীসমাজের স্বাধীন বিচরণের স্পষ্ট চিত্রও আছে। ময়ুরপুচ্ছ ও গুঞ্জাফুলের মালায় সাজসজ্জার কথাও আছে। বিবাহ উৎসবে নানা বাদ্যযন্ত্রসহযোগে বরযাত্রার দৃশ্য বর্ণনাও আছে। সংসারে শাশুড়ির সঙ্গে বধূর ভীত চকিত সম্পর্কের কথাও আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ তেমন প্রভুত্ব না করলেও তাঁরা ব্রাত্যদের স্পর্শ বাঁচিয়ে পথ হাঁটত। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় চর্যাপদে বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজচিত্র পাওয়া যায়। সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজজীবনের মূলস্রোতকে বিস্মৃত হতে পারেননি।

উপসংহার ঃ রূপকের মোড়কে সাধনতত্ত্বের জটিলতার মধ্যেও সিদ্ধাচার্যগণ যে কাব্য সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়েছেন তা বিস্ময়কর। গীতিধর্মী পদ ও সাধনসংগীত শাখার উৎস চর্যাপদ আবিষ্কৃত হবার ফলেই বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজের লোকজীবনাশ্রিত রচনারীতি ও ভাব জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছে। বাংলা ছন্দের বিবর্তন ইতিহাস, ভাষার ক্রম অনুসন্ধান, বাংলার প্রাচীন সমাজচিত্র ইত্যাদির জীবন্ত দলিল হ'ল চর্যাপদ।

2.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা সংকলন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনসংগীত চর্যাপদ। পদ রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কবিরূপে লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগণ পদসমূহে প্রত্যক্ষ সমাজজীবন থেকে বহু রূপ ও রূপক গ্রহণ করেছেন। ধর্মতত্ত্ব ও সাধন পথের পরিচয় দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পরিচিত স্থান-কাল-প্রথা-বিধি ও সংগ্রামের সাহায্যও নিয়েছেন। বাংলার লোকজীবনের বাস্তবচিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। সাধক কবিগণ সাধনার একান্ত আত্মগত অনুভবকে গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বাংলা গীতি-ধর্মী পদ রচনার সূচনা এই চর্যাপদ থেকেই আলো-আঁধারি-ভাষায় চর্যাপদগুলি রচিত। ধর্মমত, সমাজচিত্র, ভাষা, ছন্দ ও অলংকারে সমৃদ্ধ চর্যাপদগুলি—ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ধারার উৎস।

2.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন এবং ২৫ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের দেওয়া তথ্যগুলির মধ্যে যেটি সঠিক তার ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন :

   (ক) চর্যাপদ [সংস্কৃত] [অবহট্‌ঠ] [বাংলা] ভাষায় রচিত।

   (খ) চর্যাপদের মুল পুঁথিতে মোট [৬০] [৪৬½] [৫০] টি পদ পাওয়া যায়।

   (গ) চর্যাপদে [হীনযানী] [মহাযানী] [সহজযানী] দের সাধনপন্থা প্রকাশ পেয়েছে।

   (ঘ) চর্যাপদে মোটামুটি [দুই] [তিন] [চার] রকমের ছন্দ পাওয়া যায়।

2. নীচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) চর্যার যুগে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা নগরে বাস করত।	☐	☐
(খ) চর্যার যুগে চুরি-ডাকাতি ছিল না।	☐	☐
(গ) চর্যার গীতগুলি সাধন-সংগীত।	☐	☐
(ঘ) চর্যাপদে তৎকালীন সামাজিক জীবনের চিত্র আছে।	☐	☐
(ঙ) চর্যাপদে কাহ্নপাদের ১৪টি পদ আছে।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন। উত্তর সংকেত দেখুন।

(ক) চর্যাপদের টীকাকার ___________।

(খ) ১৩১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ___________নামে চারটি গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ চতুষ্কের মধ্যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় _______________।

(ঘ) চর্যাপদের বেশির ভাগ শব্দই _____ _____ জাত।

(ঙ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদ মূলত ______ উপভাষার ওপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছে।

(চ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে __________ নামে অভিহিত করেছেন।

4. (ক) চর্যাপদের সমাজ চিত্র সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।

(খ) চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করুন।

(গ) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম কী? কে এই গ্রন্থটি কোথা থেকে আবিষ্কার করেন? এই গ্রন্থে কাদের সাধন-সংগীত দেখা যায়?

(ঘ) চর্যাপদের চার জন পদ রচয়িতার নাম উল্লেখ করুন।

2.9 উত্তর সংকেত

2.5 অনুশীলনী 1

2.5 1. (ক) ঠিক

(খ) ভুল

(গ) ঠিক

(ঘ) ভুল

(ঙ) ঠিক

(চ) ভুল

2.8 3. (ক) মুণি দত্ত

(খ) হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা

(গ) চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

(ঘ) মাগধী-অপভ্রংশ

(ঙ) রাঢ়ী

(চ) সন্ধ্যা ভাষা

অনুশীলনী 2

2.8 1. (ক) বাঙলা

(খ) ৪৬$^{১}/_{২}$

(গ) সহজযানী

(ঘ) তিন

2. (ক) ভুল
   (খ) ভুল
   (গ) ঠিক
   (ঘ) ঠিক
   (ঙ) ভুল

2.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড) : ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
5. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক 3 ❑ তুর্কী আক্রমণ—বিজয় ও বাঙালির সমাজজীবন ও সাহিত্যে তার ফলাফল

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য
3.2 প্রস্তাবনা
3.3 মূলপাঠ
3.4 সারাংশ
3.5 অনুশীলনী
3.6 উত্তর সংকেত
3.7 গ্রন্থপঞ্জি

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী—এই দুশো বছরে তুর্কী আক্রমণ—তাদের বিজয়, বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দুর কর্তৃত্বের অবসান, মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানবেন। তুর্কী আক্রমণে পুরাতন সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলে, ধর্মীয় বিপর্যয় শুরু হলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—ধর্মান্তরিত বরণ শুরু হয়। তবে এই দুর্যোগের মধ্যেও দুশো বছর ধরে বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পটভূমিকা তৈরি করে কি ভাবে সমন্বয়ী সংস্কৃতির বীজ বপন করল তা জানতে পারবেন।

3.2 প্রস্তাবনা

'অন্ধকার যুগ' নামে চিহ্নিত—দুশো বছরে বাংলা সাহিত্যের লিখিত নিদর্শন—খুঁজে পাওয়া যায় না। তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালি সমাজ স্তম্ভিত-বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় রক্ষণশীল পলায়নী মনোবৃত্তি। যার ফলে সাহিত্য জগতের ঘটল বন্ধ্যা-দশা, আর সংস্কৃতি হ'ল পঙ্গু। কিন্তু অন্ধকারের পরই আলোর ঠিকানা পাওয়া গেল। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে হুসেন শাহ, নস্‌রৎ শাহের আমলে ধীরে ধীরে মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য-অনার্য জাতির মিলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির নবজন্ম ঘটে। সংহতি শূন্য জাতি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয় মিলনমুখী সাহিত্য-সম্ভার।

3.3 মূলপাঠ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কী আক্রমণ ও তাদের বিজয়বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত গৌড় বঙ্গকে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের সমকালে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত শাসনকর্তার

অভাবে দেশে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। ইতিহাসে এই সময়কাল 'মাৎসন্যায় যুগ' বলে চিহ্নিত। প্রায় ১০০ বছর অরাজকতা চলার পর জনগণ 'গোপাল'কে গৌড়ের রাজারূপে নির্বাচন করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ১১৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত পাল বংশের রাজাগণ রাজত্ব করেন। এই পর্বেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় এবং যার সাক্ষ্য বহন করছে চর্যাগীতিগুলি। পাল বংশের পতনের সমকালে এবং পরবর্তী স্তরে বৌদ্ধ মতাবলম্বী 'খড়্গ বংশ' এবং বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী 'বর্মণ বংশ' স্থানিক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 'সেন বংশ'ই সমগ্র বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জগতে প্রকৃত শাসক রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সেন বংশের নৃপতি 'লক্ষ্মণ সেনে'র আমলেই তুর্কী নেতা মহম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার (খিলজি) ১২০২ অথবা ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের শেষ বয়সের বাসস্থান এবং নদীয়া আক্রমণ করে। বৃদ্ধ রাজা রাজধানী ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে পলায়ন করেন। কিংবদন্তি আছে যে—বখ্‌তিয়ার মাত্র 'সপ্তদশ' মতান্তরে 'অষ্টাদশ' অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারাই নদীয়া জয় করেন এবং ভীরু অক্ষম রাজা লক্ষ্মণ সেন স্ত্রীলোকের বেশ ধরে গোপনে পলায়ন করেন। তবে তুর্কী নেতার বিজয় অভিযান ও লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন বৃত্তান্ত বর্তমানে অতিরঞ্জিত বলে ঐতিহাসিকগণ সহমত জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি তুর্কী শাসনের অধীনস্থ হলেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বেশ কিছু সময় রাজত্ব করেছেন।

বাংলা ভাষা সাহিত্যের নবযুগের সুচনা দেখা দেয় তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী সময়ে। তুর্কী আক্রমণে প্রাচীন জাতীয় জড় চেতনার মুলে তীব্র আঘাত আসে। এই আঘাতের ফলেই জাতির আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তীব্ররূপ নেয়। এর ফলস্বরূপ বাংলার জাতীয় জীবনে নূতন যুগের সুচনা হয়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—"বখ্‌তইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম।" গবেষকের বক্তব্যটি যথার্থ এ যুগের বাংলার লোক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের নানা প্রকার রহস্যময় আচার-আচরণ, ডাকিনী-যোগিনী তন্ত্রের অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড, পুরোহিত-তন্ত্রের দাপট। দুর্বল রাষ্ট্রশক্তি, সমাজে ঐক্য সংহতির অভাব, অন্ধকারাচ্ছন্ন অনৈক্যে ভরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশই তুর্কী বিজয়ের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা জাতি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা চিন্তা করতে না পেরে আত্মগোপনের পথ বেছে নেয়। এ সময় বাংলার সামাজিক কাঠামো ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। শুরু হয় অমানবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়। বাঙালির মনে-প্রাণে দেখা দেয় ভীতি বিহ্বলতা। অত্যাচারী আমীর ওমরাহ ও হাবসিদের নগ্ন আক্রমণে দেবালয়, শিক্ষায়তন, সমৃদ্ধ গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। দিকে দিকে বিজিত জাতির ওপর অকথ্য অত্যাচারও চলতে থাকে। প্রায় দু'শ বছর ধরে তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের তাণ্ডবলীলায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নেমে আসে অমানিশার ঘনান্ধকার এই জন্যই এই দু'শ বছর বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকারময় যুগ' রূপে চিহ্নিত।

তুর্কী বিজয়ের পর সংস্কৃতিগত, ধর্মবিশ্বাসগত, আচার-আচরণ ও ভাব-ভাবনাগত বিচ্ছিন্ন-খণ্ডিত বাঙালিজাতি আত্মরক্ষা ও আত্ম উদ্বোধনের তাগিদে অখণ্ড বাঙালিজাতি রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য মোড় ফিরে দাঁড়ায়। তাই প্রাথমিক স্তরে তুর্কী বিজয় জাতীয় জীবনে অভিশাপরূপে দেখা দিলেও, পরবর্তীকালে আশীর্বাদের রূপ হয়েই দাঁড়ায়।

তুর্কী আক্রমণ বাঙালির মূল অস্তিত্বের ওপর হানে চরম আঘাত। গুপ্ত শাসন থেকে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে 'শিষ্ট' ও 'দেশীয়'—এই দুটি স্তর গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহারে সেতুবন্ধন থাকলেও আভিজাত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে দুটি স্তরের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। এই পার্থক্য দূর করে অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল বাইরের আঘাত। সেই আঘাত এসেছিল—তুর্কী আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই আঘাতের ফলেই দুই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলনমঞ্চ গড়ে ওঠে। যার ফলে আভ্যন্তর শক্তির উদ্বোধন ঘটে। সুতরাং তুর্কী আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলেই বাংলার জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় "মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্য মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্টরূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।" এর ফলেই দেখা দিল অন্ধকারের বুকে নূতন আলোর রেখা, ঘটল জাতীয় জীবনে সর্বাত্মক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য ধারা।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে নিষ্ঠুর অত্যাচারী হাবসি শাসনের অবসান ঘটে এবং সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যোৎসাহী ধর্মমতে উদার হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কী বিজয়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম পর্যায়ের পর হুসেন শাহের আমল অর্থাৎ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে নবপ্রাণ সঞ্চার হয়। তাঁর আমলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহের কাল অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রিঃ-১৫৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবাদর্শের প্লাবন ধারা বহমান। তুর্কী আক্রমণের আঘাতে জাতীয় জীবনে মিলন-আকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হ'ল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্বজনীন জীবন-সাধনার পবিত্র স্পর্শে।

তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহার, সংস্কার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে নূতন চেতনার জগৎ সৃষ্টি হ'ল বাংলার বুকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নাগরিক সংস্কৃতি। এ সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি তথ্যবহ। তিনি বলেছেন—"...ইসলামের ভূমিচারী জীবনাদর্শ, ওমরাহদের ভোগ-সুখের উদ্দামতা ইত্যাদির ফলে বাঙালীর স্নেহচ্ছায়া-শীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইল।" বিদেশি শাসক গোষ্ঠীর চেষ্টাতেই-গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, দেবকোট, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র ও অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকেই, বাংলাদেশে অনেকটা সুসংস্থিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালেই বাংলার জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। শুধু তাই নয়, রাজশক্তির আনুকুল্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় জগতে ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে তুর্কী বিজয়ের অবদান রয়েছে। ভারতবর্ষের ভক্তি সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের পুরাণ-শাস্ত্রাদির সঙ্গে ইসলামি চেতনার মিলন দেখা যায়। এ ব্যাপারে সুফি ধর্ম, সুফি সাহিত্য, লোকায়ত সাহিত্য, পির-দরগা সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি এই ধর্ম-মিলনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

উপসংহার ঃ তুর্কী আক্রমণের ও বিজয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবেই বাংলাদেশের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনা মিলনমুখী হয়ে ওঠে এবং সেই চেতনা ধীরে ধীরে নবজাগরণের অভিমুখে পরিচালিত হয়।

এর পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ পায় ষোড়শ শতাব্দীতে। এ সময় "বলতে গেলে 'বাঙালা'র একটা রাষ্ট্র বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সমবেত সৃষ্টি। যদিও তার বনিয়াদ হিন্দুভাষা, ফল ও ভাব।" ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই নবজাগরণের আলো-অন্ধকার মিশ্রিত প্রস্তুতি পর্বরূপে চিহ্নিত।

3.4 সারাংশ

গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। সেনবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী নেতা মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার (খিলজি)—রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিকে দখল করে—শুরু করে অমানবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। জোর করে ধর্মান্তকরণ শুরু হয়। দিকে দিকে অসহায় মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দেশান্তরী হ'তে শুরু করল। বিজিত জাতির ওপর বিজয়ী জাতির অকথ্য আক্রমণে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু জাতীয় জীবনের ইতিহাস এই অন্ধকারেই হারিয়ে যায় না। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে আত্মরক্ষা ও নিজেকে প্রকাশের তাগিদে নূতন পদক্ষেপ নেয়। খণ্ডিত বাঙালি জাতি অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা গড়ার প্রয়োজন অনুভব করে। 'শিষ্ট' ও 'দেশীয়'— ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলনমঞ্চ গড়ে তোলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে নিষ্ঠুর হাবসি শাসনের অবসানের পর সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে নসরৎ শাহের কাল পর্যন্ত এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নূতন চেতনা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় নাগরিক সংস্কৃতি। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল বাতাবরণ প্রস্তুত হয়।

3.5 অনুশীলনী

নিম্নের সমস্ত প্রশ্ন থেকে একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পরপৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক) সেনবংশের নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী নেতা আক্রমণ করেছিলেন
1. হুসেন শাহ
2. মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার
3. ইলিয়াস শাহ

(খ) গৌড়বঙ্গকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিলেন
1. গোপাল
2. লক্ষ্মণ সেন
3. শশাঙ্ক

(গ) বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ হ'ল
1. নবম-দশম শতাব্দী
2. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী
3. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী

(ঘ) হুসেন শাহ ছিলেন
1. অত্যাচারী
2. রক্ষণশীল
3. উদার

(ঙ) তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে
1. নাগরিক সংস্কৃতি
2. বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি
3. অপসংস্কৃতি

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (x) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) লক্ষ্মণ সেন মহম্মদ বিন বখতিয়ারকে পরাস্ত করেন।	☐	☐
(খ) শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়।	☐	☐
(গ) হাব্‌সিগণ উদার ছিল।	☐	☐
(ঘ) মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য-অনার্যের মিলন ঘটে।	☐	☐
(ঙ) চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে নস্‌রৎ শাহের আমলে।	☐	☐

3.6 উত্তর সংকেত

অনুশীলনী 3.5

1. (ক) মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার
   (খ) শশাঙ্ক
   (গ) ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী
   (ঘ) উদার
   (ঙ) নাগরিক সংস্কৃতি

2. (ক) ভুল
   (খ) ঠিক
   (গ) ভুল
   (ঘ) ঠিক
   (ঙ) ভুল

3.7 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড) : ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 4 ☐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ইসলামি সাহিত্য—'ইউসুফ-জোলেখা'

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য
4.2 প্রস্তাবনা
4.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
4.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
4.5 অনুশীলনী 1
4.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ ইসলামি সাহিত্য 'ইউসুফ-জোলেখা'
4.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
4.8 অনুশীলনী 2
4.9 উত্তর সংকেত
4.10 গ্রন্থপঞ্জি

4.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন এবং এই কাব্যের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য সম্পর্কে সব কিছু জেনে এই কাব্যের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

4.2 প্রস্তাবনা

তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের পর বাংলা সাহিত্য জগতে যে বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছিল, সমাজজীবনে হতাশার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, সেই মুহূর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আলোর বিচ্ছুরণে বাংলা সাহিত্য জগতে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। বসন্ত রঞ্জন রায় কাব্যখানি আবিষ্কার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন। এই কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়বস্তু লক্ষণীয়—প্রথম ১১টি খণ্ডে ধূলি-মলিন লৌকিক জীবনের স্থূল রসের অভিসিঞ্চন থাকলেও শেষের দুটি খণ্ডে দেহাতীত প্রেমের আর্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। তৎকালীন সমাজজীবন চিত্র, নাটকীয় চমৎকারিত্ব, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ভঙ্গিমা ইত্যাদিও লক্ষণীয়। বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কবি শাহ মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যখানিতে প্রণয় কাহিনী—যা পাওয়া যায় তা প্রাচীন গ্রন্থের প্রণয় কাহিনীর আক্ষরিক অনুবাদ নয়। লোকজীবনে ছড়িয়ে থাকা কাহিনী-কাঠামো সংগ্রহ করে কবি স্বকীয় প্রতিভার আলোয় কাব্যখানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবেশ-পটভূমি রচনায় এবং ভাষা-শৈলীর দিক থেকেও জোলেখার

চরিত্র রূপায়ণে কবি সার্থক। নারী-প্রেমের উগ্রতা এবং তার বিনম্র পরিণতিতে কাব্যখানি বাস্তবধর্মী ও সার্থক হয়েছে।

আদি মধ্যযুগের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'ইউসুফ-জোলেখা' এই দু'খানি কাব্য পাঠ করে শিক্ষার্থীরা 'অন্ধকার যুগে'র পর বাংলা সাহিত্যের নূতন গতিপথের সন্ধান পাবেন।

4.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ভূমিকা

তুর্কী বিজয়ের প্রথম পর্বে দু'শ বছরব্যাপী বাংলার জাতীয় জীবনে ও সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে দেখা দেয় বন্ধ্যা দশা। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির বিশৃঙ্খল অন্ধকারাচ্ছন্ন দিগন্তেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র মতো দেখা দেয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয় বিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে অযত্নরক্ষিত গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পুঁথিখানির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কিন্তু এর যথার্থ নাম অন্য। আবিষ্কৃত গ্রন্থের গোড়ার দুটি ও শেষে একটি পাতা নেই। সুতরাং কাব্য ও কবি পরিচয় অংশটি অজ্ঞাত। কবির ভণিতা 'চণ্ডীদাস', তবে বেশির ভাগই 'বড়ু চণ্ডীদাস'। পুঁথির মধ্যে একখানি চিরকুট পাওয়া যায়। তাতে এটিকে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ) বলা হয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন, জীব গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' নামাঙ্কিত গ্রন্থ থাকার জন্যই কবি গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব' দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যের কাগজের টুকরো অংশ থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' থাকাতে এবং এই গ্রন্থের ভাষা, উপস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় এটি পদাবলির চণ্ডীদাসের লেখা নয়। গ্রন্থকর্তা 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভিন্ন ব্যক্তি। পুঁথিমধ্যে বহুস্থানে কবি নিজেকে 'বাশুলীর গণ' অর্থাৎ শাক্তদেবী বাশুলীর উপাসক বলে স্বীকার করেছেন। এই পরিচিতি ছাড়া গ্রন্থমধ্যে আর কোথাও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই।

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনীকে কিছুটা অনুসরণ করে, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ'র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং অমার্জিত গ্রামীণ প্রচলিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই বড়ু চণ্ডীদাস এই কাব্যখানি লিখেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' মোট ১৩টি খণ্ড আছে। এটি সংলাপ গীতিময় নাট্য-গীতি শ্রেণীর কাব্য। ড. সুকুমার সেন এইজন্যই গ্রন্থখানিকে 'নাটগীতি পাঞ্চালী' বলে অভিহিত করেছেন। খণ্ডগুলি—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ নামে চিহ্নিত। শেষেরটিতে 'খণ্ড' শব্দ যুক্ত হয়নি। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাব্যখানির মূল কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। নিম্নে কাব্যখানির বিভিন্ন খণ্ডের কাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত হ'ল।

জন্মখণ্ডঃ কংসের অত্যাচারে পৃথিবী যখন নানা পাপে জর্জরিত হয়, তখন তার হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ভগবান নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর লীলা সম্ভোগের জন্যই 'সাগরের ঘরে পদুমা উদরে'—লক্ষ্মীদেবী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাধার জন্মবৃত্তান্তই এই খণ্ডের মূল বিষয়।

তাম্বুলখণ্ড ঃ এই খণ্ডে রক্তমাংসে গড়া 'নারী'—রাধার দেখাশুনার জন্য রাধার মাতার পিসি বড়াই চরিত্র

সৃষ্টি। পসারিণী রাধার অনুসন্ধানে বের হয়ে বড়াই গোচারণভূমিতে কৃষ্ণকে দেখে তার সাহায্য প্রার্থিনী হয়। বড়াই কৃষ্ণকে রাধার রূপাদি বর্ণনা করার পর কৃষ্ণের রাধার প্রতি কামভাব প্রবল হয় এবং বড়াই-এর উপদেশ মত কৃষ্ণ রাধার উদ্দেশ্যে, মিলন-ইচ্ছার ইঙ্গিত স্বরূপ 'তাম্বুল' পাঠান। এতে রাধা ক্ষুব্ধ হয়ে তাম্বুল ছুড়ে ফেলে বড়াইকে উত্তম-মধ্যম দেন।

দান ও নৌকাখণ্ড ঃ এই দুই খণ্ডে দানী ও খেয়া মাঝি সেজে বড়াই-এর সাহায্যে রাধাকে কৃষ্ণ ডেকে এনে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেন।

ভারখণ্ড ঃ কামাতুর কৃষ্ণকে কৌতুকছলে রাধা তার দধি-সরের পসরা বহনের প্রস্তাব দিয়ে কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণের আশ্বাস দেয়। কৃষ্ণ ভারী সেজে মথুরার হাটে যান এবং ফেরার পথে রাধাকে প্রতিশ্রুতি পালনের কথা বললে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। খণ্ডটি অসম্পূর্ণ।

ছত্রখণ্ড ঃ খর রৌদ্রের হাত থেকে রাধাকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার মাথায় ছত্রধারণ করেছে। উদ্দেশ্য এতে তার কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে। এ খণ্ডটিও অসম্পূর্ণ।

বৃন্দাবনখণ্ড ঃ বয়ঃপ্রাপ্তা রাধা বড়াই-এর সাহায্যে সংসারের নাগপাশ ছিন্ন করে বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন।

যমুনাখণ্ড ও কালীয়দমনখণ্ড ঃ যমুনা নদীর বুকে জলকেলি এবং কালীয়দমনের ঘটনাদি আছে।

হারখণ্ড ঃ বস্ত্রহরণ এবং শেষে রাধার হার কৃষ্ণ অপহরণ করলে রাধা রাগান্বিতা হয়ে মা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে চরম অসম্মানের অভিযোগ আনেন।

বাণখণ্ড ঃ মদনবাণে রাধাকে বিদ্ধ করে মোহমুগ্ধা রাধাকে মিলন পাগলিনী করে শ্রীকৃষ্ণ আত্মগোপন করেন। রাধা বড়াইকে সঙ্গে করে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পায়। উভয়ের পূর্ণ মিলনে এই খণ্ডের সমাপ্তি।

বংশীখণ্ড ঃ দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে রাধার হৃদয়-মন আকুল-ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গৃহকাজে মন নেই। বড়াই-এর পরামর্শে কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করেন। তারপর নানা কথা কাটাকাটির পর মনোমালিন্য দূর হলে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী ফিরিয়ে দেন।

রাধা বিরহ ঃ এই অংশটি খণ্ডিত। প্রিয় মিলনে তৃপ্তা রাধাকে নিদ্রামগ্না অবস্থায় কৃষ্ণ পরিত্যাগ করে চলে যান। নিদ্রাভঙ্গের পর কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে রাধার হৃদয়গভীরে যে বিরহের আর্তি দেখা দেয় তারই করুণ বর্ণনার মধ্য দিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে।

১৩ টি খণ্ড জুড়ে রাধাকৃষ্ণের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে,—পদাবলির আধ্যাত্মিক রাগরঞ্জিত মধুর রসাশ্রিত পদসমূহের সমগোত্রীয় বলে এ কাব্যকে চিহ্নিত করা যায় না।

কাব্য মূল্যায়ন ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি অবিমিশ্র লোকজীবনতন্ময় কাব্য। লোকজীবন আশ্রিত সার্থক 'লোক-কাব্য'। এ সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

"আমাদের অনুমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হইলেও কাহিনী নির্মাণে গ্রামীণ রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর আদর্শের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।" এই কাব্যে অশিক্ষিত অনভিজাত জীবনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রথা, সামাজিক ব্যভিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিরুপায় নারীত্বের আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হয়েছে। এর স্পষ্টরূপ ধরা পড়েছে 'রাধাবিরহ খণ্ডে।

নাটকীয় ধরনের সাহিত্যগুণে কাব্যখানি অনন্য। কৃষ্ণের লাম্পট্য বাদ দিলে, অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে কবি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রটি অমার্জিত গ্রাম্য গোঁয়ার জাতীয় যুবকের আদলে রচিত। তাঁর সংলাপ সর্বত্র মার্জিত নয়। গ্রন্থের শেষাংশে হঠাৎ কৃষ্ণের যোগসাধনের প্রসঙ্গটি নিতান্তই খাপছাড়া।

কবির রাধা—'ত্রিভুবন জনমোহিনী'। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাধার ক্রমবিকাশ—মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণ ধর্মী হয়েছে। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি চরম দক্ষতার ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। এমনটি প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ। শুরুতে সংসার অনভিজ্ঞা, রূঢ়সত্য ভাষিণী, অল্পবয়সী, অশিক্ষিতা গোপ বালিকারূপে রাধিকাকে আমরা পাই। কবি ঘটনা কৌশলের আবর্তে সহজ-সরল মূঢ় বালিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বেলে যেভাবে প্রেম-বন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সব শেষে অনন্ত প্রেমের আর্তিতে চরিত্রটিকে মুখর করে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে নিপুণ সাহিত্য-শৈলীর নিদর্শন।

বড়াই-এর চরিত্রটি 'টাইপ' চরিত্র। জ্যোতিশ্বরের 'বর্ণ রত্নাকর'-এ যে কুট্টনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি যেন বড়াই। তবে কাব্যের প্রথমদিকে কৃষ্ণের দূতীরূপী বড়াই-এর মধ্যে কুট্টনীর ছায়াসম্পাত ঘটলেও, পরবর্তী পর্যায়গুলিতে তার হৃদয় গভীরে রাধার জন্য মাতৃহৃদয়ের কোমল অভিসিঞ্চন লক্ষ্য করা যায়।

নারদমুনির চরিত্রটি নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসাবেই স্থান পেয়েছে।

ভাষা-ভঙ্গিমা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর সংহতরূপ ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনন্য সাধারণ কাব্যরূপে চিহ্নিত। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দে'র গানগুলি যেমন শ্লোকের দ্বারা কাহিনী শৃঙ্খলে সংগ্রথিত, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকের যেন সুবিন্যস্ত মালা। পাঞ্চালী কাব্যের মতো নানা খণ্ড-বিভাগ এবং নাটগীতিকাব্যের সৌন্দর্য ও সংহতিও এই কাব্যে আছে।

সমাজচিত্র ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমসাময়িক বাঙলাদেশ ও সমাজের নানা বাস্তবচিত্র আছে। রাধার পারিবারিক জীবন ও তার অল্প বয়সে বিবাহের চিত্রে বাল্যবিবাহ প্রথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গোপকন্যাদের স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের চিত্রও আছে। তাদের দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ক্রয়-বিক্রয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের কুমোর, তেলি, নাপিত, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ আছে। বংশীখণ্ডে রাধার রন্ধনশালার প্রসঙ্গটিতে বাঙালির খাদ্যাভাসের ইঙ্গিত রয়েছে। লোকজীবনের কিছু কিছু সংস্কার প্রসঙ্গ ও দেখা যায়। যেমন :

"কোন আসুভ খনে পাতন বাড়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী উবাঁট না মানিল।।
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।।"

এখানে হাঁচি, টিকটিকি, শূন্য কলসী, বামদিক থেকে শিয়ালের ডানদিকে যাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কারের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

সার্বিক মূল্যায়ন ঃ গীতিকবি সুলভ রমণীয়তা কাব্যখানিতে লক্ষ্য করা যায়। 'দানখণ্ডে' রাধার রূপ বর্ণনা—এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

"নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা।।"

বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ অংশে রাধার হৃদি-বেদনা গীতি কবিতার মূর্ছনায় বিমথিত।

"বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কহ্নাঞি
বাঁশী বাএ সুললিত ছন্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেয়াগিবোঁ
সুনী তাক বুকে কে বা বান্ধে।"

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা বলে উদ্ধৃত কাব্যাংশটির সব অর্থ বোঝা কঠিন। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন—

[বৃন্দাবনে প্রবেশ করে কৃষ্ণ সুন্দর বাঁশী বাজায়। বড়াই, আমার হার, কাঁকন সব ত্যাগ করব। সে সুর শুনে কে বুক বেঁধে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে]

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।।"

এই পদাংশটিতে রাধার হৃদয়মথিত ব্যাকুলতা চিরন্তন রূপ পেয়েছে। এই হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশে কবি বাস্তব রসস্নিগ্ধ উপমা-অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।।"

[ওগো বড়ায়ি (যখন) বন পোড়ে জগৎ-জন জানতে পারে। আমার মন কুমোরের তুষানলের মত পুড়ছে।]

দিনের সূর্য রাধার হৃদয়কে দগ্ধ করছে, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারাও বেদনার বাণীবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। রাধা কি করে কৃষ্ণ বিহনে জীবনধারণ করবে—তার চোখে 'নাই সে নিন্দে' অর্থাৎ চোখে ঘুম নেই। এই নীরব বেদনার হাহাকার যুগ-যুগান্তর বিরহ বেদনার ব্যাকুল বাণী বহন করে।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের নকীব হিসাবে যেন ভূমিকা পালন করেছে। এ ব্যাপারে বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ অংশটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আখ্যান কাব্য থেকেই পরবর্তী পালাগানের সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। শুধু অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে কাব্যখানিকে কালিমালিপ্ত ও অবহেলা করা উচিত নয়। ড. সুকুমার সেন এই কাব্যের সঠিক মূল্যায়ন করে বলেছেন"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রবেশে বাধা আছে। বানান অপ্রচলিত, ভাষা কিছু দুর্বোধ্য। তবে অনুনাসিকের খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ ধ্বনির কন্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের ঝোপঝাড় ডিঙ্গাইয়া একবার যিনি এই কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিবেন তিনি ঠকিবেন না।"

4.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বাশুলী দেবীর উপাসক 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি। জয়দেবের পরবর্তী ও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী সময়ে কবির জন্ম। শাস্ত্র-পুরাণাদিতে পণ্ডিত বড়ু চণ্ডীদাস মোট তেরোটি খণ্ডে কাব্যখানি লিখেছেন। এই কাব্যের ভাগ্যে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই জুটেছে। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্যের ঘটনাধারা নাটকীয় গতিতে প্রবাহিত। সংলাপ গীতিময় নাট্যগীতি শ্রেণীর কাব্যরূপে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হয়েও কাহিনী সৃষ্টিতে কবি গ্রামীণ রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর আদর্শের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কৃষ্ণচরিত্র তৎকালীন অশিক্ষিত, অমার্জিত গ্রাম্য রাখাল বা দুরন্ত কিশোর চরিত্রের আদলে রচিত। বড়াই চরিত্রটি টাইপ-চরিত্র। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ—মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। এই কাব্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র আছে। বিশেষভাবে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মী-মূর্ছনা কাব্যখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম ১১টি খণ্ডে ধূলি-মলিন সমাজজীবনের ছায়া-সম্পাত ঘটলেও শেষের দুটি খণ্ডে অনন্ত প্রেমের মুখরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবি ঘটনা কৌশলে সহজসরলা রাধিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বালিয়েছেন। এ ব্যাপারে নেপথ্যে বড়াই-এর ভূমিকা আছে। শ্রীকৃষ্ণ পারানি, ভারবাহী ইত্যাদির নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে রাধিকার দেহ সম্ভোগের জন্য ছলাকলার আশ্রয় নেয়। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ইত্যাদিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহখণ্ডে কৃষ্ণকে একান্তভাবে পাবার জন্য রাধিকার হৃদয়-গভীরে যে বিরহের আর্তি দেখা যায়—তারই করুণ পরিণতি ঘটেছে কাব্যের সমাপ্তিতে।

4.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। উত্তর লেখা হয়ে গেলে 41 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের প্রশ্নগুলির 4টি সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক) বসন্তরঞ্জন রায় বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য আবিষ্কার করেন

1. 1904 খ্রিস্টাব্দে
2. 1909 খ্রিস্টাব্দে
3. 1917 খ্রিস্টাব্দে
4. 1932 খ্রিস্টাব্দে

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত

1. 10টি খণ্ডে
2. 8টি খণ্ডে
3. 15টি খণ্ডে
4. 13টি খণ্ডে

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
1. লৌকিক জীবনের
2. নাগরিক জীবনের
3. পৌরাণিক জীবনের
4. মিশ্র জীবনের

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি
1. গীতিকাব্য
2. আখ্যান কাব্য
3. নাট-গীতিকাব্য
4. পত্র কাব্য

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
1. প্রাচীন যুগের কাব্য
2. মধ্যযুগের কাব্য
3. আধুনিকযুগের কাব্য
4. আদি-মধ্য যুগের কাব্য

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুপুরের .... গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করেন।
(খ) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন.............. থেকে প্রকাশিত হয়।
(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশনার বছর.............।
(ঘ) পুঁথির মধ্যে পাওয়া চিরকুটে নামটি............... পাওয়া যায়।
(ঙ) বড়ু চণ্ডীদাস................ উপাসক ছিলেন।

3. নীচে প্রদত্ত বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট করে টিক চিহ্ন () দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) 'তাম্বুল খণ্ডে' রাধা চরিত্রটি রক্ত-মাংসে গড়া।	☐	☐
(খ) নারদ মুনির চরিত্রটি করুণ রস সৃষ্টি করেছে।	☐	☐
(গ) কাব্যে গোপ কন্যাদের স্বাধীন জীবনযাবনের চিত্র আছে।	☐	☐
(ঘ) 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'— (পদাংশটি দানখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত)	☐	☐
(ঙ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অশ্লীল কাব্য।	☐	☐

4.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ ইসলামি সাহিত্য 'ইউসুফ-জোলেখা'

ঐতিহাসিক পটভূমিকা : ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকন্দার শাহের রাজত্বকাল ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বংশের অবসানে রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেন। রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা দেখা দেয়, সুখ-সমৃদ্ধিও ঘটে।

ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় নাসিরুদ্দিন, তাঁর পুত্র রুকনুদ্দিন বরবক এবং তাঁর পুত্র

সামসুদ্দিনের রাজত্বকালে। এঁরা সকলেই সুশাসক এবং শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। গুণী ব্যক্তিদের প্রতি এঁদের গভীর অনুরাগ ছিল। সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন অরাজকতা চললেও ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ্ বাংলার অধীশ্বর হলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য চর্চাতেও গতি দেখা যায়।

মোটামুটিভাবে বলা চলে পঞ্চদশ শতকে ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক-ধারার মিশ্রণে বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ায়। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত ভাষার পথ থেকে সরে এসে বাংলা ভাষার স্বয়ং সম্পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হ'ল। হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি মুসলমান বাঙালিও কাব্যরচনা শুরু করেন। এই সব সৃষ্টির মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর প্রায় সমসাময়িক লেখক শাহ্ মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যখানি গুণগত দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি পরিচিতি ও কাব্যসূত্র ঃ আজ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান কবিদের যত প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে মহম্মদ সগিরের লেখা পুঁথিই সব চেয়ে প্রাচীন বলে গবেষকগণ মনে করেন। এই পুঁথি হাতে পাবার আগে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাতেই প্রথম রোমান্টিক প্রেম-আখ্যান রচিত হয়েছে। কিন্তু এঁদের বহু পূর্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহম্মদ সগির 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণয় কাব্যখানি লেখেন। ব্রাহ্মণ্য-লৌকিক ধারার মিশ্রণ, বাংলা ভাষার স্বয়ং সম্পূর্ণতা, ধর্ম ও সমাজের বুকে ঐক্য নিবিড় সুর ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে নূতন গতিপথ তৈরি হ'ল, সেই পথের বিশেষ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় সগিরের কাব্যে। তুর্কী বিজয়ের পর যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—দু'শো বছরের মধ্যে সে অন্ধকার কেটে যায়। হিন্দুদের মতো শিক্ষায় মুসলমানগণও আরবি-পার্সির সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে সরে এসে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা শুরু করেন। তারই স্বর্ণফসল হ'ল 'ইউসুফ-জোলেখা'। এই কাব্যখানি বৃহৎ আকারের ইসলামি কাব্য। কাব্যের নায়ক 'ইউসুফ' ইসলাম ধর্মচর্চা অনুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আদর্শবাদী 'ইউসুফ' ছিলেন আল্লাহ্‌তালার একনিষ্ঠ সেবক। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কাব্যখানিকে প্রণয়-আখ্যান কাব্য বলা যায়।

কাব্য পরিচয় ঃ আজ পর্যন্ত মহম্মদ সগিরের কাব্যের পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনখানা পুঁথির সংগ্রাহক আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। তিনিই প্রথম এই প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কর্তা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. এনামুল হকের সম্পাদনায় ১৯৮৪ সালে কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছে। ড. এনামুল হক ও তাঁর সহযোগী আহমদ শরীফ নানা তথ্যাদি তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে মহম্মদ সগির পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। কাব্যে রাজবন্দনা অংশ বিশ্লেষণ করে এঁরা প্রমাণ করেছেন যে, কবি সম্ভবত সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন। ভাষাগত বিচারে কাব্য সম্পাদক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই কাব্যের ভাষা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র চেয়ে আধুনিক হলেও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র ভাষার চেয়ে প্রাচীন। এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন স্বরূপ কিছুটা কাব্যাংশ তুলে ধরা হ'ল।

"তোহ্মার জথ সখি আছে নৌআলী জৌবন।
তা সব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন।।
ইছুফকে বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে।।"

এই গ্রন্থে কারক-বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কারক-বিভক্তি প্রয়োগের রূপরেখা স্পষ্ট দেখা যায়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, 'ইউসুফ-জোলেখা' নিয়েও তেমন বাক্-বিতণ্ডা আছে। তবু সব যুক্তি জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে বিশিষ্ট গবেষকদের মতানুসারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেমন নির্দিষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনি 'ইউসুফ-জোলেখা'ও একই শতাব্দীর হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকালের কিছুটা পরে বলে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে।

কাব্যকাহিনী ও বৈশিষ্ট্য ঃ বাইবেল, কোরাণ ও ফিরদৌসীর লেখায় 'ইউসুফ-জোলেখা'র যে উপাখ্যান আছে, তাকেই অবলম্বন করে মহম্মদ সগির কাব্যখানি লিখেছেন। ঐতিহ্যবাহী কাহিনীকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে প্রাচীন জনপ্রিয় কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু নূতন ঘটনা যোগ করে কিছুটা মৌলিকতার স্বাদ সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউসুফের দিগ্বিজয়, ইউসুফ পুত্রদের বিয়ে, রাজ্যভোগ, ইবনআমীন ও রাজকন্যা বিধুপ্রভার প্রেম-কাহিনী ইত্যাদি।

কাহিনীর ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, বর্ণনা রীতিতে, অলঙ্কারের সাজসজ্জায় কবি কোমল-পেলব বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ফারসি 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা হয়েছে নায়ক-নায়িকা। সুফীতত্ত্ব রূপকের মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মহম্মদ সগিরের কাব্যে কঠিন তত্ত্বকথার প্রতিফলন নেই, আছে জীবনছন্দ ছন্দায়িত প্রণয়-আখ্যানের নিটোল রূপ।

চরিত্র-চিত্রণ ঃ কাব্যখানির কেন্দ্রীয় চরিত্র ইউসুফ একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ পুরুষ। কিন্তু নীরস ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্যের কাণ্ডারী-ভাণ্ডারী না করে কবি তাঁকে প্রাণময় করে চিত্রিত করেছেন। ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে ইউসুফের পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রনিষ্ঠা, বৈষয়িক বুদ্ধি ইত্যাদি যুক্ত করে কবি তাঁকে মানবিকগুণে গুণান্বিত করেছেন।

নায়িকা জোলেখার চরিত্রটি অসাধারণ। কামনা-বাসনা-সঘন এই নারী, সমাজের রীতি-নীতি অনুশাসন না মেনে তীব্র রিরংসার তাগিদে প্রেমিককে পেতে চেয়েছে। প্রেম প্রত্যাখ্যানে ভয়ংকরী হয়ে প্রেমিককে আঘাত করেছে। নারীর এমন উদগ্র প্রেম বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। কবি ধীরে ধীরে নায়িকার উগ্রপ্রেম-আকাঙ্ক্ষাকে স্নিগ্ধ-বিনম্রতায় পরিশুদ্ধ করে পরিণতি দান করেছেন আত্ম-সমর্পণের বেদীতলে।

হিন্দুনারী জোলেখা, প্রতিমা পূজা বর্জন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে, প্রাণপুরুষ ইউসুফকে লাভ করে।

উপসংহার ঃ তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার বুকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পাশাপাশি ইউসুফ-জোলেখা কাব্যখানি যে নূতন জীবন-আলোর সন্ধান দিয়েছে, বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা দশা ঘোচাতে সাহায্য করেছে—একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হয়।

4.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

আরাকান রাজসভার কবিদের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষ কবি সগির আদি-মধ্যযুগে 'ইউসুফ-জোলেখা' রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান কাব্য রচনা করেন। ঐতিহ্যবাহী প্রণয় কাহিনীকে গতানুগতিক ধারায় রচনা না করে কবি মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাইবেল-কোরাণ ইত্যাদির গল্প-কাহিনীর মধ্যে নূতন সুর-ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। পৌরুষ চেতনায় দৃপ্ত নানা মানবিক গুণে গুণান্বিত ইউসুফের প্রতি জোলেখার কামনা-বাসনা-সঘন প্রেমের উগ্রতার পাশাপাশি তার স্নিগ্ধ প্রেমের ধারা মিলেমিশে কাব্যখানি রোমান্টিক প্রেমের সার্থক কাব্য

হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতই এই কাব্যখানি প্রণয়-আখ্যানের অনবদ্য নিদর্শন। প্রেমকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে এই কাব্য শেষে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তা অস্বাভাবিক নয়—যুগোচিত।

4.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (x) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) 'ইউসুফ-জোলেখা'—সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।	☐	☐
(খ) ইউসুফ-জোলেখা প্রণয়ধর্মী কাব্য।	☐	☐
(গ) সগিরের কাব্যখানি মৌলিক।	☐	☐
(ঘ) ইউসুফ নাস্তিক ছিলেন।	☐	☐
(ঙ) জোলেখা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।	☐	☐

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।
   (ক) ইউসুফ-জোলেখা ____________ শতাব্দীর কাব্য।
   (খ) সগির প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে __________ এনে ঘটনা ধারায় নূতনত্ব এনেছেন।
   (গ) আরাকান রাজসভার কবি হলেন ________ ________।
   (ঘ) ফারসি ইউসুফ-জোলেখা কাব্য _________ রূপক।

4.9 উত্তর সংকেত

4.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ১৯০৯
   (খ) ১৩টি খণ্ডে
   (গ) লৌকিক জীবনের
   (ঘ) নাট-গীতিকাব্য
   (ঙ) আদি-মধ্যযুগের
2. (ক) কাকিল্যা
   (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
   (গ) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
   (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গন্দর্ভ)
   (ঙ) বাশুলী দেবীর
3. (ক) ঠিক
   (খ) ভুল

(গ) ঠিক

(ঘ) ভুল

(ঙ) ভুল

4.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ভুল

(খ) ঠিক

(গ) ভুল

(ঘ) ভুল

(ঙ) ঠিক

4.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ : ড. সুকুমার সেন।
2. বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা : ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. ক্ষুদিরাম দাস।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
5. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 5 ☐ চণ্ডীদাস সমস্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রস্তাবনা

5.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

5.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

5.5 অনুশীলনী 1

5.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

5.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

5.8 অনুশীলনী 2

5.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

5.10 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

5.11 অনুশীলনী 3

5.12 উত্তর সংকেত

5.13 গ্রন্থপঞ্জি

5.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি চণ্ডীদাস সমস্যা কি এবং সেই সমস্যা কিভাবে সৃষ্ট হ'ল ও তার মীমাংসা সূত্রাদি কি—এ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের প্রাক্‌লগ্নে বৈষ্ণব বদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জেনে—

- বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি স্বভাবের পার্থক্য ও তাঁদের রচনা রীতি নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে পারবেন।

5.2 প্রস্তাবনা

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে দ্বিজ, দীন ইত্যাদি যুক্ত চণ্ডীদাসের ভণিতায় নানা পদ একই ব্যক্তির লেখা কি না—কার সৃষ্টির রস চৈতন্যদেব আস্বাদন করেছেন ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গবেষকগণ কি মতামত দিয়েছেন, তা জেনে বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। ঐতিহাসিকদের অভিন্ন মতামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সঠিক সমাধানের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলির স্বর্ণ-ফসলে ভরা। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই সাহিত্য শাখাটি সুসমৃদ্ধ রূপ পায়। কিন্তু প্রাক্‌ চৈতন্য যুগে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করে

যেভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন—তা বিস্ময়কর। তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও স্মরণীয়। বিদগ্ধ রাজসভার কবির হাতে বিচিত্র সৃষ্টি হলেও বৈষ্ণব পদ রচনার জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

প্রাক্-চৈতন্য যুগেই গ্রামীণ সাধক কবি চণ্ডীদাসের হাতে সহজ সুরে গভীর প্রেমের বেদনার্তিও শুনতে পাওয়া যায়। তন্ময়-মন্ময় কবির সৃষ্টি সম্ভার অনির্বচনীয় প্রেমালোকে পাঠককে নিয়ে যায়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তাই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

5.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

চণ্ডীদাস সমস্যা

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি যে আদি-মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যযুগের—এর প্রমাণ পাওয়া যায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'Origin and Development of Bengali Language' (O.D.B.L.) গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থের ভাষা ও লিপির প্রাচীনত্ব যুক্তি-তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানির আবিষ্কার ও প্রকাশের পরেই বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' জটিল রূপ নেয়। বৈষ্ণব পদাবলির চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কি না? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ রায় রামানন্দের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন?—ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসা 'চণ্ডীদাস' নামটিকে ঘিরে দেখা দেওয়ার ফলেই 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই সমস্যা পূর্ণ সমাধান হয়নি।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে ভণিতা 'চণ্ডীদাস' নামের সঙ্গে বড়ু, দ্বিজ, দীন, দীনহীন, আদি বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত হতে দেখা যায়।

বীরভূমের 'নানুর' অথবা বাঁকুড়া জেলার 'ছাতনা' গ্রামের অধিবাসী চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের লীলারসের যে পদগুলি রচনা করেছেন, তার ভাব-ভাষা ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কোনো দিক থেকেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণবকাব্য ধারা থেকে এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পৃথক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' স্থূল রসের অভিসিঞ্চন এবং নানা অসঙ্গতি আছে এক কথায় একে রসাভাসযুক্ত কাব্য বলা যায়। এ ধরনের কাব্যরস কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করেননি। এর ইঙ্গিত চৈতন্য জীবনী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রভুর আস্বাদনীয় ছিল তারও কথা আছে। সুতরাং এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, মহাপ্রভু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রস আস্বাদন করেননি। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাসের খ্যাতি হৃদয়গ্রাহী রচনায় মোহাবিষ্ট হয়েই মনে হয় বহু খ্যাত-অখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁদের রচিত পদে ভণিতায় নানা বিশেষণসহ 'চণ্ডীদাস' নামটি যুক্ত করেছেন।

'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনামাত্রই বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়-গভীরে ভাব-উদ্বেলতা জাগিয়েছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের তন্ময়-মন্ময়, নিরাবরণ-নিরাভরণ পদগুলিই জাতীয় জীবনে এনেছিল ভাব-বিহ্বল শ্রদ্ধা-ভক্তির প্লাবনধারা। সেই সুযোগ গ্রহণ করে এবং চণ্ডীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতির অসঙ্গত আবেগে বহু অখ্যাত বাঙালি কবি অসার্থক পদ রচনা করে তার সঙ্গে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত

করে দিয়েছেন। যার ফলে আসল চণ্ডীদাসের রচনাসমূহ খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং 'চণ্ডীদাস সমস্যা' জটিলতর রূপ লাভ করেছে। পালাগান রচনা করে গায়েনগণ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত গানগুলি গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়। তাঁদের ভাবব্যাকুল হৃদয় বাছ-বিচারের ধার ধারত না, প্রকৃত মূল্যায়নের প্রয়োজনও বোধ করেনি। শ্রোতৃমণ্ডলীও একই পথের পথিক ছিল।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম পদাবলি প্রকাশের মুহূর্তেই 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পদাবলির মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটিও ছিল। এর সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে চণ্ডীদাস সমস্যা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থকে পদাবলির চণ্ডীদাসেরই অপরিণত বয়সের লেখা বলে চিহ্নিত করেন। তবে এ যুক্তি পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়। মণীন্দ্রমোহন বসু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে চৈতন্য পূর্বযুগে রচিত বলে চিহ্নিত করেন এবং এই কাব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদন করেছেন বলে অভিমত পোষণ করেন। তিনি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলিকে চৈতন্য-উত্তর যুগের সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস রচিত প্রথম শ্রেণীর পদগুলি এবং অন্যান্য উপাধিধারী চণ্ডীদাসের পদগুলি নিয়েই 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সমাধানের জগৎটি এখনও অনিশ্চিত। তবে আধুনিককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণা বিভাগের প্রেরণায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বর্ধমান জেলার বনপাশ থেকে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিতে 'দীন' চণ্ডীদাস 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস, শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় নানা পদ পাওয়া যায়। তবে এই গ্রন্থে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামটি কোথাও নেই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নন—এ সম্পর্কে বর্তমানে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকলেও 'দীন চণ্ডীদাস' এবং পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' একই ব্যক্তি কি না, এ ব্যাপারে অভিন্ন মতামত আজও ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সমাধানে পরবর্তী গবেষণালব্ধ তথ্যাদির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

5.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কার ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবির বৈষ্ণব পদসমূহ বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বড়ু, দ্বিজ, দীন, দীনক্ষীণ ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত লেখাগুলি একই ব্যক্তির কি না—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ও বৈষ্ণব পদাবলির চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলি একজনেরই রচনা কি না—এ বিষয়ে নানা মুনির নানামত থাকলেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ও পদাবলির কবিগণ একই ব্যক্তি নন। এই সমস্যার জট ছাড়াতে গবেষকগণ যে সব তথ্য দিয়েছেন তা ইতিহাসভিত্তিক না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সঠিক সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ গবেষকদের চিন্তা-ভাবনাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করে এই বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নন, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

5.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে প্রদত্ত সম্ভাব্য 4টি উত্তর থেকে বেছে টিক (✓) চিহ্ন দিন উত্তরদানের পর এককের শেষে দেওয়া 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছেন
1. বিদ্যাপতি
2. বড়ু চণ্ডীদাস
3. দ্বিজ চণ্ডীদাস
4. কৃষ্ণদাস কবিরাজ

(খ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'
1. গীতি-কবিতা
2. নাট-গীতি
3. প্রবন্ধ
4. লোক সাহিত্য

(গ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচিত
1. চৈতন্য-পূর্ব যুগে
2. চৈতন্য-পরবর্তী যুগে
3. অন্ত্য-মধ্যযুগে
4. চৈতন্য-সমসাময়িক যুগে

(ঘ) চণ্ডীদাস-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে
1. গবেষকদের ভিন্নমতের জন্য
2. নানা বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাসনামাঙ্কিত পদের জন্য
3. অহেতুক
4. সময় বিচার-বিভ্রাটের জন্য

5.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলি— বিদ্যাপতি

বাংলাদেশের অধিবাসী না হয়েও, বাংলা ভাষায় কাব্য না লিখেও যিনি বাঙালির হৃদয়ের কবিরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন—তিনি হলেন 'কবি সার্বভৌম' 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি। কবি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবিরূপে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। তবে, 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলির জন্যই বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্যাপতির সৃষ্টি-ফসল সমাদৃত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বিদ্যাপতির কবিখ্যাতিকে বাঙালীই পবিত্র হোমাগ্নির মতো রক্ষা করিয়াছে।"

জন্ম ও বংশপরিচয় ঃ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিস্ফী গ্রামে ঠাকুর পরিবারে কবির জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠক্কুর বা ঠাকুর। পিতামহ ছিলেন জয়দত্ত। কবির পিতা ও

পিতামহ পুরুষানুক্রমে মিথিলার হিন্দুরাজসভার গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। এই বংশগত সূত্রেই কবি কিশোর বয়সেই মিথিলার কামেশ্বর বংশের রাজসভার সান্নিধ্যে আসেন। তিনি মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের একাধিক রাজা ও তাঁদের পত্নীদের অনুগ্রহভাজন যে ছিলেন তার প্রমাণ 'কীর্তিলতা'র একাধিক ভণিতাংশ। রাজা কীর্তিসিংহের আমলে গ্রন্থখানি রচিত। ১৪০২-১৪০৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা নিয়ে ঐ সময়েই কাব্যখানি লিখিত হয় বলে গবেষকদের ধারণা। এই গ্রন্থে কবি নিজেকে 'খেলন কবি' বা 'খেলুড়ে কবি' বলেছেন। এতে মনে হয় কবি এই গ্রন্থখানিকে তাঁর কিশোর বয়সের সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কারো কারো মতে গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়েছে।

কীর্তিসিংহের পর কবিকে পাওয়া যায় দেবসিংহের রাজসভায়। এই সময় তিনি 'ভূ-পরিক্রমা' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আছে কবি শিবসিংহের রাজসভাকবিরূপেই তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত অমর বৈষ্ণব পদাবলি। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সন-তারিখযুক্ত তথ্যাদি যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই শিবসিংহের রাজত্বকালের। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা শিবসিংহের কবিকে প্রদান করা একটি দানপত্রের ব্যাপার নিয়ে নানা মতামত দেখা দিলেও বর্তমানে দানপত্রটি আগাগোড়া জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে 'বিদ্যাপতিকৃত লিখনাবলী' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে ২৯৯ লক্ষ্মণ-সংবৎ অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ বারংবার আছে। এ ছাড়াও নানা তথ্য থেকে জানা যায়—কবি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন এবং শক্তসমর্থ ছিলেন। কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও জর্জ গ্রিয়ার্সন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ সমর্থন করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কবির জন্ম এবং ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন। কবি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সার্বিক বিচারে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোনো এক সময়ে আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত কোন সময়ে দেহরক্ষা করেন।

বিদ্যাপতি শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও গণপতির উপাসনা করতেন বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তবে পঞ্চোপাসক কবি সাধারণভাবে পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণব পদাবলির 'প্রার্থনা' পর্যায়ে বিদ্যাপতির পদগুলি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে কবির বৈষ্ণবতা সম্পর্কে ভক্তগণ বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ ঃ বিদ্যাপতির গ্রন্থাদিতে নানা দেব-দেবীর বিষয় আছে, পৃষ্ঠপোষক রাজার জীবনকথাও আছে। সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ, মৈথিল ভাষায় তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবিপ্রতিভা সম্পর্কে 'কীর্তিলতা'র ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন—

"তাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মতো স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্য যে কত সত্য তা তাঁর গ্রন্থাবলি আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিদ্যাপতির 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'—স্মৃতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তির পরিচয় আছে।

'বর্ষক্রিয়া', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী', 'শৈবসর্বস্বসার'—ইত্যাদি পৌরাণিক হিন্দুর পূজা-পার্বণ ও সাধনপদ্ধতির সংকলন গ্রন্থ।

'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা'—তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ। অপভ্রংশজাত মিশ্র অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত।

'ভূ-পরিক্রমা'—ভৌগোলিকের তীর্থ পরিক্রমা। মিথিলা থেকে নৈমিষ্যারণ্য পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা এতে আছে।

'পুরুষ পরীক্ষা'—সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক, লোকায়ত গল্প আছে। উনিশ শতকে উইলিয়ম কেরির প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য হরপ্রসাদ রায় গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করেন। রাজা শিবসিংহের জীবিতকালেই গ্রন্থখানির রচনা শুরু, কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বেই রাজার দেহাবসান ঘটে।

'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থ দুখানি শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবীর আশ্রয়পুষ্ট হয়ে কবি লিখেছেন।

এর পর রাজা নরসিংহদেব ও রাণী ধীরমতি দেবীর পক্ষপুট ছায়ায় কবি রচনা করেন—'দানবাক্যাবলী' ও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'।

দেশী ভাষায় অর্থাৎ 'মৈথিল' ভাষায় বিদ্যাপতি হর-গৌরী সম্পর্কিত পদাবলি ও সামান্য রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করেন। মিথিলা থেকে গ্রিয়ার্সন সাহেব এরূপ কিছু পদ আবিষ্কার করেন।

কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলির যে সব পদ পাওয়া গেছে তার সব পদই বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ মিশ্রিত এক নূতন ভাষা। এই ভাষা 'ব্রজবুলি' নামে চিহ্নিত।

ব্রজবুলি ভাষার স্বরূপ পরিচয় ঃ 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির পদাবলির ভাষা কান্ত-কোমল ব্রজবুলি ভাষা। পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতে এই ভাষা হল—"a kind of bastard language—neither Bengali nor Maithili." অর্থাৎ উৎসহীন এই ভাষা বাংলা বা মৈথিল ভাষা নয়। পূর্বে বাঙালী কীর্তনীয়াদের বিশ্বাস ছিল এ ভাষা 'ব্রজধাম'—অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা। কিন্তু বৃন্দাবন বা ব্রজের যে ভাষা—ব্রজভাষা পশ্চিমী অপভ্রংস তথা শৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে জাত। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদাবলির ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বংশধর। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির 'ব্রজবুলি'র প্রধান উপাদান মাগধী অপভ্রংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিছুটা মিশ্রণ আছে। কাজেই উপাদানের দিক থেকে এই ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দি তথা শৌরসেনী অপভ্রংশের সংমিশ্রণে গঠিত। এ ভাষাকে কিছুতেই মৌলিক ভাষা বলা যায় না। তিনি এই ভাষাকে একরূপ কৃত্রিম কবিভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস বৈষ্ণবপদ এই ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কবি জ্ঞানদাসও এই ভাষায় পদ রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অপরিণত বয়সে ব্রজবুলি ভাষার শব্দতরঙ্গ ও ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ভানুসিংহের ছদ্মনামে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উড়িষ্যা ও সুদূর আসামেও বিদ্যাপতির জীবিতকালে বা অল্পকাল পরে এই ব্রজবুলি ভাষায় যে পদ রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

ড. সুকুমার সেন 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী' নামক গ্রন্থে ব্রজবুলি প্রাচীন ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"মোরাঙ্গ—নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণ এবং অবহট্‌ঠের ঠাঁটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।"

● বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' কেন বলা হয়?

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে—মৈথিল ভাষা ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ পদাবলি রচনা করে বিদ্যাপতি মিথিলার কাব্যকুঞ্জকে সুরমূর্ছনায় বিমোহিত করেছিলেন। সেই সুর মিথিলার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, কামরূপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কবির প্রতি গভীর অনুরাগবশেই তাঁর ভক্তগণ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ 'মৈথিল কোকিল' উপাধিতে কবিকে ভূষিত করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি কবিকুল গৌরব জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক 'গীতগোবিন্দম' কাব্য লিখে সমগ্র পর্ব ভারতের প্রাণের কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তা ছিল সহজবোধ্য কোমল-মধুর। আদিরসের অভিসিঞ্চনে ছিল রসসিক্ত। বিদ্যাপতিও ছিলেন রাজসভাকবি। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলিও শৃঙ্গাররসে আপ্লুত ও রসানুভূতিতে পূর্ণ। উভয়ের পদেই 'বিলাস কলাকুতুহল'-এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই জয়দেব পরবর্তী রসজ্ঞ পাঠক ও ভক্তবৃন্দের কাছে বিদ্যাপতি—'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছেন।

● বাংলা ভাষায় না লিখেও কবি বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান কেন?

রামগতি ন্যায়রত্ন "বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ওপর বাঙালির দাবির যৌক্তিকতা তত্ত্ব ও তথ্যসহ তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যের কিছুটা অংশ হল—"বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশের এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলা যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন।...অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবত উভয় দেশের 'ভাষায়'ও অনেকাংশে একবিধ ছিল;.. অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদুর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যে কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সংগীত বঙ্গদেশের ধর্ম-প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সংগীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারি না।" গ্রিয়ার্সন সাহেবও বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির বিস্তৃত প্রভাবের কথা বলেছেন। অ-বাঙালি হলেও বিদ্যাপতি বাঙলাদেশের ভাব-ভাবনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যুগ যুগ ধরে কাব্যরসপিপাসু বাঙালির হৃদয় তাঁর কাব্যরসধারায় অবগাহন করে তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব পদ সংকলনেই বিদ্যাপতির স্থান আছে। অদ্বৈতাচার্য, নরহরিদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিই বিদ্যাপতির বন্দনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বিদ্যাপতির পদের একান্ত

অনুরাগী ছিলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর মহাজন-কাব্যাস্বাদন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন—

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।"

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখা যায়—

"জয়দেব-বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।।"

এরূপ যশগাথা বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

সব দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে বিদ্যাপতির স্থায়ী আসন লাভের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বিদ্যাপতির পদাবলির মূল্যায়ন ঃ বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। মিথিলায় তাঁর প্রসিদ্ধি স্মার্ত ও রাজকীয় কীর্তি-কাহিনীর রূপকার হিসাবে। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব পদাবলির অতুলনীয় রূপদক্ষ শিল্পী। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাঙালি পাঠক বিদ্যাপতির রসধারায় স্নাত হয়ে পদাবলির রসাস্বাদন করে তৃপ্ত। বিদ্যাপতি লৌকিক প্রেমজগৎ থেকে অলৌকিক প্রেমের জগতে পৌঁছেছেন। তাঁর সাধনা—মানব প্রেমকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে রূপান্তরের সাধনা। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যেই বিদ্যাপতির কবি-কর্মের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা চরিত্রের তিনটি পর্ব—(ক) বয়ঃসন্ধি পর্ব, (খ) অভিসার মিলন-সম্ভোগ-মান পর্ব, (গ) মাথুর বা বিরহ পর্ব। এই তিনটি স্তরেই রাধা চরিত্র কবি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন।

রাধার বয়ঃসন্ধিকাল—যৌবন আরম্ভের মুখে—স্বপ্নে বিভোর, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে ভরা। রাধার উপলব্ধি—"আওল যৌবন শৈশব গেল"। নবগাত প্রেমলগ্নে রাধার হৃদয় গভীরে বেদনার চেয়ে বিলাস বেশি প্রকাশ পেয়েছে। নব-অনুরাগের লীলাচাপল্যে মুখর শ্রীরাধিকা।—স্থৈর্য্য নেই।

"ঘনে ঘনে নয়ন কোণ অনুসরঙ্গ।
ঘনে ঘনে বসন ধুলি তনুভরঙ্গ।।"

রাধিকা নিজ শরীরে যৌবনের আবির্ভাব দেখে পুলক বন্যায় ভেসেছে—

"নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হমই সে আপন পয়োধর হেরি।।"

অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটার সঙ্গে মাধুর্য ও সৌরভ মিশে বিদ্যাপতির রাধা বন-কুসুমের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

পূর্বরাগের পর্যায়েই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—চির প্রেমের চির অতৃপ্তির বাণী—

"জন্ম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এবং "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

অভিসারের পদে নব-অনুরাগিণী-রাধিকা অভিসারে চলেছেন—পথের সব বাধা, সংসার-সমাজ সব কিছুকে তুচ্ছ করে।

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা।।"

এই পর্যায়ে বিদ্যাপতি প্রকৃতপক্ষে দেহ-সম্ভোগের কবি। তিনি শ্রীরাধাকে অলঙ্করণ মণ্ডলকলায় যেভাবে সাজিয়েছেন, তার ভাবরূপের যে চিত্র এঁকেছেন—তা তুলনারহিত। এর পরেই মধুর মিলনের "কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন কলরব নূপুর বাজে।" জয়দেবের ঐতিহ্য অনুসরণে এখানেই কাব্যের সমাপ্তি রেখা টানার কথা। কিন্তু বিদ্যাপতি তা করেননি। 'মাথুর' কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবনে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার। রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হৃদয় দীর্ণ করুণ আর্তি।

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

মাথুরের পর ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ে রাধার ভাবাকৃতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্ন রূপ পেয়েছে। কৃষ্ণকে অভ্যর্থনার জন্য আকুতি মেশানো রাধার নূতন আয়োজনের ব্যস্ততা—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।"

বিদ্যাপতির প্রেম ভাবনা এই পর্যায়ে দেহ থেকে দেহাতীত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রাধার ভাবমন্দিরে এক অতীন্দ্রিয় রসানুভূতি জেগেছে। চির নবীন প্রেমের জগতে দেখা দিয়েছে পুরাতন প্রেমের স্থায়ী দ্যুতি।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।"

ভাব-বৃন্দাবনের এই মিলন-চিত্র নির্মাণে বিদ্যাপতি জয়দেবকে অতিক্রম করে—'অভিনব জয়দেবে'র অভিনবত্বকে প্রকাশ করেছেন।

'প্রার্থনা অংশে পরিণত বৃদ্ধ কবির কণ্ঠ ত্রিতাপদগ্ধ সকল মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। আত্মসমীক্ষার পথ ধরে জ্ঞান ও কর্মের অহংকারকে দূরে রেখে নিঃশর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে জীবন-মন সমর্পণ করে ভক্তিনম্র চিত্তে কবির প্রার্থনা—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়াপদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।"

শান্ত রসাশ্রিত প্রার্থনার পদগুলি নিঃসন্দেহে হৃদয়স্পর্শী।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলংকরণ মণ্ডলকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি তুলনারহিত। পজ্ঝটিকা, দোহা, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, বিষম প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগে কবির শৈল্পিক

চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ-বেদনা ও অতৃপ্তির পাশাপাশি তৃপ্তি ও উল্লাসের সীমাহীন রূপও বিদ্যাপতির পদগুলি জীবন আনন্দে ভরে তুলেছে। তাঁর মতো রসনিপুণ স্রষ্টা বিরল।

বিদ্যাপতির প্রভাব ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বাঙালি কবি বিদ্যাপতির ছদ্মনামে বেশ কিছু পদ লিখেছেন। তবে প্রত্যক্ষভাবে গোবিন্দ দাসই বিদ্যাপতির যোগ্য ভাবশিষ্য। তিনি বিদ্যাপতির কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদও সম্পূর্ণ করেন এবং দুজনের ভণিতায় সেগুলি এখনও প্রচারিত। শ্রীরঘুনন্দনের এক ভক্তশিষ্য 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি কখনও কখনও 'বিদ্যাপতি' ভণিতাও ব্যবহার করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

"আমরা মৈথিল বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ী খুলিয়া ধুতি চাদর পরাইয়াছি।"—আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত।

5.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

মিথিলার রাজসভাকবি হয়েও বিদ্যাপতি কীভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করলেন তা বিস্ময়কর। স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় চরম পাণ্ডিত্যের পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি ব্রজবুলি ভাষায় রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ দিয়ে রচনা করেছেন রসসমৃদ্ধ পদসমূহ। ভাষার লালিত্য ও অলংকারের মণ্ডল কলায় তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ কবির হাতে সুস্নিগ্ধ পূর্ণরূপ পেয়েছে। 'সুখের কবি'—শৃঙ্গার রসের প্লাবন ধারায়—প্রেমতরী ভাসিয়েছেন। পুলকবন্যায় ভেসে কবির রাধিকা 'নব অনুরাগিণী' হয়ে অভিসারে পা বাড়িয়েছে। কবির প্রভাবে গোবিন্দ দাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছেন। নানা বিষয়ের গ্রন্থাদি লিখলেও বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি আজও বাঙালির হৃদয়গভীরে অনুরণন জাগায়। কবির জন্ম ও বংশপরিচয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজা ও রানিদের সংস্পর্শে ও উৎসাহদান, কবির নানা সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত তথ্যাদির পর বিদ্যাপতির পূর্বরাগ থেকে শুরু করে প্রার্থনার পদ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনায়, কবির মূল ভাব-বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতিসহ আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

5.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখান। উত্তর করা হয়ে গেলে 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন।	☐	☐
(খ) বিদ্যাপতি মধুর রসের কবি ছিলেন।	☐	☐
(গ) বিদ্যাপতি শুধুমাত্র ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা লিখেছেন।	☐	☐
(ঘ) বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস।	☐	☐
(ঙ) বিদ্যাপতি আধুনিক যুগের কবি।	☐	☐

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন। এর পর 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

(ক) .... বিদ্যাপতির জন্মস্থান।

(খ) .... গ্রন্থখানি সংস্কৃতে লেখা।

(গ) .... রাজসভাকবি রূপেই বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য রচনা করেন।

(ঘ) বিদ্যাপতি .... শেষার্ধ্বে আবির্ভূত হন।

(ঙ) .... রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

(চ) প্রার্থনা অংশটি কবি বিদ্যাপতি .... রচনা করেন।

5.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ)

বৈষ্ণব পদাবলির চণ্ডীদাস

প্রাক্-চৈতন্য যুগে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ছাড়াও দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। পূর্বে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করা হলেও চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও পদাবলির চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন।—পদাবলির চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে বা সমকালে বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস ছিলেন "ভাবের রত্নাকর"। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর পদসমূহকে 'রুদ্রাক্ষের মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সহজিয়া তত্ত্বকে আশ্রয় করে কবি কিছু হেঁয়ালি কবিতা রচনা করলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে তিনি যে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী ভাব-উদ্দীপক পদ রচনা করেছেন তার জন্যই কবি স্মরণীয় হয়ে আছেন। চণ্ডীদাসের পদগুলি চার-পাঁচশো বছর ধরে বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে রয়েছে। কবির খ্যাতিকে অবলম্বন করেই কবির ব্যক্তিজীবন ও নানা অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। সীমাহীন জনপ্রিয়তার জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—গ্রন্থের তত্ত্ব ও তথ্যাদি অনুসারে চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি।

জন্মস্থান ও ব্যক্তিপরিচয়— পদাবলির চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও ব্যক্তিপরিচয় সুস্পষ্টরূপে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির জন্মস্থান নিয়ে দুটি দাবি আছে। কেউ কেউ বলেছেন কবির জন্মস্থান বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে—অন্যদের দাবি কবির জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। নানা বাদ-বিতণ্ডা থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে স্বীকৃত কবির আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দীর উত্তরপর্বে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে। তবে এ ধারণা—অনুমানভিত্তিক।

কবি প্রতিভা—কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে চণ্ডীদাসের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে—

"বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
চণ্ডীদাস কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে।"

শ্রীক্ষেত্রে আত্মভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছেন, শত-শত বছর ধরে বাঙালি সমাজ চণ্ডীদাসের পদামৃত মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে গ্রহণ করে চলেছে। কবি চণ্ডীদাসের লেখনীতে পার্থিব প্রেম প্রাপ্তি-

অপ্রাপ্তি ও সুখ-দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রেম যেন—'নিকষিত হেম।' কবি-সাধক চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকে বাস্তব জীবনবোধ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে গেছেন। সহজিয়াধর্ম সাধনার পথ ধরে হাঁটলেও তার পদে রোমান্টিকতার ছোঁয়া আছে। 'যেমন আছ—তেমনি আসো আর করো না সাজ'।—ছিল কবির একান্ত কাম্য। যার ফলে তার পদ নিরাবরণ-নিরাভরণ হলেও—ভাবগভীরতায় অতলস্পর্শী। অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দূরবগাহী অনন্ত প্রেমের প্রদীপ-শিখা কবি জ্বেলেছেন।

'বঁধু-কি আর বলিব আমি।
জীবনে-মরণে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।'

এখানে রাধা প্রাণমন ঢেলে নিঃশর্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথমাবধি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর—আত্মহারা। কৃষ্ণের নাম শুনেই দিশেহারা—আত্মভোলা।

'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।"

চণ্ডীদাসের পদসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ভাগকরা যায় না। তবু পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, নিবেদন পদগুলিতে চণ্ডীদাস সহজ, সরল অকৃত্রিম ভাষায় গভীর-ঐকান্তিক বিশুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণ প্রতিমা গড়ে তুলেছেন।

'আক্ষেপানুরাগে'র একটি পদে রাধিকা কুল-শীল-জাতি-মান তুচ্ছ করে কৃষ্ণগত প্রাণা হয়েছেন। রাধিকার হৃদয়-বেদনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। এজন্যই সমালোচক চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি'—বলে অভিহিত করেছেন।

অভিসার পর্বের—

"এ ঘোর রজনী-মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

পদটিতেও রাধিকা অন্তর-বেদনার দীর্ণ। পূর্বরাগের বিশিষ্ট কবি 'প্রেম বৈচিত্ত্য' ও আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন।

গীতি-প্রাণতা চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রাম বাংলার কবি নিজেকে রাধার বিরহ-আর্তি ও অনুভূতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। ভাবপ্রবণ কবিসত্তা কোমল-করুণ-সুন্দর। তাঁর গভীর প্রেমানুভূতিই রাধার মধ্যে প্রকাশিত কামনা-বাসনা যখন জগতের উর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় আত্মহারা ভাব আনতে সক্ষম হয়েছে।

"এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।"

আত্মমগ্ন অনুভূতির পথ ধরেই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের জগৎ ছেড়ে রাধিকা ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জগতে

ডুবে গেছেন। সূক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়ায় চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা রূপ থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার জগতে যে সব চেয়ে আপনার-অন্তরের— সেই সবচয়ে দূরের—তাই গভীর আলিঙ্গন মুহূর্তেও চণ্ডীদাসের লেখনীতে চিরন্তর আর্তি—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।।"

চণ্ডীদাসের পদাবলি গভীর উপলব্ধির সামগ্রী—বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু নয়। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "কঠোর ব্রত-সাধনা স্বরূপে প্রেমসাধনা করাই চণ্ডীদাসের ভাব; সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে।"

চণ্ডীদাস সহজ-সরল ভাষায়, ত্রিপদী ছন্দে অতি সাধারণ অলঙ্কার ব্যবহার করেও রাধার অন্তর্বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাতেই তাঁর শিল্প-চেতনার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। সহজ-স্বাভাবিক গতি ধারায় শব্দের সঙ্গে শব্দের মালা গেঁথে তিনি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কবির রূপসিদ্ধির স্বরূপটি। এককথায় ভাব ব্যাকুলতা ও গভীরতায় চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে—"চণ্ডীদাসের এক একটি শব্দযোজনা, বাগ্‌ধারা আমাদের মনের তারে ঘা দিয়ে যে সুর সৃষ্টি করে তা অর্কেস্ট্রা নয়, মেলডি নয়, সে যেন ভাষাহীন, প্রকাশহীন, করুণ বেদনার মর্মদাহ।"

চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য জ্ঞানদাস পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসের ভাব-গভীরতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার মূর্ছনাকে—সঠিকভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, 'সুখের কবি'। তাঁর পদাবলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নিটোল মুক্তোর মতো, তাঁর হাতে রাধিকা বাস্তব জীবনের পথ ধরে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি নিপুণ শিল্পীর মতো প্রেমের রত্নহার গড়েছেন। তাঁর কাব্য যেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। ভাষার লালিত্যে, অলঙ্করণে, সাজ-সজ্জায়, এক কথায় প্রকাশ কলা সৌষ্ঠবে বিদ্যাপতি এক অনন্য কবি। বিরহ অর্থাৎ মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির কবি-ভাবনা গভীর।

অন্যদিকে চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার কবি। সহজ-সরল বাংলা ভাষায় আশা-ভাষা ও ভালোবাসা দিয়ে তন্ময় চিত্তে, ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি রাধা-কৃষ্ণের লীলারস সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। প্রাণের আবেগে—মন্ময় চিত্তে তিনি অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে ডুবে গেছেন। তাঁর কবিতাকে সমালোচক 'রুদ্রাক্ষের মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিদ্যাপতির পদ 'ভাষার তাজমহল' আর চণ্ডীদাস যেন 'ভাবের রত্নাকর'। বিদ্যাপতির কবিতাকে ঊর্মিমুখর সমুদ্রের সঙ্গে আর চণ্ডীদাসের কবিতাকে ধ্যানগম্ভীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চণ্ডীদাস 'দুঃখের কবি'। বাসুলীর উপাসক কবি চণ্ডীদাস আত্মভাবে বিভোর হয়ে পদ রচনা করেছেন। প্রকাশ কলার সৌন্দর্যে যেমন বিদ্যাপতি— তেমনি অনুভব-সুন্দর প্রেমের সার্থক স্রষ্টা চণ্ডীদাস।

5.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

বীরভূম জেলার নান্নুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামীণ জীবনের সারল্য তাঁর সৃষ্টির চরণে-চরণে আছে।

তিনি সহজ সুরের মরমিয়া কবি ছিলেন। 'দুঃখের কবি'—চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন। তাঁর খ্যাতিকে অবলম্বন করেই একাধিক কবি ঐ নামে পদ রচনা করেছেন। সহজিয়া ধর্মসাধনার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কবি রোমান্টিক জগতে পৌঁছেছেন। নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে তাঁর সৃষ্ট রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেছে। বিদ্যাপতির মতো তাঁর রাধিকার ক্রমবিকাশ নেই। পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়েই রাধিকা তাঁর হাতে হয়েছে সাধিকা। নিরাবরণ-নিরাভরণ সাজে তিনি পদগুলির রূপ দিয়েছেন। রাধিকার হৃদয় বেদনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে ঝরে পড়েছে। বাস্তবজগত থেকে শ্রীরাধিকা-ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের জগতে নিমগ্ন হয়েছে। তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়া আছে।

5.11 অনুশীলনী (তৃতীয় অংশ)

1. নীচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। পরে ৫৭ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) চণ্ডীদাস
1. শহরের কবি
2. রাজসভার কবি
3. গ্রামীণ কবি
4. বাণিজ্যিক এলাকার কবি

(খ) চণ্ডীদাস
1. সুখের কবি
2. দুঃখের কবি
3. নৈরাশ্যের কবি
4. আশাবাদী কবি

(গ) 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদটি
1. পূর্বরাগের
2. প্রার্থনার
3. মাথুরের
4. অভিসারের

(ঘ) 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির রচয়িতা
1. বিদ্যাপতি
2. চণ্ডীদাস
3. গোবিন্দদাস
4. জ্ঞানদাস

2. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন এবং ৫৭ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি।	☐	☐
(খ) 'যেমত যোগিনী পারা' পদাংশটি পূর্বরাগের।	☐	☐
(গ) চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস।	☐	☐

3. মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সূচনা কোন্ সময় বুঝিয়ে বলুন।
5. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আবিষ্কর্তা ও রচয়িতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
6. বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' কেন বলা হয়, সংক্ষেপে বলুন।
7. মৈথিলী বা ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদ রচনা করা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গে কেন আলোচনা করা হয়, বলুন।
8. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
9. চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলার কারণ কী, বুঝিয়ে বলুন।
10. চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

5.12 উত্তর সংকেত

5.12.1 অনুশীলনী 1

1. (ক) বড়ু চণ্ডীদাস, (খ) নাট-গীতি, (গ) চৈতন্য পূর্বযুগে, (ঘ) নানা বিশেষণযুক্ত পদের জন্য।

5.12.2 অনুশীলনী 2

1. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল।

2. (ক) বিস্‌ফি গ্রাম, (খ) পুরুষ পরীক্ষা, ভূ-পরিক্রমা, (গ) শিব সিংহের, (ঘ) চতুর্দশ শতাব্দীর, (ঙ) চৈতন্য চরিতামৃতে, (চ) জ্ঞান ও কর্মের অহঙ্কারকে দূরে রেখে/ভক্তি নম্র চিত্তে।

5.12.3 অনুশীলনী 3

1. (ক) গ্রামীণ কবি, (খ) দুঃখের কবি, (গ) অভিসারের, (ঘ) বিদ্যাপতি।

2. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক।

3. 3 থেকে 10 নম্বর প্রশ্নের উত্তর আপনার পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি করা হ'ল না।

5.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. ক্ষুদিরাম দাস।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : ড. ভূদেব চৌধুরী।

একক 6 ❑ অনুবাদ সাহিত্য

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য
6.2 প্রস্তাবনা
6.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ রামায়ণ
6.4 সারাংশ
6.5 অনুশীলনী 1
6.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ মহাভারত
6.7 সারাংশ
6.8 অনুশীলনী 2
6.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ ভাগবত
6.10 সারাংশ
6.11 অনুশীলনী 3
6.12 উত্তর সংকেত
6.13 গ্রন্থপঞ্জি

6.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলাভাষায় অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গ্রন্থাদি কোন্ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে— কোন্ কোন্ রচনাকারের দ্বারা কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, তা জানতে পারবেন।
- রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জেনে তাঁদের সৃষ্টি সম্ভারের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসুর কবি-জীবন ও তাঁদের বাংলা অনুবাদশাখায় অবদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন এবং প্রত্যেক লেখকের ভাবনা ও রচনাশৈলীর মৌলিক পার্থক্যগুলিও ধরতে পারবেন। এছাড়া এই ত্রিধারা অনুবাদ কর্মে অন্যান্য খ্যাত-অখ্যাত কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু ধ্যান-ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

6.2 প্রস্তাবনা

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলা ভাষায় অনূদিত হবার ফলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মধ্যযুগের এই অনুবাদ-সাহিত্য বাঙালি চিন্তা-চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মূল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই ভাষা ছিল দুরূহ; উচ্চবর্গের শিক্ষিত ও জনমণ্ডলীর মধ্যেই এইসব গ্রন্থের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ বাঙালির পক্ষে কাব্যরস আস্বাদন ছিল দুঃসাধ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—(প্রথম পর্যায়)-এর ৩য় এককে তুর্কী আক্রমণ ও তার ফলাফল সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। এই এককে বিদেশী পাঠান সুলতানদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভিত গড়ে উঠল, তা জানতে পারবেন এবং হতমান জাতীয় জীবনে আলোচ্য ত্রয়ীকাব্য বাঙালি মানস বিবর্তনে, কীভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে, তারই ইঙ্গিত পাবেন।

হুবহু আক্ষরিক অনুবাদের রীতিকে বর্জন করে সংস্কৃত মূল গ্রন্থাদির বিষয়াদি সংক্ষেপে, কোথাও কোথাও নূতন ঘটনা-কাহিনী সংযোজন করে, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত অনুবাদ গ্রন্থ বাঙালির হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ও মালাধর বসুর ভাগবত রচিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক। বিভিন্ন লেখকদের কথা উল্লেখ করে মূলত কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসুর অবদানই মূলপাঠ হিসাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এছাড়া রামায়ণের অনুবাদকরূপে চন্দ্রাবতী, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, অদ্ভুত আচার্য; মহাভারতের বাংলা রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীধর নন্দী প্রমুখের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান এবং ভাগবতকে কেন্দ্র করে নানা রূপে লেখা রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস প্রমুখ স্রষ্টাদের সৃষ্টির কথাও আপনাদের জানার জগৎকে সমৃদ্ধ করবে।

6.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ রামায়ণ

কৃত্তিবাস ঃ খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দু'শো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গনে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ—তুর্কী আক্রমণ, মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং সম্ভবত ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই বঙ্গদেশকে তুর্কী শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কী শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিকও উদঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং তাঁর পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৯-১৫৩২)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন 'এ বঙ্গের অলঙ্কার' কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি ঃ কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হলো।

কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়—তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ওরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়—

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখালি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিণী।।

নরসিংহ ওঝা

মুরারি | সূর্য | গোবিন্দ

মুরারি
বনমালী মালিনী/
(কৃত্তিবাসের মা)
কৃত্তিবাস

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী (মেনকা)। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বায় শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘমাস।
এথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

—এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন—তেরশকুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন, রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২-১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস-সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড়গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দনজলে অভিষিক্ত করেন, মাল্যভূমিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথাও উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজা গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ, কবির জন্ম যদি ১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে, কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গল-বিধৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইনি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং, কৃত্তিবাসের জন্মবৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের

ক্ষেত্রে বহু মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হননি।" সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

কাব্য পরিচিতি ঃ পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে কার্য-সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে অনেক কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মত করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হলো—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য, 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'সুন্দর', 'লঙ্কা' ও 'উত্তর'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরস উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক বলিষ্ঠতা লাভ করেছিল, কৃত্তিবাসের হাতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল ফেলব বাঙালির চরিত্রের মত হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন মূর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্য দিয়ে অভিমানক্ষুধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকী রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী'—কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কোমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তাঁর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজনরসিকতা, আলস্যপরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে, এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সব কিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিলেন—মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাঁপর ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধূর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ ঃ "প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আটদিনে 'অষ্টনোই', তেরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর। করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্রবধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে; সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসে ও উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরসে ভরা গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মত চিরকাল আস্বাদন করছেন।

কৃত্তিবাসের নামে এখন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে-ঘসে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কৃত্তিবাস ছাড়া যাঁরা রামায়ণের অনুবাদ করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গ্রন্থাদির মুল্যায়ন করা হ'লো।

(ক) চন্দ্রাবতী ঃ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি হিসাবে চন্দ্রাবতীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাব্যখানি রচনা করেন। চন্দ্রাবতী রচিত 'রামায়ণ' গানের সমষ্টি এবং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণ। আধুনিক বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা দ্বিজবংশী দাস ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান আঞ্চলিক সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। কাব্যটি মহিলা সমাজে খুবই জনপ্রিয়। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে এটি গাওয়া হয়।

(খ) কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ঃ ষোড়শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের রাজসভার কবি ছিলেন। অনেক গবেষক 'কবিচন্দ্র'কে কবির উপাধি বলে মনে করেন। কবির রামায়ণ খুবই জনপ্রিয়। অনেকের ধারণা—কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত কাহিনী রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়সর' ও 'তরণীসেন বধ' রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে মনে করা হয়। শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত কবির আসল নাম। তাঁর রামায়ণ 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাত।

(গ) অদ্ভুত আচার্য ঃ অদ্ভুত আচার্য সপ্তদশ শতকের কবি। কবির আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রঘুবংশ থেকে অনেক কাহিনী কবি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে কবি নিত্যানন্দ 'অদ্ভুত আচার্য' নামে পরিচিত। আধুনিক বাংলাদেশের

পাবনা বিকল্পে রাজসাহী জেলায় কবির নিবাস ছিল। সমগ্র উত্তরবঙ্গে কবির রামায়ন গানের আদর-কদর ছিল। কবির প্রকাশভঙ্গিতে সহজ কবিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

6.4 সারাংশ

বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণের আদি কবিরূপে কৃত্তিবাস সর্বজনবিদিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, রচনায় তিনি স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালির রুচি-রস অনুযায়ী কাব্যকে সাজিয়েছেন। তাঁর হাতে সংস্কৃত কাব্যের চরিত্রগুলি বাঙালির ঘরোয়া আদর্শ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ভক্তিরসের প্লাবনে কাব্যখানি ভেসে গেছে। এই রসের জন্যই 'মুদির দোকান থেকে রাজপ্রাসাদ' পর্যন্ত আপামর বাঙালির চিত্তকে কবি জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে কালধর্মানুযায়ী কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূল সুরটি আজও বজায় আছে। আদিকবি বাল্মীকির 'শূরধর্মী' কাব্য কৃত্তিবাসের হাতে হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী'।

কৃত্তিবাস ছাড়া রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে চন্দ্রাবতী, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ও অদ্ভুত আচার্যের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসই জাতীয় কবি রূপে সুচিহ্নিত।

6.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিকে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাস পাঁচালির ঢঙে মূল রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন।	☐	☐
(খ) কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'শূরধর্ম' প্রাধান্য পেয়েছে।	☐	☐
(গ) উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে প্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হয়।	☐	☐
(ঘ) নিত্যানন্দ আচার্যই 'অদ্ভুত আচার্য' নামে খ্যাত।	☐	☐
(ঙ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত নয়।	☐	☐

2. নীচের বিবৃতিগুলির নীচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠিক তার ডানপাশের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস" চরণটির 'পুণ্য' শব্দকে 'পূর্ণ' ধরে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি হিসাব করে কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ধারণ করেন :

1. ১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ ১৬ মাঘ; ☐
2. ১৪৩২-১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ; ☐
3. ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ; ☐
4. ১৬০০-১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ; ☐

(খ) কৃত্তিবাসের হাতে সীতা হয়েছেন :

1. লজ্জাশীলা বাঙালি বধূ; ☐
2. শিক্ষিতা নাগরিক বধূ; ☐

3. উগ্র মেজাজের বধূ; ☐

4. অমার্জিত বধূ ☐

(গ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ হয়েছে :

1. ভারতের জাতীয় মহাকাব্য; ☐

2. বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য; ☐

3. সমগ্র পৃথিবীর মহাকাব্য; ☐

4. আঞ্চলিক মহাকাব্য। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কৃত্তিবাসের গ্রন্থ —————ঢঙে রচিত।

(খ) শ্রীরামচন্দ্রের—————মূর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(গ) কৃত্তিবাসের হাতে দশরথ হয়েছেন————।

(ঘ) কৃত্তিবাসের পিতা———— মাতা ———।

(ঙ) অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাস———— দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

6.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ মহাভারত

আঠারো পর্বে রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ হলো মূল সংস্কৃত মহাভারত। বেদব্যাসের এই গ্রন্থ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কয়েকজন কবি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং এদেশের শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তবে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কাছে অন্যান্য অনুবাদকদের সৃষ্টি অনেকটাই ম্লান। কাশীরাম দাসের পূর্বে কোনো কবিই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হননি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁরা মহাভারতের অনুবাদ করেন তাঁরা হলেন—(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও (খ) শ্রীকর নন্দী। এই দুই কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো—

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা বলে গণ্য করা হয়।

বাংলার সুলতান হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দু গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে তিনি সভাকবিরূপে নিযুক্ত করে মহাভারতের অনুবাদ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরমেশ্বর অনুবাদ সংক্ষিপ্ত। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ না হলেও পরমেশ্বর কাব্য সহজ-সরল ভাষায় লিখিত। তাঁর রচিত মহাভারতের নাম ‘পাণ্ডব বিজয়’ বা ‘মহাভারত পাঞ্চালিকা’। ‘কবীন্দ্র’ কবির উপাধি। মূল তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে তিনি মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শুধু কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। গবেষকদের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক বলে চিহ্নিত।

(খ) শ্রীকর নন্দী—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক বা অল্প কিছুকাল পরে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের ‘অশ্বমেধ’ পর্বটি রচনা করেন। পাণ্ডবদের যাগ-যজ্ঞাদি, যুদ্ধমহিমা ইত্যাদি ছুটি খাঁ পছন্দ করতেন।

শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি মহাভারত'-এর 'অশ্বমেধ পর্ব' অবলম্বনে সংক্ষেপে মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' অনুবাদ করেন। এখানে কবি লিখেছেন—

শুনিব ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।

লঘুকৌতুক হাস্য-পরিহাসের উচ্ছল-উজ্জ্বলতায় কাব্যখানি ভরা। কবির রচনাশৈলীও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের চেয়ে অনেকটা ভাল।

(গ) সঞ্জয়—সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কারের ফলে সঞ্জয় নামে একজন মহাভারত অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে 'সঞ্জয়' নামে পৃথক কোনো কবির অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে পরমেশ্বরের কাব্যই সঞ্জয়ের মহাভারত। উভয় গ্রন্থের নিকট সাদৃশ্যের জন্যই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কবি ভনিতায় নিজের নাম উল্লেখ না করে মহাভারতের সঞ্জয়ের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। পরমেশ্বরের গ্রন্থের অনেকটা অংশই সঞ্জয়ের রচনায় পাওয়া যায়। মাঝে-মধ্যে তাঁর নিজের লেখার চিহ্ন ছিটেফোঁটা আছে। রচনাশৈলীও উন্নতমানের নয়।

সঞ্জয় লিখিত মহাভারতের পুঁথি পাঠ করে গবেষকগণ মনে করেন—কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। সঞ্জয় সম্পর্কে এতদিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক মুনীন্দ্র কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সঞ্জয়ের মহাভারত প্রকাশিত হবার পর। বর্তমানে সঞ্জয় পৃথক রূপেই স্বীকৃত।

কাশীরাম দাস ঃ কৃত্তিবাসের মত বাঙালির জীবন-জিজ্ঞাসায় যিনি নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন, মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক—কাশীরাম দাস।

পরিচিতি ঃ বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগনার ব্রাহ্মণী নদী তীরে সিঙ্গি (সিদ্ধি) গ্রামে কায়স্থ বংশে কবির জন্ম। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও এই শতকের শেষের দিকে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। বংশটি বৈষ্ণব ভাবাপ্লুত। কাব্যখানি সমাপ্ত হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে।

"চন্দ্রবাণ পক্ষঋতু শকসুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।।"

—এই দুটি চরণ থেকেই যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিমশায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিরাট পর্বটি শেষ হয়েছে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। তবে, কিংবদন্তী আছে যে, আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিছুটা অংশ রচনার পর কাশীরাম দাসের স্বর্গলাভ ঘটে। বাকি অংশটা কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দরাম সম্পন্ন করেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, শান্তি পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও জয়ন্ত দাসের রচিত। তবে একথা ঠিক যে পূর্বের পর্বগুলির সঙ্গে শেষের পর্বগুলির তুলনাত্মক বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে—ভিন্ন হাতের ছোঁয়া আছে। কবির ভাষায় সাবলীলতা শেষাংশে নেই। কিংবা কাশীরামের বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিমাও অনুপস্থিত।

মধুসূদন দত্ত কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সনেটে লিখেছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।

—কবির কাশীরামের প্রতি এই অর্ঘ্য যথার্থ। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত কাশীরাম দাসের ভারত পাঁচালিও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে যুগে যুগে নন্দিত-বন্দিত।

কাব্য পরিচিতি ঃ কাশীরাম বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্য ঐতিহ্যই ছিল তাঁদের বৈষ্ণব চেতনার উৎসমূলে। চৈতন্য ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাশীরাম তাঁর কাব্য উপহার দেন—যার ফলে মহাভারতের উদাত্ত বীর্যগাথা কোমল-স্নিগ্ধ প্রেমকথায় রূপান্তরিত হয়েছিল। মহাভারতের কৃষ্ণধনঞ্জয় বীরত্বের আসন ছেড়ে বাংলার পেলব-কোমল মূর্তি ধারণ করেছে কাশীরামের হাতে। বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য তুলে ধরাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কবি ব্যাসদেবকে হুবহু অনুসরণ করেননি। পর্বগুলির নামকরণের ক্ষেত্রেও অনেক হেরফের ঘটিয়েছেন। মূলের অনুশাসন পর্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব কাশীরামে নেই। আবার দু-একটি পর্বের নামেরও পরিবর্তন করেছেন। মহাকবির কল্পনা, ঐশ্বর্য ও রস-গভীরতা কবির তেমন না থাকলেও পাণ্ডিত্য এবং লোকোত্তর কবিত্বগুণে ভারতকথাকে তিনি সর্বজনের আস্বাদন যোগ্য করে তুলেছেন। মূলের কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন যেমন করেছেন তেমনি নূতন কাহিনী ও কল্পনার সংযোজন করেছেন। শ্রীবৎস্যচিন্তা, সুভদ্রাহরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে কাব্যখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। তৎসম শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও পয়ার এবং একাধিক ধরনের ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি সংগ্রথিত হওয়ায় কাব্যপাঠের ক্ষেত্রেও নূতন সুর, তাল, লয় এসেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও কবির পাণ্ডিত্য ছিল। এজন্য সমালোচক বলেছেন, "কবির অলঙ্কার নির্বাচন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এবং রূপানুভূতির উল্লাস স্পন্দনে মূর্ত।" করুণ রস সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রিয়পুত্র অভিমন্যু বধের পর অর্জুনের মর্মভেদী আর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল :

"কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়।।"

কয়েকটি রেখায় এমন অব্যর্থ করুণ রসের সৃষ্টি সত্যিই দুর্লভ। বীর ও হাস্যরসের মিশ্রণে কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে "দণ্ড হাতে যম আর বজ্র হাতে ইন্দ্র" সমভয়ংকর ভীম-অর্জুন যে দিকে চাইছেন ঠিক সে মুহূর্তেই বিপক্ষ দলের "হেলায় সকল সৈন্য তুলা যেন ধায়"—দৃশ্যটি করুণ ও হাস্যবহ। তবে কৃত্তিবাস যুদ্ধ বর্ণনায় গাছপালা ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করে যে কৃত্রিম আবহ-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন সেখানে কাশীরাম দাস অনেকটাই রণোন্মাদনার সাহসিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অনুবাদে কবির হাতে প্রায় সর্বত্রই ব্যাসদেবের শূরধর্মী চরিত্রগুলি শূরত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর পেছনের ধ্যানধারণা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের মর্মকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। তাই এই কাব্য কবি যেমন একা রচনা করেননি, তেমনি সমাজমানসও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্যই বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যখানি এত সমাদৃত।

6.7 সারাংশ

অষ্টাদশ পর্বে রচিত সংস্কৃত মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এক বিস্তৃত যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শ, বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হবার পরই মহাভারতের অনুবাদের প্রতি

বাঙালি কবিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তবে প্রথমদিকে ভক্তিরসপ্রিয় বাঙালির কাছে মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ কাহিনী তেমন সমাদর পায়নি। এছাড়া মহাভারতে রামায়ণের মতো গল্পরস তেমন নেই। ন্যায়, নীতি, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম ইত্যাদি নানা তত্ত্ব ও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভাগবতধর্ম প্রচারের ফলশ্রুতিতে মহাভারত রামায়ণ কাহিনীর মত সরল নয়—জটিল হয়ে উঠেছে। তবু মুসলমান শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর হাতে মহাভারতের অনুবাদ-ধারার সৃষ্টি। এই ধারার সঙ্গে পরবর্তী কালের কবি বাংলা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের নামই বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। "বাঙালি চরিত্রের ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং ভক্তিরসের অনাবিল প্রবাহ কাশীরামের মহাভারতখানিকে হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় করিয়াছে।"

সমালোচকের বক্তব্যটি যথার্থ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাশীরামের সহজ কবিত্ব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই কাশীরাম তার কাব্য রচনা করেন। প্রবাদ আছে—আদি, সভা, বন আর বিরাট—এই চারটি পর্ব রচনার পরই কাশীরাম দাস দেহত্যাগ করেন। পরবর্তী পর্বগুলি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস সমাপ্ত করেন। সঠিক বিচারে বলা যায়, বাঙালি জীবনের ঐতিহ্যকে কাশীরাম দাস যথার্থভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কবি ব্যাসদেবকে হুবহু অনুকরণ করেননি। পর্বগুলির নামকরণের ব্যাপারে অদল-বদল ঘটিয়েছেন। সংস্কৃত মূল মহাভারতের অনুশাসনপর্ব ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব কাশীরামের গ্রন্থে নেই। বীর ও হাস্যরসের মিশ্রণে কাব্যখানি সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কাশীদাসী মহাভারত সত্যই 'অমৃত সমান'। আজও বাঙালি সেই অমৃতপানে তৃপ্ত।

6.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 5টি উত্তর থেকে বেছে টিক (✓) চিহ্ন দিন। উত্তর শেষে এককের সমাপ্তিতে দেওয়া 73 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়' গ্রন্থ রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—

1. হুসেন শাহ
2. পরাগল খাঁ
3. ছুঁটি খাঁ
4. রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ
5. রাজা শশাঙ্ক

(খ) সংস্কৃত মূল মহাভারত গ্রন্থের পর্ব সংখ্যা—

1. বারো
2. দশ
3. আঠারো
4. চৌদ্দ
5. কুড়ি

(গ) মহাভারতের জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন—

1. সঞ্জয়
2. শ্রীকর নন্দী
3. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
4. কাশীরাম দাস
5. অনিরুদ্ধ

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) মহাভারতের অনুবাদ————প্রভাবের পূর্বেই আরম্ভ হয়।

(খ) মহাভারতের অনুবাদকেরা অনেকেই ————আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

(গ) মহাভারত————রসপ্রধান কাব্য।

(ঘ) শ্রীকর নন্দী————অবলম্বনে মহাভারতের অনুবাদ করেন।

(ঙ) কবীন্দ্র পরমেশ্বরের গ্রন্থের নাম————।

(চ) কাশীরাম দাস———— জেলার ———— পরগনার ———— গ্রামের লোক ছিলেন।

6.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ঃ ভাগবত

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ-ধারা বাঙালি জীবনে যে প্লাবন এনেছিল, সে তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ ধারাটি অনেকাংশেই ম্লান। ভাগবতের অনুবাদকর্মের প্রথম পর্যায়টি বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেও, চৈতন্য প্রভাবে পরবর্তী যুগের অনুবাদে নূতন নূতন্ কাহিনীর সংযোজন অনুবাদের ধারা ক্ষুণ্ণ হয়ে কাব্যটি 'কাহিনীকাব্য'ধর্মী হয়ে ওঠে।

রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের কাহিনী বাংলাদেশে অতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ—রামায়ণ-মহাভারতের সর্বজনীন আবেদন—ভাগবতের সেটি ছিল না। ভাগবতে নীরস যুদ্ধ-ঘটনার বাড়াবাড়ি। তাছাড়া চৈতন্য ভক্তদের কাছে ভাগবতধর্ম অনুসরণযোগ্য না হওয়ায়—ভাগবতের অনুবাদধারা মরুপথে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভাগবতের অনুবাদকর্মের শ্রেষ্ঠ রূপকার—মালাধর বসু। তাঁর জীবন পরিচিতি ও কাব্যধারার বিস্তৃত বিবরণ নীচে আপনারা পাবেন।

মালাধর বসু ঃ আদি কাব্যগুলির বাংলা কাব্যে অনুবাদের যে প্লাবন আসে সেই পথ ধরেই মালাধর বসুর আবির্ভাব। তাঁর অনূদিত গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জীবনকথা, যা ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত-এ সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন, তা 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী মালাধর বসু জনজীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কর্মের মূলগত উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন,

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালি রচিয়া।।

অথবা, "ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।"

লোকজীবনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে লোকবোধনের এই আকাঙ্ক্ষা কৃত্তিবাসের মত মালাধর বসুও স্পষ্ট ভাষায় যেমন ব্যক্ত করেছেন তেমনি প্রয়োগেও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই কাব্য অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলার লোকচেতনা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ভাবনার সঙ্গে সংযোগ সাধনের ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিল। এছাড়া বৃহত্তর ভারতের বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনার মূলেও এই অনুবাদগ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। এইজন্যই চৈতন্যদেব স্বয়ং মালাধর বসুর কাব্যখানিকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কবির ব্যক্তি পরিচিতি ঃ বর্ধমান জেলার বিখ্যাত কুলীন গ্রামের বসু পরিবারে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে (সম্ভবত ১৪২০-২৫ খ্রিঃ) কবি আবির্ভূত হন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবির পুত্র ও পৌত্র নবদ্বীপ লীলার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে রচনার কালজ্ঞাপক একটি পয়ার পাওয়া যায়,

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরাম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

—এই পয়ারটি প্রমাণ হলে এই গ্রন্থকেই বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করা যায়। ড. সুকুমার সেন গ্রন্থ রচনার কালকে প্রামাণিক বলে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে এই বর্ষীয়ান কবি অনুবাদ-কর্মটি সমাপ্ত করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হতে তখনও ছয় বছর বাকি। এই গ্রন্থ আরম্ভের সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন রুক্‌নুদ্দিন বারবক্ শাহ। গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয় তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহের সময়। বিদ্যোৎসাহী রুক্‌নুদ্দিনই মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। বেশ বিনয়ের সঙ্গে সেকথা কবি কাব্যে উল্লেখ করেছেন,

"গুণ নাহি অধম মুঞিঁ নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।"

কাব্যের নামকরণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিজয়' শব্দটির দুটি আভিধানিক অর্থ আছে। (1) জয়লাভ, (2) মহাপ্রয়ান। সমগ্র কাব্য জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক লীলাকথা এবং কাব্যশেষে তাঁর মানবলীলা সংবরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের শীর্ষনামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর গভীর সাদৃশ্য থাকায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামটি সুসংগত হয়েছে।

ব্যাসদেব ১২টি স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছিলেন, নানা তত্ত্বকে জুড়ে দিয়ে। কিন্তু মালাধর বসু সমগ্র সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ না করে দশম ও একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ সংক্ষেপে সরল ভাষায় অনুবাদ করেন। আদ্য, মধ্য, অন্ত—এই তিনটি খণ্ডে যথাক্রমে বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালির ঢঙে লিখিত এই কাব্যগ্রন্থ, তাই গ্রন্থখানিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, আদিকবি ব্যাসদেবের মত কোনও তত্ত্বকথার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। আবার দানলীলা, নৌকাবিলাস, রাসরঙ্গ প্রভৃতি ভাগবত বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি কাব্যখানিকে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছেন। তাই সামগ্রিক বিচারে আমরা কাব্যখানিকে শ্রীমদ্‌ভাগবত-এর আক্ষরিক অনুবাদ বলতে পারি না, বরং বলতে পারি ভাবানুবাদের পথ ধরে কবি যেন এক নবসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবি এই অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ভাগবত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন মাত্র। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই প্রাধান্য পেয়েছে। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবন হয়েছিল পলায়নমুখী। সেই হতোদ্যম জাতীয় জীবনকে সংগ্রামী আলোয় আলোকিত করতেই, মরা গাঙে জোয়ার আনতেই, কবির এই প্রচেষ্টা। আগাগোড়া গ্রন্থের গল্পাংশ ও উপস্থাপনা লক্ষ্য করে মনে হয়—ভয়ার্ত মুমূর্ষু জাতির সব জড়তা লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় শক্তিকে তুলে ধরে কবি জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছেন। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। প্রয়োজনবোধে তিনি 'উপমা', 'উৎপ্রেক্ষা', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

"রঙ্গন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন"।

রুক্মিণীর রূপ বর্ণনায় এই ব্যতিরেক অলঙ্কারটি নিঃসন্দেহে যথার্থ সমাজ পরিবেশ থেকে কবি সংগ্রহ করতে কার্পণ্য করেননি।

"কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝড়ে।"

কিংবা, "লাঙ্গলের ইস যেন দন্ত সারি সারি।"

—শেষের উপমাটিতে পুতনা রাক্ষসীর দন্ত পঙ্ক্তির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে কৃষিপ্রধান দেশের অতি পরিচিত লাঙলের তীক্ষ্ণ ফলার তুলনা করেছেন। বাৎসল্য রসের প্রকাশে কবি সিদ্ধহস্ত।

"তবে আমি যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শুনহ শ্রীহরি।।"

—এখানে স্নেহার্তিমাখা মাতৃমূর্তিটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। এর পাশাপাশি মাতা-পুত্রের স্নেহ-ভালবাসার অতলান্ত রূপটিও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাষায় কবি তুলে ধরেছেন। করুণরসের সৃষ্টিতেও কবির মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"আর না যাইব সখি কল্পতরুমূলে।
আর কানু সঙ্গে সখি না গাঁথিব ফুলে।।"
কৃষ্ণ ফেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।।

অথবা, কানু হেন ধন সখী ছেড়ে দিব কারে।। —প্রভৃতি পঙ্ক্তি

—প্রত্যাসন্ন কৃষ্ণবিরহের ব্যথায় শ্রীরাধিকা ও সখীদের মর্মভেদী বেদনার এ যেন সার্থক বাণীচিত্র। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত এ কাব্যেও বাঙালি পরিবেশ ও পটভূমিকা রয়েছে। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। এই কাব্যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে মনের আনন্দে ভাতই খেয়েছে। মা গোপালকে ডেকে বলেন,

"ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাস্থল আসিও।"

—চিত্রটি বাংলার মাতা-পুত্রের সজীব সম্পর্কযুক্ত। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি পরিবেশ আম-কাঁঠাল, সুপারির ছায়ায় স্নিগ্ধ। এই কাব্যে "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—এই বাক্যটি আছে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলে সম্বোধন মালাধার বসুই প্রথম করেছেন। এর মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেব আপন অন্তরের বাণীকে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির বীজ যেন এই গ্রন্থেই লুকিয়ে ছিল। তাই তিনি এই কাব্যকে প্রিয়জ্ঞান করেছেন এবং কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলেছেন,

"তোমার কা কথা-তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদুর।।"

স্বয়ং মহাপ্রভুর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মালাধর বসুকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করে রাখবে। মালাধরের কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যযুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মালাধর বসু যুগস্রষ্টা না হলেও যুগসন্ধির সংযোগকারী মহাকবি।

চৈতন্য পরবর্তী ভাগবতের অনুবাদকদের জন্য রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস আধা-পরিচিত। এই পর্বে ভাগবতের অনুবাদের চেয়ে কৃষ্ণ প্রণয়লীলাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু আলোচ্য কবিদ্বয় ভাগবতের যে অনুবাদ করেছেন,

সেখানে, লৌকিক প্রণয়লীলাগুলিকে বর্জন করেই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এজন্য ভাগবতের অনুবাদক হিসাবে রঘুনাথ ও কৃষ্ণদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হ'লো।

1. রঘুনাথ ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথ তাঁর ভাগবত অনুবাদ সমাপ্ত করেন। লেখকের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'। তিনি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কবিকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেন। মূল ভাগবতের সব স্কন্ধই রঘুনাথ অনুবাদ করেন। তবে দশম-একাদশ স্কন্ধে কবি মূলকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। ভাগবতের অনুবাদধারার মূল স্থাপয়িতা মালাধর বসুকে রঘুনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গোপলীলা অংশগুলি পল্লবিত নয়—অনেকটা সংযত, সংহত।

রঘুনাথের সংস্কৃতে অগাধ জ্ঞান ছিল। তথ্যনিষ্ঠা ও ভাবসংযমের জন্য তাঁর সৃষ্টি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। ভাগবতের জটিল তত্ত্বকে কবি কাহিনীর পাশাপাশি সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো স্থানে তাঁর রচনায় বৈষ্ণব পদাবলির লালিত্য ও মাধুর্যও প্রকাশ পেয়েছে। রঘুনাথের লেখায় ভাগবতের পৌরাণিক ঐতিহ্যটি বিশুদ্ধ অনুবাদ-পর্বের পরিচয় বহন করে। চৈতন্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও অনুবাদে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তিবাদের প্রভাব পড়েনি।

2. কৃষ্ণদাস ঃ কবি কৃষ্ণদাস ছিলেন মহাভারতের অগ্রণী অনুবাদক কাশীদাসের বড় ভাই। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। গবেষকদের মতে গ্রন্থখানি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। এই অনুবাদ গ্রন্থে দানলীলা, নৌকালীলা বাদ পড়েছে। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ভাগবতের বাইরের নানা প্রসঙ্গ কৃষ্ণদাসের অনুবাদ গ্রন্থে স্থান পেলেও ভাগবতের অনুবাদধারায় কৃষ্ণদাসের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

3. বলরামদাস ঃ বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' অনেকাংশেই মূলানুযায়ী হয়েছে। তবে তাঁর লেখায় ভাগবতের সঙ্গে 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র কিছুটা অনুসরণ ঘটেছে। এ ছাড়া নন্দরাম ঘোষ, লক্ষ্মীনাথ, ভক্তরাম দাসও খণ্ড খণ্ড পালা রচনা করেছেন। ভাগবত আশ্রয়ী এই লেখাগুলি 'ব্রজলীলা কাহিনী'র পথ ধরেই লিখিত।

6.10 সারাংশ

রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ-ধারার পাশাপাশি ভাগবতের অনুবাদকর্মও প্রাক্‌চৈতন্যযুগেই শুরু হয়। এই ধারার শ্রেষ্ঠ লেখক মালাধর বসু। তাঁর কাব্যের প্রচার দেশব্যাপী থাকলেও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের মতো ছিল না। ভাগবত পুরাণ-তত্ত্ব এক প্রচারধর্মী সাহিত্য হবার জন্য রামায়ণ-মহাভারতের শিল্প-সৌন্দর্য এখানে তেমন ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ ছিল সার্বজনীন। কিন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরযুক্তির তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্য ভাগবত ছিল মূলত: বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। গার্হস্থ্য জীবনের ছোঁয়ায় এবং বিচিত্র জীবনলীলার ছন্দে রামায়ণ মহাভারত স্নাত, অন্যদিকে ভাগবতে দেখা যায় যুদ্ধের ঘনঘটা।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯৫ শক থেকে ১৪০২ শকের মধ্যে। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুক্‌নুদ্দিন বারবক শাহ। কবির বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদক্রমের জোয়ারের ফলেই কবির মনে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি তাঁর

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ। পুরাণ-বর্ণিত হিন্দুধর্মের আদর্শ জনসাধারণের হৃদয়দ্বারে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গ্রন্থখানি রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করেই তিনি কাব্যখানি লেখেন। ভাগবতের দুটি অংশ বেছে নিয়ে অনুবাদ করলেও এর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীর্তি-কাহিনী কবি শিল্পসম্মতভাবে অঙ্কন করেছেন। মূলের প্রতি নিষ্ঠা রেখেও বাঙালির নিজস্ব মানসিকতা তিনি বিসর্জন দেননি। সার্থক অনুবাদের আদর্শ মালাধর বসুর লেখায় দেখা যায়। তাঁর অনুবাদকর্মে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা যেমন আছে, তেমনি রচনানৈপুণ্যও তুলনাহীন।

চৈতন্যোত্তর যুগে রঘুনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী' রচনা করেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত কবি সংক্ষেপে অনুবাদকর্মটি করলেও মুল কাব্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশই বাদ দেননি। তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও ভাষা সংযমে তাঁর রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে লিরিক মূর্ছনা ভিন্ন স্বাদ এনেছে। শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ অবতারের আভাসও এ কাব্যে দেখা যায়।

এ যুগের অপর অনুবাদক—কৃষ্ণদাস, অমর মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস-এর অগ্রজ। তাঁর গ্রন্থে ভাগবতের বাইরের নানা প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য তিনজন অনুবাদক ছাড়া ভাগবতকে আশ্রয় করে বলরাম দাস, নন্দরাম ঘোষ, লক্ষ্মীনাথ, ভক্তরাম দাসও খণ্ড-খণ্ড পালা রচনা করেছেন।

6.11 অনুশীলনী 3

1. নিম্নলিখিত রচয়িতাদের গ্রন্থগুলির নাম কিছু ঠিক এবং কিছু ভুল দেওয়া আছে। কোন্‌টি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান। এর পর 73 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'।	☐	☐
(খ) কৃষ্ণদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'।	☐	☐
(গ) রঘুনাথ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবতরঙ্গিণী'।	☐	☐

2. নিচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।
   (ক) মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ___________।
   (খ) মালাধর বসুর কাব্য রচনাকাল __________।
   (গ) মালাধর বসু ভাগবতের _________ও _________স্কন্ধ সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন।
   (ঘ) ভাগবতের প্রকৃত অনুসরণে অনুবাদকর্মে ভাঁটা পড়েছে ______ পর্ব থেকে।
   (ঙ) রঘুনাথের গ্রন্থের নাম ________।

6.12 উত্তর সংকেত

5.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক।
2. (ক) (II), (খ) (I), (গ) (II)।
3. (ক) পাঁচালীর, (খ) প্রেম করুণাঘন, (গ) স্ত্রৈণ, (ঘ) বনমালী ও মালিনী, (ঙ) রুকনুদ্দিন বারবক শাহের।

5.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) পরাগলি খাঁ, (খ) আঠারো, (গ) কাশীরাম দাস।
2. (ক) চৈতন্য, (খ) শাসকদের, (গ) বীর, (ঘ) জৈমিনি মহাভারত, (ঙ) পাণ্ডব বিজয়, (চ) বর্ধমান, ইন্দ্রাণী, সিঙ্গি বা সিদ্ধি।

5.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল।
2. (ক) রুক্‌নুদ্দিন বারবক শাহ, (খ) ১৩৯৫ শকাব্দ—১৪০২ শকাব্দের মধ্যবর্তীকাল, (গ) দশম, একাদশ, (ঘ) চৈতন্য, (ঙ) শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী।

6.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : ড. ভূদেব চৌধুরী।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 7 ❑ মঙ্গলকাব্যধারা

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য
7.2 প্রস্তাবনা
7.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ মনসামঙ্গল
7.4 সারাংশ
7.5 অনুশীলনী 1
7.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ চণ্ডীমঙ্গল
7.7 সারাংশ
7.8 অনুশীলনী 2
7.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ ধর্মমঙ্গল
7.10 সারাংশ
7.11 অনুশীলনী 3
7.12 উত্তর সংকেত
7.13 গ্রন্থপঞ্জি

7.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার নানা ব্যাখ্যা জানতে পারবেন—সেই সঙ্গে এই কাব্যসমূহ রচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।
- তিনটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সংক্ষিপ্ত সূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কাহিনীগুলি আপনারা পাঠ করেছেন, তাই বিস্তৃতভাবে কাহিনীর বিবরণ তুলে না ধরে আপনাদের স্মৃতিকে জাগ্রত করার মতো সংক্ষিপ্ত উপাদানগুলি দেওয়া হলো।
- বিভিন্ন কালের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের কবি-পরিচিতি ও তাঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—যা পাঠ করে আপনারা প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তিনটি মঙ্গলকাব্যের সমাজচিত্র সম্পর্কে আপনাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।
- মঙ্গলকাব্য রচনার পেছনে যে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণ প্রত্যক্ষরূপে এবং রাজনৈতিক পটভূমি পরোক্ষরূপে ছিল—তারও ইঙ্গিত পাবেন।
- পুরাণজাতীয় সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যে মেলবন্ধন মঙ্গলকাব্যে ঘটেছিল—তারও নানা তথ্য আপনারা পাবেন।

7.2 প্রস্তাবনা

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই দীর্ঘ 400 শত বছর ধরে বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যধারায় স্নাত। মূলত চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল—এই তিনটি ধারায় মঙ্গলকাব্যের জগৎ সমৃদ্ধ। চৈতন্যপূর্ব যুগে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি। মনসামঙ্গল রচয়িতার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই তিন মঙ্গলকাব্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল থাকলেও এই এককে এই সব মঙ্গলকাব্যের অলোচনা করা হয়নি। মূলত আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ তুর্কী আক্রমণের পূর্বে শুরু হলেও তুর্কী বিজয়ের পর—বিদেশী শক্তির অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যালীলা ইত্যাদির ফলে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয়—তা থেকে মুক্তি পেতে এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মিলনের জন্য হাত বাড়ায় লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে। ধীরে ধীরে অনার্য দেব-দেবী, গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবীও সমাজের উন্নত পর্যায়ে সমাদরে গৃহীত হয়। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর এভাবেই বাংলা সাহিত্যের বুকে স্থায়ী আসন লাভ করে। মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের আদর্শে রচিত। ঐতিহাসিক নানা বিষয়ের সঙ্গে লৌকিক ব্রতকথাও মঙ্গলকাব্যের উৎসভূমিতে রয়েছে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন বাঙালির বহির্বাণিজ্যের ও নৌ-বিদ্যার ইতিহাস এবং ধর্মমঙ্গলে নানা যুদ্ধাদির মধ্যে পাল রাজাদের শৌর্য-বীর্য, বাঙালি-ডোম সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। মনসামঙ্গলের দ্বিজবংশীদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য, মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যের রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মঙ্গল দেব-দেবীর মধ্যে চণ্ডী ও পার্বতীর মিলন ঘটেছে। তবে অনার্য চণ্ডী ব্যাধজীবনের সঙ্গে যুক্ত বনদেবীরূপে চিহ্নিত। মনসাদেবীর উৎসে রয়েছে সর্পপূজা, সিজগাছ পূজা—সন্তান, উৎপাদন-শক্তির উপাসনা। ধর্মঠাকুরের ভিত্তিমূলে আছে আদিম প্রস্তর উপাসনা এবং সূর্যপূজা। পৌরাণিক তান্ত্রিক দেব-দেবী পরিকল্পনা অনার্য বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানারূপে ও নামে মঙ্গলকাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি কাব্যে উচ্চমার্গীয় দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা নেই—আছে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আশা-নিরাশার ছন্দ ও ভয়-ভীতি নিবারণের দিক।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা কল্পলোকের নয়—একান্ত মানবিকরূপেই চিহ্নিত। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও লৌকিক হিংসা-দ্বেষ-লোভ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহযাত্রী। দেবত্বের আবরণে রক্ত-মাংসে গড়া মানবিক রূপটিই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের বাস্তব ও জীবনচিত্রে মঙ্গলকাব্য সমৃদ্ধ। এই কাব্যধারায় দেবতা উপলক্ষমাত্র, মানুষই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এজন্যই চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, ধর্মমঙ্গলের লাউসেন এতো জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

'মঙ্গল' নামটি কাব্যের সঙ্গে যুক্ত হলো কেন? এ নিয়ে নানা মত দেখা যায়। তবে নিম্নলিখিত মতগুলি গ্রহণযোগ্য :

(ক) মঙ্গলকাব্যগুলি 'মঙ্গল রাগে' গীত হতো।

(খ) এই কাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবারে শুরু হতো এবং পরের মঙ্গলবারে শেষ হতো।

(গ) 'মঙ্গল' শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ। এর অর্থ হলো 'গমন' বা 'যাওয়া' (To move or to go) অর্থাৎ কোনো স্থায়ী মঞ্চে মঙ্গলকাব্য গীত হতো না। এ পাড়া ও পাড়া, এ গ্রাম-সে গ্রাম ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো।

(ঘ) সাধারণ অর্থে যে গ্রন্থ ঘরে রাখলে, পাঠ করলে কিংবা পূজা করলে মঙ্গল হয়— সেই কাব্যও 'মঙ্গল' নামে চিহ্নিত হয়েছে। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবনের এই ধারণা অমূলক নয়।

মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি প্রয়োগের যে একাধিক মতামত পাওয়া যায় তার কোনোটিকেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য ঃ মঙ্গলকাব্যের রচনারীতি গতানুগতিক। প্রায় সব কবিই স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে কাব্য লিখেছেন। কাব্যের শুরুতে গণেশ-বন্দনা দেখা যায়। কাব্যের নায়ক-নায়িকারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। পৃথিবীতে এসে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে দেবতার অনুগ্রহে আবার তাঁরা স্বর্গে ফিরে যান। মর্ত্যে পূজা প্রচারের কাঙ্গালপনার দেবতাদের আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মতো দেখা যায়। 'বারমাস্যা' ও 'চৌতিশা' প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আছে। মঙ্গলকাব্যের নানা দিক আলোচনার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবির কবিবৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত কাহিনীসহ এই এককে আলোচনা আছে। এ সব পাঠ করে মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তরও আপনারা দিতে পারবেন।

7.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ মনসামঙ্গল

সর্পদেবী হচ্ছেন 'মনসা'। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সাপের উপদ্রব ভয়ংকর। সর্প দংশনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই লোকায়ত সাংস্কৃতিক জীবনে মনসাদেবীর পূজার প্রচলন। এই মনসা পূজার সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই 'মনসামঙ্গল' রচিত। মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ বাংলায় 'মনসামঙ্গল', 'ভাসান' বা 'রয়ানি' হিসাবে গীত হ'তো। এই দেবীর উৎস এবং রূপের বিবর্তন নিয়ে মতভেদ থাকলেও মনসা যে অনার্য দেবী এ-কথা সকলেই স্বীকার করেছেন।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর 'মনচা আম্মা' বা 'মনে মাঞ্চি' থেকেই মনসা শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে "আদি দেব নিরঞ্জনের কামবাসনোদ্ভুতা সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যার ও সিজবৃক্ষ পূজার সংযোগের ফলে পাঁচালী কাব্যের মনসা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁর মতে মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ দেবী—জাঙ্গুলী-তারা মনসাদেবীর মূল।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক-গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বৌদ্ধ সর্পদেবী মনসার ভিত্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে এর সঙ্গে বাংলাদেশ ও তার গা-ঘেঁষা অঞ্চলগুলির নানা অনার্য কৌমের মধ্যে সর্প এবং সর্পদেবীর পূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার প্রভাবের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। মনসাদেবীর পৌরাণিক মর্যাদার অন্তরালেও ছিল মুখ্যত লোককল্পনা।

পালযুগেই মনসা সমাজের উচ্চশ্রেণীতে স্থান করে নিয়েছেন। সেন আমলে সমাজের সর্বস্তরে এঁর প্রসার দেখা যায়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় পূর্বোক্ত তিন বিশেষজ্ঞের মত মেনে নিয়েছেন। তিনি মঞ্চাম্মা সম্পর্কিত মত ও জাঙ্গুলীদেবীর প্রভাব মেনে নিয়েও নতুন একটি অভিমত যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে "সাপ প্রজনন-শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন-শক্তির পূজা" থেকেই 'মনসা পূজা'র উদ্ভব। বাংলাদেশে পাওয়া মনসা মূর্তির সঙ্গে ক্রোড়াসীন একটি ফল বা পূর্ণ সর্পের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। এঁদের প্রত্যেকটি প্রজনন-শক্তির প্রতীক।

আলোচ্য মতবাদগুলিকে ভিত্তি করে কালক্রমে মনসাদেবীর ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে মনে করা যায়। পাল আমলে এই কল্পনা ক্রমশ উচ্চকোটিতে স্বীকৃত হচ্ছেন দেখা গেছে। সেন আমলে এদের মিলন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে থাকবে।

কাহিনী ঃ আখ্যানধর্মী মনসামঙ্গলের মূল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন শিবভক্ত পৌরুষ চেতনায় দৃপ্ত চাঁদ সদাগর। সমগ্র দেশে মনসাদেবী নিজের পূজা প্রচারের জন্য বেছে নেন চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা মনসার ভক্ত। কিন্তু স্বামীকে সে এ-পথে আনতে পারেনি। ক্রুদ্ধ মনসা চাঁদের বাগান ধ্বংস করেন, সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেন, ছয় পুত্রকে হত্যা করেন, নটীবেশে মহাজ্ঞান হরণ করেন—তবু চাঁদ নতিস্বীকার করেননি। শেষ সন্তান লক্ষীন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ে দিয়ে মনসার হাত থেকে পুত্রকে বাঁচানোর জন্য লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। সর্পঘাতে মৃত স্বামীকে কলার ভেলায় ভাসিয়ে, পথের নানা বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে বেহুলা স্বর্গে পৌঁছায়। নাচে-গানে দেবতাগণকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়। দেশে ফিরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দৃঢ় চাঁদ সদাগরের হৃদয় জয় করে মনসার পূজার ব্যবস্থা করে। চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা করে বেহুলার চোখের জলের কাছে হার মানেন। চাঁদ তার সব হারানো ধন-জন ফিরে পান। চাঁদের মনসার পূজার মধ্য দিয়েই কাব্যের সমাপ্তি।

মনসামঙ্গলের কাহিনী সুবিন্যস্ত ও নিবিড় ঐক্যবিধৃত। চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বে কাহিনী নাটকীয় ও গতিময় হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে নেতা ধোপানীর শিষ্য শঙ্কর গারুড়ির ও হাসান-হোসেনের কথাও আছে। তবে মূল আকর্ষণ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর মধ্যে। চরিত্র চিত্রণের দিক থেকেও বহু কবি চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠ রূপ, সনকার বাৎসল্যরস, স্নিগ্ধতা ও বেহুলার সংগ্রামী প্রেমজীবন, কামনার তীব্রতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্য দুটি পর্যায়ে লিখিত : (1) প্রাক্-চৈতন্য যুগে, (2) চৈতন্যোত্তর যুগে। দুই যুগের কাব্যরস ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পর্যায়ের কাব্যে দেবচরিত্রে যে অমার্জিত নিষ্ঠুরতা, শক্তির রূঢ়তা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে তা দেখা যায় না।

মনসামঙ্গলের স্রষ্টাগণ ঃ মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবিরূপে হরি দত্ত চিহ্নিত। অপরাপর কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজবংশী দাস প্রমুখ স্মরণীয়। মনসা-মঙ্গল বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তেই রচিত হয়েছিল। তার ফলে উত্তরবঙ্গে জীবন মৈত্র, জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতি কাব্য রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস। আসাম-বাংলা জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন নারায়ণ দেব। নীচে প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এ থেকে আপনারা কোন্ কবি কাহিনী, চরিত্র, রস পরিবেশন, বাস্তবতাবোধ ইত্যাদি সাহিত্য বিচারের নানা দিক সার্থকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন—তা জানতে পারবেন এবং প্রত্যেক কবি সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে তাঁদের সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন :

কানাহরি দত্ত ঃ মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি বিজয় গুপ্ত "প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত" লেখার পরই আদি কবিরূপে কানাহরি দত্ত আলোচনার বিষয় হন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'কালিকা পুরাণে'র লেখক হরি দত্ত এবং আদি মনসামঙ্গলকার হরি দত্তকে একই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। হরি দত্তের কালনির্ণয়ক

কোনো তথ্যাদি না পাওয়া গেলেও তিনি যে বিজয় গুপ্তের পূর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি—এ তথ্য মেনে নিতে হয়।

নারায়ণ দেব ঃ মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। তাঁর কাব্যে কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে হরি দত্তের পরই নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কাব্যের ব্যাপকতম প্রচার এর অন্যতম কারণ। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদগল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।।
পিতামহ উদ্ধব, নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর, রুক্মিণী মোর মাতা।।"

আসাম অঞ্চলে নারায়ণ দেবের কাব্যের বহুল প্রচারের জন্য আসামবাসীরা কবিকে আসামের বলে দাবী করে। কিন্তু তথ্যাদি যা পাওয়া যায়—তাতে দেখা যায় নারায়ণ দেবের জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে। তবে অনেকে শ্রীহট্ট জেলায় কবির জন্মস্থান বলে দাবি করেন। কবির উপাধি ছিল—'সুকবি বল্লভ'।

কাব্যকৃতি ঃ মঙ্গলকাব্য রচনার মূলনীতির পথ ধরে নারায়ণ দেব কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্য 'পদ্মাপুরাণ', তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে কবির আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানসমূহ, আর তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী আছে। অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। কবির কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছে দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক কাহিনীগুলি।

উৎস ঃ মহাভারতের 'আস্তিক পর্ব', বিবিধ 'শৈবপুরাণ', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-কাব্য প্রভৃতি রচনাকে নারায়ণ দেব দ্বিতীয় খণ্ডটির ভিত্তি রচনা করেছেন। নারায়ণ দেবের কাব্যকে আমরা বাংলা ভাষার পৌরাণিক কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার বলতে পারি।

নারায়ণ দেবের রচনায় স্বভাবস্ফূর্ত সরস কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নয়। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে কবির বেশ দখল ছিল। শিবের কটূক্তি শুনে উমাকে যে কথা বলেছেন তার মধ্যে 'কুমারসম্ভবে'র ছায়া সম্পাত ঘটেছে। করুণরস সৃষ্টিতে নারায়ণ দেব বিজয় গুপ্তকেও হার মানিয়েছেন। এই করুণ রসের ধারায় বেহুলা ও সনকা চরিত্র বিশিষ্টতা লাভ করেছে। স্বামীর মৃত্যুতে বঞ্চিত যৌবন যন্ত্রণায় কাতর বেহুলার কণ্ঠে বেদন-অর্তি—

"হাসি হাসি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন।
তবে সে যুড়াএ প্রভু অভাগীর প্রাণ।।
বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ।
অকালেতে রাড়ী হৈলাম শুন প্রাণ পতি।।

[রাড়ী = বিধবা]

চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ রূপটি কবি সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। বাম হাতে মনসার পুজার প্রাক্ মুহূর্তে চাঁদ সদাগরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে।।"

কবির হাতে চাঁদ সদাগরের চরিত্রটি বলিষ্ঠ, দৃপ্ত এবং আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যমণ্ডিত। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কাব্যকে অশ্লীল বলে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কারণ, নারায়ণ দেব তাঁর কাহিনী চয়নে মূলত সংস্কৃত পুরাণকেই আশ্রয় করেছেন। সুতরাং যদি দায়ী করতে হয়—কবিকে নয়—প্রাক্ চৈতন্যযুগের পরিমণ্ডলকে দোষী করতে হয়। কাহিনী গঠনে বৈচিত্র্য ও বিস্তার না থাকলেও চরিত্র চিত্রণে ও করুণরস সৃষ্টিতে কবি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বিজয় গুপ্ত ঃ আদি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিজয় গুপ্ত চিহ্নিত। বিজয় গুপ্তের কাব্য খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ জনপ্রিয়তার জন্যই তাঁর কাব্যে অনেক পক্ষেপণ ঘটেছে। মনসাভক্ত সাধক কবিরূপে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর কাব্যে কবি উল্লেখ করেছেন যে, কাব্যখানি হুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছে। গবেষকদের মতে কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৯৪ সাল, তবে এই কালনির্ণয় নিয়ে সংশয় আছে।

কবি-পরিচিতি ঃ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী দেবী। কবি উল্লিখিত 'ফুল্লশ্রী' গ্রাম বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুসারে 'গৈলা-ফুল্লশ্রী' গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত মনসাদেবীর মূর্তি বিদ্যমান।

আদি কবি কানাহরি দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, আলঙ্কারিক চমৎকৃতির সাহায্যে কবি তাঁর কাব্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ ইত্যাদি দেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিজয় গুপ্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। গভীর ভাবানুভূতির চেয়ে কবি পাণ্ডিত্যের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। বিজয় গুপ্তের লেখায় মিলনমুখী প্রাণসংহতির চিত্র ফুটে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণে কবি সার্থক। তাঁর হাতে চাঁদ সদাগর পৌরুষদৃপ্ত, মনসা চরিত্রটি কৌতুকরসে ভরা, শিব চরিত্রে ব্যভিচারী গ্রাম্য চরিত্রের ছোঁয়া আছে। বিজয় গুপ্তের হাতে শিব হয়েছে শিথিল চরিত্র, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গৃহস্থ।

কবির কৌতুক দৃষ্টি প্রশংসার দাবি রাখে। দক্ষিণ পাটনে চাঁদের বাণিজ্যাদি নিয়ে, পান, নারকেল ও চটের থানকে নিয়ে কবি যে দৃশ্য রচনা করেছেন তাতে উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ চাঁদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে রাজবেশ ছেড়ে রাজা তখনি চট নিয়ে যা করেছিলেন তা তুলে ধরা হলো :

"একখানা কাছিয়া পিন্ধে আরখানা মাথায় বান্ধে
আরখান দিল সর্ব গায়।"

করুণরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত তুলনারহিত। লৌহবাসরে লখিন্দরের মৃত্যুর পর মাতা সনকার পুত্রহারা বেদনাদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়।।
দুই হস্তে ধরি রানী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রানী বদন কমলে।।"

ভাষা ও ছন্দে কবি সচেতন ছিলেন। একঘেয়ে পয়ার-লাচারির যুগে তিন ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। এর দৃষ্টান্ত—

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।"

শব্দ চয়নে ও উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি সংস্কৃত রীতিকে পুরোপুরি মেনে নেননি। দেশজ শব্দের যথার্থ প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। মানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি বিজয় গুপ্তের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবির হাতে দেবতা উপলক্ষ্য—মানুষই চরম লক্ষ্য। সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতে পারি, বিজয় গুপ্তের কাব্যে পদ্মপুরাণাদি নানা গ্রন্থের প্রভাব, বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য থাকলেও তাঁর সহানুভূতি ও দরদী মনের ভালবাসার স্পর্শে সেই সব পুরাণ কাহিনী সম্পূর্ণ পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে নবরূপে রূপায়িত হয়েছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গলের কবি হলেন বিপ্রদাস পিপিলাই। তাঁর কাব্যে অখণ্ডিত ও অচ্ছিন্ন রূপটি আমরা পাই। সম্পূর্ণ কাহিনী এই কাব্যেই পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেনের মতে কাব্যখানি ১৪৯৫-৯৬ সালে রচিত। তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কবির প্রাচীনতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গণেশ, ধর্ম, নারায়ণ ইত্যাদি দেবতার বন্দনার পর সর্পালঙ্কারে সজ্জিত মনসার রাজবেশ ও সভার বর্ণনা দিয়ে কাব্য আরম্ভ—তবে মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীটি আরম্ভ হতে না হতেই খণ্ডিত। ড. সুকুমার সেনের মতে, “বিপ্রদাস ছাড়া সব কবিই—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে, বেহুলা, লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছেন।”

চরিত্র চিত্রণে ও আখ্যান রচনায় কবির নৈপুণ্য তেমন প্রকাশ না পেলেও নারী চরিত্রগুলি উজ্জ্বল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও লৌকিক ধর্মভাবনার সঙ্গে মনসা পূজার সম্পর্ক অনেকটা বিপ্রদাসের লেখায় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কবি বিপ্রদাস। তাঁর কাব্য তেমন জনপ্রিয় হয়নি, তবে তাঁর কাব্যে প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে, প্রক্ষেপণ সত্ত্বেও।

চৈতন্য পর্বে মনসামঙ্গলের ধারাটিতে গতিবেগ দেখা গেলেও প্রাক্-চৈতন্যযুগের নারায়ণ দেব-বিজয় গুপ্তের মতো সার্থক কবি পাওয়া যায় না। এই পর্বে মনসামঙ্গলে নূতন কতকগুলি দিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেগুলি হলো :

(ক) ভাষার সাবলীলতা ও অলঙ্করণমণ্ডল কলার গুরুত্ব।

(খ) চাঁদের পৌরুষদৃপ্ত রূপ চৈতন্যপ্রভাবে ভক্তিরসস্নাত কোমলমধুর হলো।

(গ) মনসার হিংস্ররূপে পেলবতা দেখা দিল।

(ঘ) কাহিনীবর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদিতেও ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি।

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবি তন্ত্রবিভূতি, ষষ্ঠীবর দত্ত, দ্বিজবংশী দাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবিদের পরিচিতি ও কাব্যকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

তন্ত্রবিভূতি ঃ মালদহ জেলার কবি তন্ত্রবিভূতির হাতে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারা কিছুটা স্বতন্ত্র পথ ধরে চলে। ড. আশুতোষ দাস কাব্যখানি আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থের দু-এক জায়গায় জগজ্জীবনের ভণিতা পাওয়া যায়। কবির প্রভাব জগজ্জীবন ও অন্যান্য কবিদের ওপর পড়েছিল। সহজ-সরল ভাষায় কাব্যখানি লিখিত। তাঁর লেখা সংযমশাসিত। তন্ত্রবিভূতির কাহিনীতে প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা যায়। কবির কাব্যে কোথাও কোথাও আদিরসের প্রাবল্য আছে। কাহিনীবর্ণনা ও রচনারীতিতে কবি অনেকটাই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গবেষকদের অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। কবির পিতার নাম রূপ, মাতা রেবতী। কাব্যখানির রচনাকাল সম্পর্কে পুঁথিতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লেখায় ক্ষেমানন্দের উল্লেখ থাকাতে ধরে নেওয়া যায় গ্রন্থখানি ক্ষেমানন্দের পর—অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। কাব্যখানি রীতি অনুসারে দেবখণ্ড ও বানিয়া খণ্ডে বিভক্ত। শেষের খণ্ডটিতে কবি তন্ত্রবিভূতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। কাব্যখানিতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব রয়েছে। বেহুলার কাহিনীতে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য আছে। আদিরসের বাড়াবাড়ি ও অলঙ্করণের প্রতি বেশি মাত্রার ঝোঁক যুগানুসারী ত্রুটিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারাম দাস, জীবন মৈত্র মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। বিষ্ণু পালের কাব্য মানিক দত্তের অনুসরণে লেখা। ধর্মমঙ্গলের প্রভাব 'সৃষ্টিতত্ত্বে' আছে। তবে সহজ-সরল গ্রাম্য ভাবব্যঞ্জনায় কাব্যখানি কিছুটা আস্বাদ্য হয়েছে।

শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবর। তিনটি খণ্ডে কাব্যটি বিন্যস্ত। কবির রচনায় অলঙ্কার সজ্জা গুরুত্ব পাওয়াতে অনেকে তাঁর ওপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। অন্যান্য কবিদের কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। তবে দ্বিজবংশী দাস ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল কাব্যজগতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছেন। নিম্নে এই দু'জন কবির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো :

দ্বিজবংশী দাস ঃ অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার জনপ্রিয় কবি হলেন দ্বিজবংশী দাস। তাঁর 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কবির পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদির জন্য সমালোচকগণ তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিয়েছেন।

দ্বিজবংশী দাসের গ্রন্থ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পায়। তবে কবির নামে পরবর্তিকালে বহু মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া গেলেও সবগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। আত্মপরিচয় অংশে তিনি নিজেকে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত দিয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। অধুনা বাংলাদেশে কবির বাস্তুভিটে এখনও আছে এবং সেখানে মনসাদেবীর পূজা-মন্দিরও আছে।

পঠন-পাঠন, ধ্যানে-জ্ঞানে কবি অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, দর্শন সম্পর্কে কবির গভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রিঃ থেকে ১৫৭৬ খ্রিঃ মধ্যে কাব্যখানি রচিত। বৃহৎ কাব্যটি দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে হর-পার্বতীর কাহিনী পুরাণ অনুসারেই লিখেছেন। কিন্তু শিবের মহিমা লিখতে গিয়ে তিনি পুরাণ ছেড়ে গ্রামীণ শিবকাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর হাতে শিব লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। 'মানবখণ্ডে' প্রচলিত মনসামঙ্গলের ধারা অনুসরণ করেই চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের প্রসঙ্গ সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণ জ্ঞানের আধিক্যে গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হ'লেও গতির দিক থেকে শ্লথ। তবে গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও কবি আপন বৈভবের দ্বারা বৈচিত্র্য আনতে পেরেছেন। মানবখণ্ডের চরিত্রগুলি তেমন সার্থক না হ'লেও দেবখণ্ডের মনসা, চণ্ডী ও মহাদেবের চরিত্র অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। গুরুগম্ভীর রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি রস-রসিকতা যেভাবে পরিবেশন করেছেন তাতে কাব্যখানিতে কিছুটা সরসতার প্লাবন বয়ে গেছে। কোথাও কোথাও আদিরসের বাড়াবাড়িও আছে। কবির সৃষ্টিতে তৎসম শব্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসে মুন্সীয়ানা আছে। শাক্তদেবীর বন্দনা গান লিখলেও কবি ছিলেন বৈষ্ণব। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবীয় ভাব-ভাবনার দ্বারা বংশী দাসের কবিমন অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল। তিনি অনেক বৈষ্ণব কবিতাও লিখেছেন। কবির ভক্তহৃদয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হরিহর মূর্তির বর্ণনায়

পাওয়া যায়—

"প্রণমহুঁ হরিহর অদ্‌ভুত কলেবর
শ্যামশ্বেত একই মূরতি
অভেদ ভাবিয়া লোকে দেখিছে অতি কৌতুকে
মরকতে রজতের জ্যোতি।"

কবির শব্দব্যবহারে দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় দ্বিজবংশী দাসের কাব্য ভক্তিরসপ্রধান।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যখানিই প্রথম 'মনসামঙ্গলে'র ছাপানো গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত। কবি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশে তাঁর কাব্য 'ক্ষমানন্দী' নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৪৪ খ্রিঃ বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া কবির সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পুঁথি ঘেঁটে কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের তুলনায় ক্ষেমানন্দ নামটি অনেক প্রাচীন ও সুপ্রচারিত। 'কেতকাদাস' ছিল কবির উপাধি। মনসার অপর নাম 'কেতকা'। তাঁর দাস হিসাবেই উপাধিটি যুক্ত হয়েছে। কবি ছিলেন কায়স্থ। এক মুসলমান ফৌজদারের অধীনে কবির পিতা শঙ্করদাস চাকরি করতেন। ফৌজদারের মৃত্যুর পর অরাজকতা দেখা দিলে তিনি জমিদার ভারমল্লের আশ্রয়ে এসে বসবাস করেন। তিনি কবিকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে গবেষকগণ অনুমান করেন—সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্য রচনা করেন। চিরাচরিত দৈবাদেশ অনুসারে কাব্যখানি রচিত। কবি 'আত্মপরিচয়' অংশে লিখেছেন যে, নির্জন জলার ধারে তিনি এক মুচিনীকে দেখেন, ক্ষণেক পরেই সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সেখানে উপস্থিত হন সর্পভূষণা মনসাদেবী। তাঁর আদেশেই কাব্যটি রচিত।

'আত্মপরিচয়' অংশে ইতিহাস চেতনার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক বিশ্লেষণও রয়েছে। এই অংশের বর্ণনা খুবই মনোজ্ঞ। তবে এই অংশে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ স্তরের স্বল্প প্রতিভার অধিকারী হয়েও কবি সীমাহীন খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাহিনী গ্রন্থনে কবি মৌলিকত্বের দাবি করতে পারেন না। প্রায় সমগ্র অংশই বৈচিত্র্যহীন। তবে একমাত্র 'উষা হরণ' অংশটি সার্থকতা লাভ করেছে। বেহুলা-লখিন্দরের জীবনকাহিনী, বেহুলার ব্যথাদীর্ণ সংগ্রামী রূপটি তেমন হৃদয়স্পর্শী হয়নি। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার মধ্যে কবির নিখুঁত ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

চরিত্র চিত্রণে চরম সার্থকতা দাবি করতে না পারলেও মনসাদেবীর ক্রুর-রূঢ়, ভয়াল-ভয়ংকর রূপটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। রচনাভঙ্গী খুব সাধারণ স্তরের। ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে কবি খুবই পরিচ্ছন্ন। তাঁর কাব্যখানি অনেকগুলি পালার যেন বৃহৎ সংকলন। তবে পালাগুলির যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ।

রূপবর্ণনায় সংস্কৃত শব্দের অত্যধিক ব্যবহার ও অলঙ্কার সজ্জার রীতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের প্রসঙ্গে কবি প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দও যুক্ত করেছেন। ব্রত-পাঁচালীজাতীয় গ্রন্থটি আজও 'মনসামঙ্গল' কাব্য-ধারায় স্মরণীয়।

7.4 সারাংশ

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকী তার পরেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর এই কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক

দেব-দেবী বাঙালির আর্যেতর সংস্কারেরই ধারক। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী বহু পূর্বেই ছড়ায়, পাঁচালীতে ও মেয়েলি ব্রতকথার তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য ও সমাজে তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পাঠান ও পরবর্তীকালে মোগল আমলে বাঙালি হিন্দু বিদেশী শক্তির আক্রমণ ও শত অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা জানায়। ভক্তের কাছে তাঁরা বরাভয় মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উচ্চবর্ণ হিন্দু ও আর্যেতর গোষ্ঠীর সমন্বয়ের পর থেকেই এই মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনে মনসামঙ্গল আখ্যান কাব্য রচিত। মনসামঙ্গলে স্পষ্টত তিনটি ধারা রয়েছে— (১) রাঢ়ের ধারা। এর ধারক-বাহক বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবি। (২) পূর্ববঙ্গের ধারা। এই ধারার প্রায় সব কাব্যগ্রন্থই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও দ্বিজবংশী দাস এই ধারার স্রষ্টা। (৩) উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা। অন্য দুটি ধারার থেকে এই ধারা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র এর প্রাণপুরুষ। এই ধারায় ধর্মমঙ্গলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর নাম স্মরণীয়।

নারায়ণ দেব প্রাক্-চৈতন্যযুগের স্বনামধন্য কবি। তাঁর কোনো পুঁথিতে কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তিনি লৌকিক কাব্য লিখলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি যে অভিজ্ঞ ছিলেন তার প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। মহাভারত, শিবপুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর নানা উপাদানে তাঁর দেবকাহিনী সমৃদ্ধ। করুণরস সৃষ্টিতে তিনি সার্থক। চরিত্র সৃষ্টি, রসবৈচিত্র্য ও কাহিনী গ্রন্থনে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। আসাম ও বাংলাদেশ এই কবির দাবিদার।

বিজয় গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে (প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী) জন্মগ্রহণ করেন। আজও স্বগ্রামে মনসার মন্দির ও মূর্তি আছে। বাংলাদেশে কবির কাব্যের খুব সমাদর দেখা যায়। হুসেন শাহের সিংহাসন লাভের পর কাব্যখানি রচিত বলে অনেকে মনে করেন। কাব্য লক্ষণের বিচারে তাঁর কাব্য প্রশংসার যোগ্য না হলেও মনসা, শিব চরিত্র সার্থক হয়েছে। তবে চাঁদ সদাগরের চরিত্রে পৌরুষের সঙ্গে স্থূলতার প্রকাশ ঘটাতে চরিত্রটির মহিমা কিছুটা ম্লান হয়েছে। বেহুলা চরিত্র কবির সার্থক সৃষ্টি।

বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। কবি প্রাচীন হলেও তাঁর কাব্য সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৪৯৫ খ্রিঃ কাব্যখানি সমাপ্ত হয়। কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্বের প্রমাণ আছে। বেহুলা, সনকা ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রগুলি সার্থক। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রায় কবির বাস্তবনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ-সরল ভাষায় রচিত কাব্যখানি মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে রয়েছেন দ্বিজবংশী দাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবিগণ। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক পদার্থ কিছু কিছু দেখা যায়। মূল পাঠে এই পরিবর্তন রেখা স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে ক্ষেমানন্দ ও দ্বিজবংশী দাস উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজবংশী দাস ঃ অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার কবি বংশী দাসের 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণে'র জনপ্রিয়তা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। আনুমানিক কাব্যখানি ১৫৭৫-৭৬ খ্রিঃ রচিত। দেবখণ্ডের হর-পার্বতীর কাহিনীতে পুরাণ অনুসরণ করলেও কবি শিব-কাহিনীর শেষাংশে

তা করেননি। তাঁর হাতে চাঁদ সদাগর শাক্ত হয়েছে। শব্দ প্রয়োগ ও অলঙ্কার বিন্যাসে কবির পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মেলে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব প্লাবনধারায় বংশী দাসের কাব্যও প্লাবিত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'কেতকাদাস' উপাধি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবির কাব্যখানি রচিত। স্বল্প প্রতিভাধারী হয়েও কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চরিত্র চিত্রণে তিনি প্রশংসার দাবি করতে পারেন না। ভাষা অনেকটা স্বচ্ছ। তৎসম গন্ধী শব্দ ব্যবহারের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব তাঁর লেখার অনেক স্থানে দেখা যায়।

এ ছাড়া তন্ত্রভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ স্বল্প প্রতিভাধর উত্তরবঙ্গের কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্যধারার কাহিনীতে কিছুটা নূতনত্বের আমদানি করেন। এঁদের লেখায় ধর্মমঙ্গলের প্রভাব দেখা যায়। রচনারীতি ও কাহিনী গ্রন্থনে তন্ত্রবিভূতি প্রশংসার দাবী রাখেন। জগজ্জীবনের লেখায় গ্রামীণ ধারা বহমান। শিব-দুর্গার কাহিনী এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর সৃষ্টিতে মৌলিকত্ব নেই।

7.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৪ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের প্রশ্নগুলির 4টি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে ডানদিকে। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) মনসামঙ্গলে মূল দ্বন্দ্ব : (1) মনসার সঙ্গে বেহুলার
(2) মনসার সঙ্গে শিবের
(3) মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের
(4) মনসার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর

(খ) প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি হলেন : (1) দ্বিজবংশী দাস
(2) নারায়ণ দেব
(3) তন্ত্রবিভূতি
(4) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

(গ) চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি হলেন : (1) বিপ্রদাস পিপিলাই
(2) দ্বিজবংশী দাস
(3) নারায়ণ দেব
(4) বিজয় গুপ্ত

2. নিম্নে দু'জন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত স্থানে লিখুন :

(ক) নারায়ণ দেব : মনসামঙ্গল
পদ্মাপুরাণ

(খ) বিজয় গুপ্ত :

3. নিম্নের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন :

(ক) নারায়ণ দেবের কাব্য ________ খণ্ডে বিভক্ত।

(খ) নারায়ণ দেব কাহিনী চয়নে মূলত ____ ____ আশ্রয় করেছেন।

(গ) করুণরস সৃষ্টিতে ______ তুলনারহিত।

(ঘ) ক্ষেমানন্দের________উপাধি।

(ঙ) তন্ত্রবিভূতির কাব্যে ________ রসের আধিক্য।

(চ) জগজ্জীবন ঘোষাল _________ বঙ্গের কবি।

4. নিম্নের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন () দিয়ে চিহ্নিত করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) বিপ্রদাস পিপিলাই পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের কবি।	☐	☐
(খ) বিজয় গুপ্ত ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছিলেন।	☐	☐
(গ) নারায়ণ দেবের হাতে চাঁদ সদাগর দুর্বল হয়েছে।	☐	☐
(ঘ) মনসামঙ্গলের আদিকবি কানা হরি দত্ত।	☐	☐
(ঙ) দ্বিজবংশী দাসের কাব্য ১৩৩০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।	☐	☐

7.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ চণ্ডীমঙ্গল

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদেবতার পূজা এবং সারারাত ধরে মঙ্গল গানের কথা চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া গেলেও চৈতন্যপূর্ব যুগের কোনো চণ্ডীমঙ্গল আমরা পাই না। এর ফলে সে যুগে এ কাব্যের রূপরেখা কি ছিল, তা-ও আমাদের অজানা। চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই চণ্ডীমঙ্গলের নিদর্শন আমরা পাই। চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে তথ্যাদি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'লো।

চণ্ডীর উৎস খুঁজতে গিয়ে গবেষকগণ পৌরাণিক বিভিন্ন নারীদেবতা, হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত নানা দেবী, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীর কথা উল্লেখ করলেও, আর্যেতর প্রভাবই এর মূলে আছে। বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর বিকাশের মূলেও আছে মেয়েলি ব্রত কথাদির প্রভাব। 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-গ্রন্থের লেখক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য চণ্ডীদেবীর পৌরাণিক উৎসের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। নানা তথ্যসহ তিনি প্রমাণ করেছেন যে, লোক-সংস্কারে বাঙালি ও কাছের অনার্য জাতির লোকজন চণ্ডীদেবী ও নানা লোকদেবতার পূজা করতো। ওরা ওঁদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী 'চাণ্ডী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিকার ও যুদ্ধের কথা কালকেতুর কাহিনীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধনপতির কাহিনীতে শিকার-যুদ্ধাদি না পাওয়া গেলেও এক গার্হস্থ্যজীবন চিত্র আছে। অনেকের ধারণা পরবর্তিকালে স্বতন্ত্র দেব-পরিকল্পনা থেকে দুটি কাহিনীর ভিত্তি সমন্বয় লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেনও চণ্ডী ঠাকুরের লোক-উৎসের কথাই বলেছেন। কেউ কেউ চণ্ডী-মঙ্গলের চণ্ডীকে অস্ট্রিক (আদিবাসী) বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আর্যেতর দেবী—আবার কেউ কেউ অনার্য ব্যাধ জাতির পূজিতা দেবী বলে চিহ্নিত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী আদিতে যাই থাকুক না কেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই দেবী উচ্চ সমাজেও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দেবীর পূজা প্রচারের মূল শক্তিরূপে বাংলার নারীজাতিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ঃ চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী। সংক্ষেপে কাহিনী দুটি বর্ণিত হ'লো। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায় তাতে (১) আখেটিক খণ্ড অর্থাৎ ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং (২) বণিক খণ্ড অর্থাৎ ধনপতি সওদাগরের কাহিনী পাওয়া যায়। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই দুটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের শুরুতে হর-পার্বতীর গার্হস্থ্যজীবন–চিত্র, তারপর ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের অভিশপ্ত মর্ত্যজীবন কালকেতুরূপে, অন্যদিকে তার স্ত্রী ছায়া ফুল্লরা ব্যাধিনীরূপে কাহিনীতে এসেছে। অতঃপর কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবন-চিত্র, চণ্ডীর ছলনা, পরিচয়দান। দেবীর পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী কালকেতুকে বহু ধনদান করেন—এর পর গুজরাট নগর পত্তন করে কালকেতু রাজা হয়—ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করে—কাতকেতু বন্দী হয়। দৈববাণী শুনে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দেয় এবং রাজা বলে স্বীকার করে। ভাঁড়ুকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েও দয়াবশে তাকে ঘর-বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হবার পর শাপমুক্ত হয়ে পুত্রসন্তান পুষ্পকেতুর ওপর রাজত্ব ভার অর্পণ করে, মর্ত্যরূপ ত্যাগ করে পূর্বরূপে স্বর্গে ফিরে যায়। ব্যাধ কালকেতুর সাহায্যে চণ্ডীপূজা প্রচারের কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই।

তৎকালীন সমাজের কর্ণধার বণিক সম্প্রদায়। বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতির দ্বারা চণ্ডীপূজা প্রচার করতে চান—যাতে তার পূজা সমাজজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। শৈব ধনপতি চণ্ডীর পূজা না করে বরং চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে, এতে দেবী ক্রুদ্ধ হন—ধনপতির জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। সমুদ্রের ঝড়ে বাণিজ্যতরী ডুবে যায়—কালীদহে কমলেকামিনী দেখে কোনোক্রমে জীবন নিয়ে সিংহলে পৌঁছায়। সিংহলরাজ কমলেকামিনী দেখতে চায়। তা দেখাতে না পারার জন্য কারারুদ্ধ হয়। স্ত্রী লহনা, খুল্লনার সপত্নী বিরোধ চরমে পৌঁছায়। পুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে পিতাকে খুঁজতে বের হয়। সে সিংহলরাজকে কমলেকামিনী দেখানোর পর ধনপতির মুক্তি ঘটে। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তর বিয়ে হয়। তারপর পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে ধনপতি দেশে ফিরে ধুম-ধাম করে চণ্ডীদেবীর পূজা করে। স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা—মর্তে খুল্লনা ও মালাধর শ্রীমন্ত নামে পরিচিত ছিল। কাল সম্পূর্ণ হলে স্বর্গের রত্নমালা ও মালাধর স্বর্গে ফিরে গেলে—পার্থিব জীবনে ধনপতি দুঃখ-বেদনায় দিন কাটায়। দ্বিতীয় কাহিনীটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও—কালকেতুর কাহিনীর মতো সংহত নয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে যে তিনজন কবি মেয়েলি ব্রতকথার আঙিনা থেকে উদ্ধার করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছেন—তাঁদের কবি-পরিচিতি—ও তাঁদের কাব্য-পরিচয় তুলে ধরা হলো। এই আলোচনার মধ্য দিয়েই চণ্ডীমঙ্গলের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের কারণ জানা যাবে।

মানিক দত্ত ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

“মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।”

এ থেকে বোঝা যায়—মুকুন্দ পূর্বেই মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল লিখেছিলেন। কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে—তাঁর নামে রচিত দুখানি অর্বাচীন কাব্য নিয়ে। ভাষাবিচারে কোনো কাব্যকেই প্রাচীন বলা চলে না।

কবি ও কাব্য পরিচিতি ঃ কাব্য পাঠে মনে হয়, কবি মালদহ জেলার মানুষ—কারণ তাঁর কাব্যে ঐ অঞ্চলের নানা স্থানের উল্লেখ আছে। কাব্যের আরম্ভ পর্বে কবির জবানীতে যে আত্মপরিচয় আছে— তা কবির লেখা কি না—এ বিষয়ে সংশয় আছে। তাঁর কাব্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের পর হর-পার্বতীর কাহিনী পাওয়া যায়—এর পর অতি সংক্ষেপে কবি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী লিখেছেন। মানিক দত্তের কাব্য ছড়া, পাঁচালী জাতীয়। মঙ্গলকাব্যের বিস্তারী রূপ এতে নেই। ঘটনাটি

সুবিন্যস্ত নয়, ভাষা অর্বাচীন, ছন্দের ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। হয়তো হাত বদল হতে হতে কবির সৃষ্টি প্রাচীনত্ব হারিয়েছে।

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য ঃ উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামব্যাপী দ্বিজমাধবের সুপরিচিতি। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল', রচনাকাল—১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ষোড়শ শতকে মাধবাচার্য নামে অপর এক কবি 'কৃষ্ণমঙ্গল' লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

কবি-পরিচিতি ঃ গ্রন্থারম্ভে 'আত্মকথা' থেকে জানা যায়, কবি সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে হয়তো মোগল-পাঠান বিরোধের সময় পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে কবি-পরিবার চট্টগ্রামে চলে যান। কবির সব কাব্যগ্রন্থ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও রংপুর (অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত) অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

কাব্য-পরিচয় ঃ দ্বিজমাধবের কাব্যখানির প্রকৃত নাম 'সারদামঙ্গল'। মার্কেণ্ডের চণ্ডীর অনুসারে তিনি দেবখণ্ডে 'মঙ্গলাসুরবধে'র কল্পিত কাহিনী যুক্ত করেছেন। অন্য কোনো মঙ্গলচণ্ডী কাব্যে এই কাহিনী নেই। এই কাব্যে কালকেতু-ধনপতির কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। একমাত্র ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ছাড়া কোনো চরিত্র চিত্রণেই কবি সার্থক হননি। কাব্যখানি ব্রত-পাঁচালীর লক্ষণযুক্ত। দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে কয়েকটি 'বিষ্ণুপদ' সংযুক্ত করেছেন। পদগুলি সার্থক। এই সব পদ দেখেই বোঝা যায় কবির মনটি বৈষ্ণবীয় কোমল-মধুর ছিল। মুকুন্দর কাব্য রচনার পূর্বেই দ্বিজমাধব কাব্য লিখেছেন। তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে মৃদু পরিহাস-রসিকতাও দেখা যায়। তবে বাস্তব জীবন চিত্রকর হিসাবে কবি মুকুন্দর তুলনায় অনেকাংশেই ম্লান। প্রথম শ্রেণীর কবির মর্যাদা দ্বিজমাধবের প্রাপ্য নয়।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ঃ মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ যুগের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করেছেন। মঙ্গলকাব্য ধারার মৌলিক কবির স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। বাস্তবতা, সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, রসস্নিগ্ধ কৌতুক মুকুন্দর লেখায় জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্য-কাঠামোর মধ্যেও মুকুন্দর মানুষের আশা-স্বপ্ন ও সুখ-দুঃখের কথা জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। দুঃখ-বেদনার পাথার পেরিয়ে কবির মানবতাবাদী রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, রচনারীতি, বাস্তব জীবনবোধ ইত্যাদির সমন্বয়ে মুকুন্দ সৃষ্টি মঙ্গল-কাব্যজগতে অতুলনীয়। এইজন্যই সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—মুকুন্দরাম যদি এ যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে, কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।

কবি-পরিচিতি ঃ মুকুন্দ তাঁর কাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তি' অংশে নিজের জীবনের সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। কবি ছিলেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম নিবাসী। এই অঞ্চলে মাহ্‌মুদ সরিফ নামে এক অত্যাচারী ডিহিদার ছিল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রী-পুত্র-ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পৈতৃক ভিটে ছাড়তে তিনি বাধ্য হন। পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ঘুরতে ঘুরতে মেদিনীপুর জেলার আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁকে আশ্রয় দেন এবং পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। আরড়ায় আসবার পথেই তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনার জন্য দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হলে তাঁরই প্রেরণাতে কবি কাব্য রচনায় ব্রতী হন। রঘুনাথই কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দান করেন।

কাব্য-পরিচিতি ঃ মুকুন্দরামের কাব্য সাধারণতঃ 'অভয়ামঙ্গল' নামে পরিচিত। তাঁর কাব্য নানা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিষয়বস্তুকে রসগৌরবদানে তিনি সিদ্ধহস্ত। দূর ও নিকট থেকে জীবনের নানা ঘটনাকে দেখেছেন,

স্নিগ্ধ হাসিতে জীবনের দুঃখের পাথার পেরিয়ে গেছেন। জীবনবাদী কবি তাঁর সৃষ্টিকে স্নিগ্ধ-কৌতুক রসে ভরিয়ে দিয়েছেন।

শিবের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সংসার, কালকেতুর ভোজন, মুরারি শীলের শঠতা, ভাঁড়ু দত্তের ধূর্তামি, ধনপতির লালসা ইত্যাদির মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পশুদের ক্রন্দন', 'ফুল্লরার বারমাস্যা' ইত্যাদি উল্লেখ করে অনেক সমালোচক কবিকে 'দুঃখবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা থাকলেই কবি দুঃখবাদী হল না। তথ্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ 'মানুষের কবি' মুকুন্দ সমগ্র জীবনদৃষ্টি দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে জগৎ ও জীবনকে দুঃখ-কৌতুকের মিশ্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই কবিকে 'জীবনবাদী'রূপে চিহ্নিত করা যায়।

চরিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠতা তর্কাতীত। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি জীবন্ত। প্রৌঢ় শিব কবির হাতে ভোজনবিলাসী, কর্মবিমুখ-বালসুলভ, কালকেতু শক্তিমান স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, ধনাঢ্য ধনপতির চারিত্রিক স্থূলতা, সপত্নীর কলহ, মুরারী শীলের চালাকি, ভাঁড়ু দত্তের লোভ-শঠতা ইত্যাদি বাস্তবানুগ ও জীবন্ত হয়েছে। তাই সমালোচক বলেছেন, "যতটুকু বাস্তবনিষ্ঠা, মানব চরিত্রবোধ, মানবতা, সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে আমরা পাই, সে-যুগের তুলনায় তা একটা অপরিমিত বিস্ময়।"

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে রচনাকাল ও ঐতিহাসিক ঘটনাদির ব্যাপারে মুকুন্দ কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যাদির নিরিখে গবেষকগণ গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৯৪ সালের পরে ১৬০৩ সালের পূর্বে রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতেই দ্বিজ জনার্দন ও বলরামের দুটি চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায়। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় এঁদের কৃতিত্ব নেই বললেই চলে। জনার্দনের গ্রন্থটি ছড়াজাতীয়। বলরামের কাব্যেও উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দ্বিজমাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' মধ্যযুগেই রচিত বলে কেউ কেউ দাবী করলেও—চণ্ডীমঙ্গল ধারার সঙ্গে এঁদের যুক্ত করা যায় না।

7.7 সারাংশ

লৌকিক চণ্ডীদেবীর পূজা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। পশুদের ও শিকারির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, হারানো প্রাপ্তির দেবতা, পৌরাণিক দুর্গা ও তান্ত্রিক দেবীর মিশ্রণেই চণ্ডীর উদ্ভব। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর চণ্ডী প্রধানত শিকার ও পশুদের দেবতা। ধনপতি শ্রীমন্ত-কাহিনীর চণ্ডী—হারানো প্রাপ্তির মেয়েলি দেবতা। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই কাব্যসৃষ্টির তথ্যাদি পাওয়া গেলেও কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় চৈতন্য পর্ব থেকে। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিক দত্তের পুঁথি পাওয়া যায়নি।

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্যের রচনা সংক্ষিপ্ত, বাস্তবতাপূর্ণ এবং অলঙ্কৃত। গভীর তথ্যসন্ধানী দৃষ্টিই মাধবাচার্যের প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যখানি রচিত। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র অঙ্কনে কবি কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর কাব্যে কয়েকটি 'বিষ্ণুপদ' আছে। পদগুলি প্রশংসার দাবি রাখে। কবির মন বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূল ছিল। কাব্যখানিতে ব্রত-পাঁচালীর লক্ষণ আছে।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য ১৫৯৪ সালের পর ১৬০৩ সালের পূর্বে রচিত। মাহ্মুদ সরিফের দ্বারা অত্যাচারিত কবি চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আশ্রয় পান মেদিনীপুর জেলায় বাঁকুড়া রায়ের কাছে। তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হয়ে কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দান করেন। তাঁর

প্রেরণায় ও চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে কবি কাব্যখানি লেখেন। সাধারণত তাঁর কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' নামে পরিচিত। মধ্যযুগের জীবনমুখী বাস্তব রসস্নিগ্ধ কবি হিসাবে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারূপে চিহ্নিত। তাঁর জীবনদৃষ্টি, কৌতুকস্নিগ্ধ মন, বাস্তব অভিজ্ঞতা কাব্যখানিকে আকর্ষণীয় করেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে কবি অতুলনীয়—তাঁর হাতে শিব, কালকেতু, বিশেষ করে টাইপ চরিত্র মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত অনবদ্য হয়েছে। অনেকে মুকুন্দকে দুঃখবাদী বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও তার কাব্যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-আনন্দ-বেদনার তালে তালে যে জীবন-ছন্দ বয়ে গেছে তা দেখে আমরা নিঃসন্দেহে কবিকে জীবনবাদী-মানবতাবাদী কবিরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

ষোড়শ শতাব্দীর দু'-চার জন কবির নাম পাওয়া গেলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আলোচনায় তাঁরা নিষ্প্রভ।

7.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

	ঠিক	ভুল
(ক) চণ্ডীমঙ্গলে তিনটি কাহিনী আছে।	☐	☐
(খ) চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিক দত্ত।	☐	☐
(গ) মুকুন্দ দুঃখবাদী কবি।	☐	☐
(ঘ) মাধবাচার্য বা দ্বিজমাধবের কাব্যেই একমাত্র 'বিষ্ণুপদ' আছে।	☐	☐
(ঙ) মুকুন্দর কাব্য ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত।	☐	☐

2. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) মুকুন্দ দামুন্যা গ্রাম থেকে যার জন্য চলে এসেছিলেন তার নাম : 1. হুসেনশাহ 2. মাহ্‌মুদ সরিফ 3. বরবক শাহ

(খ) দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য কাব্যগ্রন্থের নাম কোন্ কোন্ স্থানে দিয়েছেন : 1. কালিকামঙ্গল 2. চণ্ডীমঙ্গল 3. সারদামঙ্গল

(গ) মুকুন্দরামের কাব্য সাধারণত যে নামে পরিচিত তা হলো : 1. সারদামঙ্গল 2. অভয়ামঙ্গল 3. চণ্ডীমঙ্গল

(ঘ) মুকুন্দর জন্মস্থান : 1. দামুন্যা 2. মালদহ 3. চট্টগ্রাম

3. শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন :
   (ক) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য চণ্ডীদেবীর______উৎসের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।
   (খ) ওরাওঁদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী______।
   (গ) কালকেতুর কাহিনী আছে________খণ্ডে।
   (ঘ) ধনপতির কাহিনী আছে_______খণ্ডে।
   (ঙ) চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি________।

7.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ঃ ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। ধর্মঠাকুর ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষদের—বিশেষ করে ডোমদের দেবতা। এই দেবতা আদিতে ছিলেন অনার্য। পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার প্রভাবও এর ওপর পড়ে। কূর্মের অকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড ধর্মঠাকুরের প্রতীক। দেখতে অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের মতো। এ থেকে মনে হয়, বৌদ্ধ প্রভাবও ধর্মঠাকুরের ওপর পড়েছিল। বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বহু গ্রামে ধর্মের স্থান (বা থান) আছে। ধর্মমূর্তি পরিকল্পনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। যার ফলে কূর্মাকৃতি ছাড়াও বিচিত্র মূর্তি পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি নানা দেবতার সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন।

ধর্মঠাকুরের পূজারীকে ধর্মের দেয়াসী বলে। পূজারীরা প্রধানত অ-ব্রাহ্মণ। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ধর্মঠাকুর কালু রায়, বাঁকুড়া যায়, বুড়া রায় ও ডোম রায় ইত্যাদি নামে চিহ্নিত। রাঢ় অঞ্চল জুড়ে সুসংবদ্ধ ডোম জাতি মূলত ধর্মঠাকুরের উপাসক। এই দেবতা ডোমদের রণদেবতা। মনসা ও চণ্ডীর মতো ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের তুলনায় ধর্মমঙ্গলের আখ্যান অর্বাচীন কালের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাল রাজাদের সম্পর্কে জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকার প্রভাব কিছুটা আছে। ঢেকুর গড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন, ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষ গৌড়েশ্বরের অপর সামন্ত, সে চণ্ডীর বরপুত্র এবং ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ একই ব্যক্তি মনে করা হয়। রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্যরূপে ধর্মমঙ্গল পরিচিত। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল নারী-দেবতার কাহিনী কিন্তু ধর্মমঙ্গল পুরুষ-দেবতার কাহিনীসমৃদ্ধ। এই কাব্যে বীররস প্রাধান্য পেয়েছে। অনেকে এর মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—
"ইহাই রাঢ়ের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত।"

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা হ'লো।

সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ চণ্ডীর বরলাভ করে দুর্দান্ত হয়। সে ঢেকুরগড়ের রাজা কর্ণসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে কর্ণসেন পরাজিত হয়। তার ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়—রানীও শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেনকে গৌড়েশ্বর আশ্রয় দেন এবং তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেন গৌড়রাজের শ্যালক মহামদ। তার বিয়েতে মত ছিল না বলেই রাজা তাকে দূরে পাঠিয়ে দেন। বিয়ের পর কর্ণসেন ময়না গড়ের সামন্ত রাজা হন। মহামদ কিছুতেই সব ব্যাপার মেনে নিতে পারেনি। রঞ্জাবতীর সন্তানাদি না হওয়াতে ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কণ্টকশয্যা গ্রহণ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় খুশি হয়ে ধর্মঠাকুর পুত্র বর দেন।

ছেলের নাম লাউসেন। মহামদ লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মঠাকুর কর্পূরধবলকে সৃষ্টি

করেন এবং রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দেন। ধর্মের আদেশে হনুমান লাউসেনকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনে এবং ফলে রঞ্জাবতী হলেন দুই পুত্রের মা।

বড় হয়ে লাউসেন আর কর্পূরধবল গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করে। লাউসেনের বীরত্বে তিনি খুশি হন। লাউসেনকে বধ করার জন্য মহামদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লাউসেন কামরূপ জয় করে সেখানকার রাজকন্যা কলিঙ্গাকে এবং লোহার গণ্ডারকে দুই টুকরো করে সিমুলার রাজকন্যা কানড়াকে বিয়ে করেন।

মহামদ চক্রান্ত করে লাউসেনকে পাঠায় ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এই অসাধ্য সাধনের জন্য সে তপস্যায় মগ্ন হয়। সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করে। কিন্তু রানী কানড়ার কাছে সে পরাজিত হয়। এদিকে লাউসেন ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নিজের মাথা কেটে আগুনে আহুতি দেন। এতে প্রসন্ন হয়ে মহামদ নির্দেশিত লাউসেনের অসাধ্য কাজটি ধর্মঠাকুর করে দেন। তিনি সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদিত হবার জন্য আদেশ দেন। ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় এবং লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন।

ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন—ময়ূরভট্ট, খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, মানিক গাঙ্গুলি প্রমুখ কবিগণ। তবে সবদিক থেকে ঘনরাম ও রূপরামই উল্লেখযোগ্য। নীচে বিভিন্ন কবির পরিচিতি প্রদান ও তাঁদের কাব্যের মূল্যায়ন সংক্ষেপে করা হল :

ময়ূরভট্ট ঃ ধর্মমঙ্গলের প্রায় সকল কবিই ময়ূরভট্টকে আদি ধর্মমঙ্গল রচয়িতার সম্মান দিয়েছেন। সংস্কৃত 'সূর্যশতক'-এর রচয়িতা ময়ূরভট্ট। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে অথবা অন্য কোনোভাবে তিনি আদি ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি।

শ্যামপণ্ডিত ও খেলারাম ঃ শ্যামপণ্ডিতের পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। তাঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জনমঙ্গল'। 'পণ্ডিত' উপাধি দেখে অনেকে মনে করেন কবি ডোমদের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ড. সুকুমার সেন শ্যামপণ্ডিতের কাব্য রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলে চিহ্নিত করেছেন। কাব্যের যে অংশটুকু পাওয়া গেছে তাতে ভাষা ব্যবহারে কবির নিপুণতা দেখা যায়। লেখায় ব্যঙ্গের সুর ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে।

অনেকেই খেলারামকে ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলে মনে করেন। তাঁরও কাব্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে কবি সম্পর্কে কিংবদন্তী রাঢ় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরামের কাব্যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন কবির কাব্যের কিছুটা অংশ প্রকাশ করেছেন, তা থেকেই রূপরাম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠেছে।

কবি-পরিচিতি ঃ রূপরাম রাঢ় দেশের কবি। ব্রাহ্মণ হয়েও ধর্মমঙ্গল রচনার জন্য তিনি সমাজে পতিত হয়েছিলেন। তবে এ-ব্যাপারে ব্যক্তিগত কারণও থাকতে পারে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, কবির কাব্য রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের শেষদিকে। ড. সুকুমার সেনের মতে, রচনা ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ। রূপরামের কাব্যে শাহ সুজার নাম পাওয়া যায়, সেই সূত্র ধরেই রচনাকাল চিহ্নিত হয়েছে। রূপরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে। সমালোচকের ভাষায়—রূপরামের কাব্যে 'সরলতা আছে, বাহুল্য নাই।' তাঁর কাব্যে তৎকালীন বাঙালি জীবনের বাস্তব ও মনোহর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

কাব্য-কথা : রূপরামই প্রথম কবি যিনি লাউসেনের কাহিনীকে ছড়া-পাঁচালী ও ব্রতকথার সীমানা ছাড়িয়ে, কাব্যাকারে রূপ দিয়েছেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' অংশটি সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। চরিত্র চিত্রণ, ভাষা প্রয়োগ,

বর্ণাভঙ্গিমা ও রচনারীতি প্রশংসনীয়। করুণরস ও হাস্যপরিহাসে তাঁর কাব্যখানি মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ অনেকেই রূপরামকে অনুসরণ করেছেন।

রামদাস আদক ঃ রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'; রচনা কাল : ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ। কবি জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত, বাড়ি হুগলি জেলার হায়াৎপুর গ্রামে। অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির কাব্য সম্পাদনা করেন। তবে তাঁর সম্পাদিত কাব্য মূল পুঁথি নয়, লোকমুখে শোনা পয়ার-ত্রিপদী। রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের অনেক মিল আছে। কবির ভাষায় পরিচ্ছন্ন ক্লাসিক বাঁধন আছে। অলঙ্করণ মণ্ডণকলায়, শব্দযোজনায় ও রূপনির্মিতিতে কাব্যখানি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

সীতারাম দাস ঃ কবি জাতিতে কায়স্থ, বাড়ি বর্ধমান জেলার 'সুখসাগর' গ্রামে। কাব্য রচনাকাল : ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ। পিতার নাম দেবী দাস, মাতা কেশবতী। সীতারাম দাসের কাব্যে ময়ূরভট্টের নাম মাঝে মাঝেই উচ্চারিত হয়েছে। কাব্যের কাহিনী স্বচ্ছ-বিবৃতিধর্মী। চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা দেখাতে না পারলেও প্রকৃতি বর্ণনায় সে ঘাটতি কবি পূরণ করেছেন। ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁর কাব্যকে সরস করেছে।

যদুনাথ (যাদবনাথ) ঃ বিশ্বভারতী থেকে ড. পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় যদুনাথের 'ধর্মমঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে। কবি হাওড়া জেলার লোক। কবির পুঁথিটি অখণ্ডিত ও সম্পূর্ণ। যদুনাথের কাব্যকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর কাব্যখানি ধর্মপুরাণ জাতীয়। কাব্যটিতে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করার মত।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ ধর্মমঙ্গলের সুপরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে কবি তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেন। ঘনরাম বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আদেশেই তিনি চব্বিশ অধ্যায়ের সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' লিখেছিলেন।

কাব্য-পরিচিতি ঃ বৃহৎ কাব্যখানির ফাঁকে ফাঁকে কবি পুরাণের নানা প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য থাকলেও কবির ভাষা স্বচ্ছ-মার্জিত, অনুপ্রাস অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি থাকলেও অলঙ্করণ-সজ্জা মানানসই। ধর্মমঙ্গলের বীর রসাত্মক চরিত্রগুলি কবির হাতে মানবিক কোমল-পেলবতায় মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে তার জন্য বীরত্বের হানি ঘটেনি। ঘনরামের প্রখর বাস্তববোধ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। কবির হাতে কালু ডোমের সরল বীরত্ব, মহামদের ছলচাতুরী, কানড়ার প্রেমভাবনা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির সৃষ্টিতে বিদগ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বসূচনা দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় এবং এজন্য তাঁর জনপ্রিয়তাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

মানিক গাঙ্গুলি ঃ অষ্টদশ শতাব্দীর অপর একজন ধর্মমঙ্গলের কবির সময়কাল সম্পর্কে কিছুটা বিতর্ক আছে। প্রামাণিক পুঁথি না পাওয়ার জন্যই এই বিভ্রাট। অনেকের মতে কাব্যখানি ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত কিন্তু কাব্যের ভাষাবিচারে একে ষোড়শ শতাব্দীর কাব্য মনে হয় না। পুঁথিতে যে সন ও তারিখ পাওয়া যায় সেটি হয়তো নকলনবীসদের কিছুটা ভ্রান্তির ফল। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ। অন্যদের মতে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ। তবে রচনাকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও কাব্যের ভাষা বিচারে বলা যায় কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই লেখা কবির হাতে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হয়েছে। তবে চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্ব আছে। মানিক গাঙ্গুলি 'শীতলামঙ্গল' নামেও একখানি কাব্য লিখেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়েই আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের পাঠ নবম এককে পাব।

7.10 সারাংশ

ধর্মঠাকুর দেবতারূপে তুর্কী বিজয়ের সময় থেকে সমাজে বিকশিত হতে শুরু করেন। এর ভিত্তিভূমিতে প্রস্তর উপাসনা, আদিম লৌকিক সূর্য উপাসনা ও ডোমদের যুদ্ধদেবতা থাকলেও ক্রমে পৌরাণিক বিষ্ণু, শিব এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ে। ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণের দ্বারা কখনোই পূজিত হননি। বীর রসাত্মক, যুদ্ধপ্রধান কাব্যখানি 'রাঢ়ের মহাকাব্য' বলে পরিচিত। বীর রমণীদের জীবনচিত্র এই কাব্যধারায় বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কোনো গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও ময়ূরভট্টও আদিকবিরূপে চিহ্নিত। প্রথম পর্যায়ের কবিদের মধ্যে শ্যামপণ্ডিত ও খেলারামের নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী কবি হলেন রূপরাম। সহজ-সরল, বাহুল্যবর্জিত কাব্যখানি বাস্তব জীবনরসে ভরা। লাউসেনের কাহিনী তিনিই প্রথম কাব্যের আসরে এনে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। করুণরস এবং হাস্যরস সৃজনে কবি সার্থক। অনেক কবিই রূপরামের লেখাকে অনুসরণ করে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। এ ছাড়া রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ প্রমুখ কবিগণও ধর্মমঙ্গলকাব্যকে সমৃদ্ধ করতে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যকারদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির চরিত্র চিত্রণ সার্থক। ভাষাও স্বচ্ছ। এ যুগেই মানিক গাঙ্গুলি 'ধর্মমঙ্গলকাব্য' লেখেন। কবির হাতে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্ব আছে। কাব্যখানির রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ভাষাবিচারে একে অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলেই মনে হয়।

7.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্রশ্নগুলির নির্দেশমত উত্তর করুন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) ধর্মঠাকুর পূজারী হলেন	:	1. ব্রাহ্মণ
		2. কায়স্থ
		3. অ-ব্রাহ্মণ
(খ) সোম ঘোষের পুত্র	:	1. লাউসেন
		2. ইছাই ঘোষ
		3. মহামদ
(গ) শ্যামপণ্ডিতের কাব্যগ্রন্থের নাম	:	1. ধর্মমঙ্গল
		2. অনাদিমঙ্গল
		3. নিরঞ্জনমঙ্গল
(ঘ) কবি রূপরাম হলেন	:	1. ষোড়শ শতাব্দীর কবি
		2. সপ্তদশ শতাব্দীর কবি
		3. অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি

(ঙ) পাণ্ডিত্যের জন্য ঘনরাম চক্রবর্তী উপাধি পেয়েছিলেন : 1. কবিরত্ন

2. ন্যায়রত্ন

3. ভারতরত্ন

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

	ঠিক	ভুল
(ক) মহামদ রানী কানড়ার কাছে পরাজিত হন।	☐	☐
(খ) ধর্মমঙ্গলের আদিকবি রূপরাম।	☐	☐
(গ) রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'।	☐	☐
(ঘ) সীতারাম দাসের কাব্য ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত।	☐	☐
(ঙ) ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য ক্ষুদ্র।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দ দিয়ে পূরণ করুন :

(ক) যদুনাথ (যাদবনাথ)-এর কাব্য ——— ——— সম্পাদনা করেন।

(খ) ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য ——— খ্রিস্টাব্দে রচিত।

(গ) রূপরামের কাব্য ——— রস ও ——— রসে স্নাত।

(ঘ) প্রায় সকল 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যকারগণই ময়ূরভট্টকে ——— বলে চিহ্নিত করেছেন।

(ঙ) সকল দিক বিচারে ——— ও ———ই 'ধর্মমঙ্গলকাব্য' ধারার উল্লেখযোগ্য কবি।

7.12 উত্তর সংকেত

7.5 অনুশীলনী 1

1. (3), (2), (4)।

2. (ক) পদ্মাপুরাণ, (খ) মনসামঙ্গল।

3. (ক) তিন, (খ) সংস্কৃতপুরাণ, (গ) বিজয় গুপ্ত, (ঘ) কেতকাদাস, (ঙ) আদি, (চ) উত্তর।

4. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

7.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

2. (ক) 2, (খ) 3, (গ) 2, (ঘ) 1।

3. (ক) পৌরাণিক, (খ) চাণ্ডী, (গ) আখেটিক, (ঘ) বণিক, (ঙ) মুকুন্দ।

7.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) 3, (খ) -2, (গ) -3, (ঘ) 2, (ঙ) 1।

2. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

3. (ক) পঞ্চানন মণ্ডল, (খ) ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ, (গ) করুণ, হাস্য, (ঘ) আদিকবি, (ঙ) রূপরাম, ঘনরাম।

7.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
5. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

একক 8 ❑ চৈতন্যদেব—জীবনীসাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলি

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য
8.2 প্রস্তাবনা
8.3 মূলপাঠ ঃ চৈতন্য জীবনী
8.4 সারাংশ
8.5 অনুশীলনী 1
8.6 মূলপাঠ ঃ জীবনী সাহিত্য
8.7 সারাংশ
8.8 অনুশীলনী 2
8.9 মূলপাঠ ঃ বৈষ্ণবপদ সাহিত্য
8.10 সারাংশ
8.11 অনুশীলনী 3
8.12 উত্তর সংকেত
8.13 গ্রন্থপঞ্জি

8.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ধর্মের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মধ্যযুগের গতানুগতিক পথ ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী-সাহিত্যে'র রূপরেখাটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার সঙ্গে চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির পার্থক্য ও ধারাটি জানতে পারবেন।

8.2 প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের নবজাগরণ অর্থাৎ 'চৈতন্য রেনেসাঁস' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে যে জাগরণ ঘটিয়েছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই বৈষ্ণব-সাহিত্য ঐশ্বর্যের দীপ্তি মহিমা নিয়ে প্রকাশ পায়। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রেমলাবণী ধারায় বাংলাদেশ ভেসে যায়। তাঁর শিষ্য ও অনুচর পরিকরগণ চৈতন্যদেবের ভাব উচ্ছ্বাসে প্লাবনমুখর প্রেমভাবনাকে তত্ত্বকথা ও দর্শনের দ্বারা সুসমৃদ্ধ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি তৈরি করেন। এযুগের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করতে গেলেই চৈতন্যজীবনী ও তার প্রভাবের কথা আবশ্যিক বলে গণ্য। নবদ্বীপের নিমাই কীভাবে মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ হয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ী মানবতাবাদী প্রেমাবতাররূপে চিহ্নিত হলেন, তা জানা প্রয়োজন। চৈতন্যদেবের ব্যক্তি মহিমার স্পর্শ নবদ্বীপের ভক্তদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তাঁর জীবনকে ঘিরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক-তাত্ত্বিক ভাবনা গড়ে উঠল—ইত্যাদি জানা অত্যাবশ্যক। চৈতন্যজীবনীর পাশাপাশি, বাংলার সাহিত্য সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব

এবং চৈতন্যভাব আন্দোলনের সমৃদ্ধ ফসল জীবনীসাহিত্য, বৈষ্ণবপদাবলি, কৃষ্ণলীলা কাব্য—ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি জানার মধ্য দিয়েই আপনারা চৈতন্যযুগের মূল স্বরূপটি ধরতে পারবেন। একমাত্র 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া অন্য কিছু না লিখেও বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবিত যুগটি কেন স্মরণীয়— সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই একক লিখিত।—জীবনচরিতকার বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচনদাস ও বৈষ্ণবপাদকর্তা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাসের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানা তথ্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ এই একক চৈতন্যযুগের স্পষ্ট ধ্যান-ধারণার সহায়ক।

8.3 মূলপাঠ ঃ চৈতন্য জীবনী

চৈতন্যজীবনী : ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। জগন্নাথের আদি বাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীচৈতন্যের অগ্রজের নাম বিশ্বরূপ। তাঁর বাল্য নাম বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গোরা বলেই ডাকত।

বড় ভাই অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে, পিতা গৌরাঙ্গকে প্রথমে টোলে না পাঠালেও পরে তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান।

সেযুগে নবদ্বীপ ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র ও নব্যন্যায়ের পীঠস্থান। স্বল্পদিনের মধ্যেই নিমাই নানা শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করে পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য বলে খ্যাতি লাভ করেন। পিতার দেহত্যাগের পর নিজেই টোল খুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করার কিছুদিন বাদেই তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে যান। বেশ কিছুদিন সেখানে নানা স্থান পরিভ্রমণ শেষে নবদ্বীপ ফিরে আসেন। এদিকে সর্পাঘাতে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মাতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন।

ষোল বৎসর বয়সে গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর কাছে নিমাই 'গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেদিন থেকে তাঁর জীবনে দেখা দেয় ভক্তিরসের প্লাবনধারা। শুরু হয় জীবনের নব অধ্যায়।

নবদ্বীপে ফিরে নবরূপে নিমাই আত্মপ্রকাশ করেন। পাণ্ডিত্যের অহংকার দূরে নিক্ষেপ করে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে ঐক্য ও প্রেম আনবার জন্য হরিসংকীর্তন শুরু করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে অহোরাত্র কীর্তন চলতে থাকে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক নিত্যানন্দ ও হরিদাস। কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, নানা প্রতিকূল অবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করে তাঁর নগর সংকীর্তন নবদ্বীপধামকে ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা করে।

২৪ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছ থেকে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর নাম হয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"—সংক্ষেপে 'শ্রীচৈতন্য'। এরপর কিছুদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থেকে তিনি পদব্রজে পুরী যান, সেখান থেকেই প্রথমে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার শান্তিপুর, গৌর, রামকেলি। এই রামকেলিতে অবস্থানকালেই হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী 'সাকর মল্লিক' (সনাতন) ও 'দবীর খান' (রূপ) শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৃতীয়বার তিনি ঝাড়খণ্ড, কাশী, মথুরা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ঘুরে আসেন। তীর্থ ভ্রমণে তাঁর মোট ছয় বছর লেগেছিল। জীবনের শেষ আঠারো বছর শ্রীচৈতন্য পুরীধামেই ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বছর তিনি প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটান। প্রেমধর্মে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীতেই তাঁর তিরোভাব ঘটে। এই তিরোভাবের ব্যাপারটি আজও রহস্যপূর্ণ রয়েছে। তবে প্রচলিত ধারণা অনুসারে নানা মত পাওয়া যায়। (১) দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য

সমুদ্রের বুকে লীন হয়েছেন। (২) নগ্নপদে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নগর সংকীর্তনকালে পায়ে আঘাত পান, সেই আঘাতজনিত কারণে দেহান্ত ঘটে। তৃতীয় কারণ হিসাবে পুরীর পাণ্ডাদের ষড়যন্ত্রের কথাও অস্বীকার করা যায় না। তবু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ব্যাপারটি আজও রহস্যাবৃত আছে।

বাংলা সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

প্রাক্-চৈতন্যযুগের অন্ধকারময় যুগ ও তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত জাতীয়-জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চারের নানা উপায়— অনুবাদ শাখা ও মঙ্গলকাব্য ধারার আলোচনায় জানা গেছে। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পর তাঁর প্রাণপূর্ণ প্রেমসিদ্ধ আহ্বানে বাঙালি চিন্তা-চেতনার জগতে যে সাড়া জেগেছিল, তার ফলে সমাজজীবনে দেখা দেয় ভরা জোয়ার। বাংলার ম্রিয়মাণ মন্থর জীবনে জেগে ওঠে নূতন সুর ও ছন্দ, দেখা দেয় তীব্র গতি। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের বহুমুখী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্মার্ত হিন্দু সমাজের বৌদ্ধিক অহংকার ও বৃহত্তর সমাজ থেকে দূরত্ববোধ, দূর হয়। চৈতন্যদেবের ধর্মীয় উদারতা নিম্নমার্গের মানুষকে উৎসাহিত ও উদ্বেলিত করে। 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' একই মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্রের সীমানা ভেঙে পারস্পরিক বিশ্বাসের ও ঐক্যের ভিত তৈরি হয়।

অদ্বৈত আচার্য, রূপ ও সনাতন, রায় রামানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতগণ যেমন চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তেমনি রাজা প্রতাপ রুদ্র, পঞ্চকোটের হরিনারায়ণ রাজ, সপ্তগ্রামের ধণাঢ্য বণিক উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর অনুগামী হন। বাংলার সমাজে ধর্ম-সংস্কার প্রেম-ভক্তির পথ ধরে দ্রুত অগ্রসর হয়। ধর্মীয় জীবনে সংহতিবোধ দেখা দেয়। চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনে—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে।।"

এই দর্শনের আলোকেই এক সর্বধর্ম সমন্বয়ী ভাবনা উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়। কাজীর সংকীর্তন নিষেধের আদেশকে অমান্য করে চৈতন্যদেব অহিংস আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। সমাজজীবনকে কলুষমুক্ত করে পবিত্র আদর্শ, মানবমুখী জীবন-যাপনের পথ তিনিই দেখান। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে, এমনকী অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মানবতাবাদী দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করতে পদক্ষেপ নেন। প্রমাণস্বরূপ ভক্ত হরিদাসের কথা বলা যায়। তাঁর ধর্ম-আন্দোলনে ইসলামি ভাব-ভাবনা ও সুফি-সাধনরীতির কিছু কিছু সূত্রও মিশে যায়। অর্থাৎ ধর্ম সমন্বয়ের শক্ত ভিতের ওপর চৈতন্যদেব সমগ্র সমাজকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শোষণ-বঞ্চনা, ধর্মের নানা আচার-বিচার-ব্যভিচার থেকে মুক্ত, সমন্বয়ী, সুস্থ, আত্মশক্তিতে জাগ্রত, ভক্তিপ্লাবনে মুখরিত, মানব প্রেমের বার্তা তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'চৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি যুগের প্রতিনিধি—শুধু একটি যুগের প্রতিনিধি নন, সর্ব যুগের প্রেমভক্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।" মাত্র ৪৮ বছর জীবনকালে চৈতন্যদেব ধর্ম সম্প্রদায়, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বিশ্বইতিহাসে তা সুদুর্লভ।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যজগতে স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই জীবনী-সাহিত্য রচনার শুরু। বৈষ্ণব পদাবলিতে তাঁর প্রেমমগ্ন ভাবতন্ময় জীবনকেন্দ্রিক গৌরাঙ্গ পদ রচিত হ'লো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোয় মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য শাখায় শ্লথতা, স্থূলতা, অবিন্যস্ততা

ইত্যাদি বর্জন করে স্রষ্টাগণ রচনাভঙ্গি, প্রকাশরীতি ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন সংযম-শাসিত, পরিণত রসোত্তীর্ণ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভার। এক কথায় বাংলা সাহিত্য জগতে নব-প্রাণের সঞ্চার হয়।

"চৈতন্যযুগ"—পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত চিহ্নিত। এই সময়সীমায় চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার বুকে নব-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। দলবদ্ধভাবে একই সুরে, ছন্দে, নৃত্যে—অনন্ত প্রেমভাবনা ও মানবতাবাদের গভীরে ডুবে যাবার পথ দেখান চৈতন্যদেব। প্রেম, ভক্তি, করুণা, মৈত্রীর মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ববোধের চরম বিকাশের সাংস্কৃতিক পাথেয় জুগিয়েছেন চৈতন্যদেব। তাঁর সংস্কৃতি যথার্থই প্রগতিধর্মী, মানবতাবাদী, স্বচ্ছ সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

8.4 সারাংশ

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ—এই সীমিত সময়ের মধ্যে চৈতন্য জীবন বিধৃত থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিকূল সমাজে তাঁর প্রগতিবাদী মানবতাবাদী ভক্তি-প্লাবনধারা এনেছিল বিপ্লব। ধর্মাধর্ম জাত-পাতের প্রাচীর ভেঙে সমাজজীবনে তিনি নিয়ে আসেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বাদ। আদ্বিজ চণ্ডাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোয় নূতন পথ দেখতে পান। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ী ভাবনার প্লাবনে দেশকে ভাসিয়ে দেন। যার ফলে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমাজজীবনে গড়ে তোলেন নবসংস্কৃতি।

চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার পরিচয় ৫ ও ৬ সংখ্যক এককে দেওয়া হয়েছে। তবে এই দুই এককে চৈতন্যোত্তর যুগের কথাও আছে। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ছিল প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চৈতন্যযুগে—শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে—চরিত সাহিত্য গড়ে ওঠে, যা মানুষের জীবনরসাশ্রিত। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলিতে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদসংযোজন, ভাব-ভাষা, ছন্দের লালিত্য, ভাষা ব্যবহারে মাধুর্য ইত্যাদিও দেখা যায়। সমাজে সংহতি বোধের সৃষ্টি হয়। সমাজধর্ম—সংস্কারমুক্ত হয়ে সর্বজনীন মানবধর্মে রূপান্তরিত হয়। স্মার্ত-হিন্দু সমাজের বৌদ্ধিক অহংকার দূর হয়। সমগ্র বাঙালি সমাজ আত্মস্থ হয়ে নবপথের যাত্রী হয়। বহু রাজা-মহারাজা-বিদগ্ধ জ্ঞানী-গুণী চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলীতে সকলের সমাজ সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা সমাজ-সাহিত্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পবিত্র প্রাণমুক্তির বার্তাবহ শ্রীচৈতন্য শুধু সমকালের নয়, চিরকালের প্রেরণার মধ্যমণি।

8.5 অনুশীলনী 1

নীচের সমস্ত প্রশ্ন নির্দেশমত উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১৩ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হ'লো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

   (ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম বছর : 1. 1480 খ্রিস্টাব্দ
   2. 1510 খ্রিস্টাব্দ
   3. 1486 খ্রিস্টাব্দ

(খ) শ্রীচৈতন্যকে 'গোপালমন্ত্রে' দীক্ষাদাতা : 1. কেশব ভারতী
2. ঈশ্বরপুরী
3. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(গ) 'শ্রীচৈতন্যযুগের' সময়সীমা : 1. ত্রয়োদশ শতাব্দী—চতুর্দশ শতাব্দী
2. ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ
3. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত

(ঘ) চৈতন্যের নগর সংকীর্তনের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করেন 1. কাজী
2. নবাব
3. উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ

2. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে ________ খ্রিস্টাব্দে।
(খ) চৈতন্যদেবের পিতার ____ মাতার নাম _____।
(গ) চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন______ কাছ থেকে।
(ঘ) সাকর মল্লিক ও দবির খান হলেন_______ও______।
(ঙ) চৈতন্যদেবের ভাবদর্শনে মুসলমান________ আকৃষ্ট হন।

8.6 মূলপাঠ ঃ জীবনী সাহিত্য

চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু চৈতন্যযুগে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে চরিত-সাহিত্য রচিত হলো, তার মধ্যেই আমরা প্রথম দেখতে পেলাম—সাহিত্যের মূল বিষয় প্রত্যক্ষভাবে মানুষকেন্দ্রিক। চরিত-সাহিত্যে অলৌকিকতা কিছু থাকলেও মূলত এই শ্রেণীর সাহিত্য জীবনরসাশ্রিত। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণকে উপলক্ষ করে ভারতের নানা অংশের কিছু কিছু তথ্যও এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি নানা দিক থেকে বিশিষ্ট সম্পদ। শুধু তাই নয় বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাতও এখান থেকে। সাধারণভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের রাজা-মহারাজাদের কীর্তি-কাহিনী প্রচারের জন্য সভাকবি বা অনুগৃহীত লেখকগণ সংস্কৃত ভাষায় কিছু জীবনী সাহিত্য রচনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাক্‌পতিরাজের, 'গৌড়বহ', কবি বিহ্লনের 'বিক্রমদেব চরিত', রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে চৈতন্যদেব রাজা-মহারাজা নন, রাজ্য জয়ের কোনো কীর্তিও স্থাপন করেননি, শুধু প্রেমভক্তি যার একমাত্র সম্বল— সেই প্রেমাবতারকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে গড়ে ওঠে জীবনকাব্য রচনার মহামূল্য এক অধ্যায়। এইসব চরিত কথামৃতে চৈতন্যের জীবন কথা ও বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের নানা অমূল্য তত্ত্ব-তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের জীবনকালেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে তাঁর জীবনী রচিত হতে

থাকে। এইসব গ্রন্থাদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চরিত সাহিত্য' নামে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করে। চৈতন্যদেব সচেষ্টভাবে কোনো ধর্ম বা কোনো মত প্রচার করেননি—এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় এবং গৌড় ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দ। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ধর্ম আন্দোলন সমকালকে মুগ্ধ করে এবং ভবিষ্যৎকালকেও গতিদান করে। চৈতন্যদেবের আলোচ্য দুটি দিকই চরিত সাহিত্যরচনার প্রেরণা-উদ্দীপকের উৎস হলেও চরিতকাব্য রচয়িতারা সকলেই সচেতনভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবানের পৃথিবীতে আবির্ভাব বলে বিশ্বাস করতেন।—মূলত চরিত কাব্যের মূল ভিত্তিভূমিতে ধর্মীয় প্রেরণা থাকলেও মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-মানুষ চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের অভিব্যঞ্জনাও রয়েছে। ধর্মগত প্রেরণা মুখ্য হলেও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে চরিত শাখাটি অভিনব ও অদ্বিতীয়। নীচে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় যাঁরা চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী-সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের কবি পরিচিতিসহ কাব্য পরিচিতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো। এর দ্বারা বাংলা জীবনী-সাহিত্যের গোড়াপত্তনের দিকটি জানা যাবে এবং এই সাহিত্য-শাখার তত্ত্ব-তথ্যাদি ও সাহিত্যিক গুণাগুণের নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে।

বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবনী রচিত হবার পূর্বে কয়েকজন বাঙালি কবি সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের জীবনী লিখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হ'লো।

১. **মুরারি গুপ্ত ঃ** চৈতন্যদেবের সহপাঠী এবং পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত ও অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। মহাকাব্যের রীতিতে মুরারী গুপ্তের রচনা এই জীবনী গ্রন্থখানি—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই গ্রন্থখানি সুপরিচিত। একে চৈতন্য জীবনের আদি গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করা যায়। গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশকে রচিত (১৫৩৩-১৫৪২-এর মধ্যে)। রচনারীতি—সরল। উপস্থাপনা—অন্তরঙ্গ, লেখক চৈতন্য জীবনের মুখ্য তথ্য অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন।

২. **পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপুর :** চৈতন্যদেবের অনুচর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ সেন। কবিত্ব শক্তির জন্য পরমানন্দ ছেলেবেলাতেই মহাপ্রভুর স্নেহধন্য হন। চৈতন্যদেব আদর করে তার নাম দিয়েছিলেন 'কবি কর্ণপুর'। দু'হাজার শ্লোকযুক্ত কবির 'চৈতন্য চরিতামৃতম্'—সংস্কৃত ভাষায় জীবনী মহাকাব্য নামে খ্যাত। অল্প বয়সে লেখা এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও কাব্যগুণ তেমন নেই। এছাড়া তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে দশ অঙ্ক সমন্বিত একখানি নাটকে চৈতন্য জীবনের প্রায় সব ঘটনাই তুলে ধরেছেন। ভক্তি তত্ত্বের প্রাধান্যে নাট্যগুণ খর্ব হয়েছে। কবির তৃতীয় গ্রন্থের নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থখানি মূল্যবান।

আলোচ্য দু'জন কবি ছাড়া কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে এক চৈতন্যভক্ত ১৪৩টি শ্লোকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' নামে একখানি চৈতন্য স্তোত্র কাব্য রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য জীবনী কাব্য ও নাটকগুলি বাঙালি সমাজের সীমানা ছাড়িয়ে অবাঙালি সমাজেও চৈতন্যমহিমা ছড়িয়ে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিবর্গের রচনা হিসাবে অনেক সৃষ্টিই চৈতন্য জীবনের তথ্যগত দিকগুলি সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যের জীবনী মূল্যায়নে এর গুরুত্ব রয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবন চরিতগুলি আলোচনা করলেই বাংলা চরিত সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিটি কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানতে পারা যাবে। বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল',

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়', ইত্যাদি চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীকাব্য আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এঁদের রচিত জীবন-কাব্যগুলি একে একে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হ'লো।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ঃ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন পরম বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবন দাস। তাঁর কাব্যখানি সুপরিচিত ও কাব্যগুণ সমন্বিত। বাংলাদেশের সমাজজীবনে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী, তত্ত্ব-তথ্য প্রচারিত হয়েছে—তার সিংহভাগই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে পাওয়া। কবি নিত্যানন্দের অনুগামী ছিলেন—তিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত যে তথ্যাদি পেয়েছিলেন, তাকে অভ্রান্ত মনে করে তথ্যনিষ্ঠভাবে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। কাব্যে কবি নিজের পরিচিতি তেমন কিছু দেননি—একমাত্র ব্যক্তি পরিচিতির তথ্য হিসাবে পাওয়া যায়— যে কবি চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণীর পুত্র। পণ্ডিতগণের অনুমান ১৫১৯ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম। নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে— দেনুর গ্রামে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বৈষ্ণব সমাজে কবি তাঁর গ্রন্থখানির জন্যই 'চৈতন্যলীলার ব্যাস'—বলে সম্মানিত হয়েছে। প্রথমে কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখলেও মায়ের অনুরোধে নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন। এর মূলে ছিল লোচন দাস (ত্রিলোচন দাস)-এর 'চৈতন্যমঙ্গ ল' নামাঙ্কিত কাব্যখানি। ভাগবতের রচনাকাল সম্পর্কে নানা মত আছে— সেগুলি হ'লো—১৫৩৩ খ্রিঃ, ১৫৪৮ খ্রিঃ, ১৫৭৪ খ্রিঃ। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে গ্রন্থখানি শেষ হয় ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের পর। কাব্যখানি তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত। আদি খণ্ড চৈতন্য জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত পনেরোটি অধ্যায়ে রচিত। মধ্যখণ্ড—চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে ছাব্বিশটি অধ্যায়ে; এবং অন্ত্যখণ্ডে—শ্রীচৈতন্যের নীলাচলগমন এবং পুরী অবস্থানকালের চৈতন্য জীবনের কিছু কিছু ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে দশ অধ্যায়ে।

বৃন্দাবন দাসের তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থখানিতে মাঝে মাঝে অলৌকিক প্রসঙ্গ থাকলেও গ্রন্থের মূল মানবিকবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সমকালীন যুগচিত্রটি স্বল্পকথায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন নবদ্বীপের বর্ণনায় কবির পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠভাবে কবি চৈতন্যদেবের ব্যক্তিমহিমার মূল ভাবটি পরিস্ফুট করেছেন। চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার বর্ণনায় কবি বাস্তবতা, সরলতা ও লোকচরিত্র জ্ঞানের সার্থক পরিচয় দান করেছেন। অন্য কোনো কবির হাতে এমন রূপটি ফুটে ওঠেনি। কৌতুকরসাশ্রিত আদি খণ্ডটি, বিশেষ করে চৈতন্যের বাল্যকৈশোরের বর্ণনা রমণীয় হয়ে উঠেছে। মধ্যখণ্ডে—নিমাইয়ের সন্ন্যাস যাত্রাটি অলঙ্কারবর্জিত বর্ণনায় করুণরসও ঘনীভূত রূপ নিয়েছে। অন্ত্যখণ্ডটি যেভাবে হঠাৎ শেষ হয়েছে, তাতে কাব্যের অঙ্গহানি অনেকটা ঘটেছে। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র দ্বারা কবি অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"শ্রীচৈতন্য ভাগবত মহাপুরুষের ভাগবত জীবনালেখা হয়নি, কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' ঃ লোচন দাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী। তিনি শ্রীখণ্ডের অন্যতম বৈষ্ণবগুরু 'গৌরনাগর' মতের প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। কাব্য মধ্যে বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ থাকাতে স্পষ্ট বোঝা যায় লোচন দাসের কাব্য বৃন্দাবন দাসের পরে লিখিত।

কাব্য পরিচিতি ঃ লোচন দাসের কাব্যখানি মঙ্গলজাতীয় রচনা এবং পাঁচালীর ঢঙে সুরতাল সহযোগে গান

করার উদ্দেশ্যে রচিত। কাব্য মধ্যে প্রচুর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব সমাজে ও পদাবলী সাহিত্যে কবি সুপরিচিত। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র আদর্শে লোচন দাস কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর কাব্যেই একমাত্র শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ—তাঁর গৃহত্যাগে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ অংশটি করুণ রসে ভরা। এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হোল :

নিমাই-এর সন্ন্যাস-সংবাদে শোকবিহ্বল বিষ্ণুপ্রিয়া—

চরণ কমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারিয়ে কাতর নয়ানে।
হিয়ার উপরে খুইয়া বাঁধে ভুজলতা দিয়া
প্রিয় প্রাণ নাথের চরণে।।

এবং শচীমাতা কান্নায় ভেঙে পরে বলেন,

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও।।

—শোক বিধুরা শচীদেবী এখানে যেন চিরন্তন মায়ের প্রতীক। তিনিই একমাত্র শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব প্রসঙ্গে জগন্নাথ-দেহে লীন হবার কথা উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

লোচনের গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান জনশ্রুতিনির্ভর। বৃন্দাবন দাসের মতো তিনি তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন না—তবে 'চৈতন্যমঙ্গলে' লোচন দাসের কবি প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ঃ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যখানি বৃন্দাবন দাসের পরে লেখা। গবেষকদের ধারণা এটি ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ের রচনা। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সমাজে এর প্রভাব বা প্রচলন ব্যাপক ছিল না।

কবি পরিচিতি ঃ বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে রোদমা দেবীর গর্ভে কবির জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র পরম চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। জানা যায়, পুরী থেকে ফেরার পথে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়িতে কয়েকদিন কাটান—যদিও কবি তখন শিশুমাত্র। বাল্যকালে কবির নাম ছিল 'গুইয়া', চৈতন্যদেবই নাম পাল্টিয়ে রাখেন—'জয়ানন্দ'।

কাব্য-পরিচিতি ঃ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যখানিও লোচন দাসের কাব্যের মতই পাঁচালীরূপে গীত হতো। কবির রচনায় কবিত্বের অভাব থাকলেও, পালাগানের ধরনেই গ্রন্থখানির বিশিষ্টতা। অন্যান্য চৈতন্য-জীবনচরিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধানের ব্যাপারটি অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকলেও জয়ানন্দের গ্রন্থ থেকে জানা যায়—জগন্নাথের রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে পায়ে ইটের টুকরো ঢুকে যায়—তা থেকে ক্ষত সৃষ্টি—পরিণামে 'দেহান্ত'। অবশ্য বৈষ্ণব-সমাজ কবির এই বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি।

৯টি খণ্ডে কাব্যখানি সমাপ্ত। মূলত গানের রীতিতে—জনসাধারণের জন্যই লিখিত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক নানা তথ্যের মিশ্রণে কাব্য রচিত। গ্রন্থখানিতে চটকদার কিছু কিছু বর্ণনা থাকলেও তাতে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে জনশ্রুতির আধা-সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'চৈতন্য চরিতামৃত' ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানি শুধু মধ্যযুগের নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই স্মরণীয় জীবনীকাব্য। চৈতন্য জীবনীগ্রন্থাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কাব্য প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান ভক্তিভাব-সমন্বিত কাব্য। কবি রূপ-সনাতন, দাস রঘুনাথ, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী এই 'ষট্ গোস্বামী' বা ছয় গোস্বামীর নির্দেশেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব, জীবনী, ভক্তিভাব ও ভাবনার স্বরূপ ও তটস্থ বিচার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন নিগূঢ় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহাগ্রন্থখানির প্রতিটি ছত্র বৈষ্ণব সমাজে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

কবি পরিচিতি ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ অকৃতদার ছিলেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুর গ্রামে কবির জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়, তারপর নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে বৈষ্ণব আচার্যদের সাহায্যে কবি সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনের আচার্য ও গুরুদের আদেশেই তিনি চৈতন্যদেবের অন্ত্যখণ্ড বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে উদ্যোগী হন। বৃন্দাবন দাসকে কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এইজন্য তাঁর খ্যাতি যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে চৈতন্যদেবের অন্ত্যখণ্ডটিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে।

কাব্য বিচার ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থখানিতেই চৈতন্য জীবনের সমগ্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। বিরাট গ্রন্থটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ডে সতেরোটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশের প্রথমে বৈষ্ণব দর্শনের নানাদিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবার পর, সংক্ষেপে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের নানা কথা প্রকাশ পেয়েছে। বৃন্দাবন দাস এই অংশটি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন বলে কবি এই অংশটি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। মধ্যখণ্ডটি পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। বৃন্দাবন ভ্রমণ ও সেখান থেকে নীলাচলে ফিরে আসা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত নানা ঘটনা ও চৈতন্যের জীবন-কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ। জীবনের শেষ সতেরো-আঠারো বছরের ভাব-লীলা স্থান পেয়েছে অন্ত্য খণ্ডে। এই খণ্ডটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমোন্মাদ চৈতন্যদেবের জীবনচর্চা কবি ভক্তিভরে বর্ণনা করেছেন। অন্তরধর্মে ভাবুক ও অসীম কবিত্ব শক্তির অধিকারী কৃষ্ণদাস ভক্তি-সুবাসিত হৃদয়ে চৈতন্য লীলামৃত প্রকাশ করেছেন। ৩২টি পরিচ্ছেদে খণ্ডটি সমাপ্ত। বৃদ্ধ বয়সে অতি কঠোর পরিশ্রম করে কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থ শেষ করেন। কাব্যের ভাষায় বৃন্দাবনী ছাপ পড়লেও পাণ্ডিত্যের অভাব কোথাও নেই। গ্রন্থকারের বৈষ্ণব জনোচিত বিনয় উল্লেখযোগ্য—

> "চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে
> তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে।।"

গ্রন্থটিতে মূলত প্রেম ও ভক্তিবাদের দর্শন ব্যাখ্যা হয়েছে। সে যুগে বাংলা ভাষায় দুরূহ তত্ত্বের প্রাঞ্জল প্রকাশ সত্যই বিস্ময়কর। উপমা অলংকারাদিও সার্থক, যেমন,

> "অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
> তৈছে জীবন গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ সম্পর্কে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন,—"কৃষ্ণদাস কবিরাজের বই শুধু চরিতকাব্যই নয়, বৈষ্ণব তত্ত্বকোষ বিশেষ।" দার্শনিকের মন নিয়ে কৃষ্ণদাস তত্ত্ব আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়ে কাব্যখানি লিখেছেন। তবে এই দর্শনের আলোচনাও তিনি করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। চৈতন্য জীবনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমতো তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণববদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের নানা দিক আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া

তাঁর কাব্যে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব সহজভাবে বিচার করেছেন। বাংলা জীবনীকাব্য হিসাবে এ গ্রন্থ তুলনা রহিত। তত্ত্বনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের উৎসরূপে গ্রন্থটি সু-চিহ্নিত।

আলোচ্য কবিগণ ছাড়াও চূড়ামণি দাসের লেখা 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি চৈতন্য জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে। কবি নিত্যানন্দের জনৈক অনুচরের শিষ্য, চৈতন্য তিরোধানের পর এটি লিখিত। কবির খণ্ডিত যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে কবি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়।

চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ ছাড়া অদ্বৈত জীবনীগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থের তথ্যমূলক মূল্য ছাড়া সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই বলে বাংলা সাহিত্যের জীবনীগ্রন্থ শাখায় গুরুত্বহীন।

8.7 সারাংশ

প্রাচীনকালে রাজ-রাজড়াদের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে তাঁদের জীবনী নিয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় জীবনীগ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সমগ্র জাতির জীবনে যে ভক্তি-ভাবের আন্দোলন সৃষ্টি হয় তা স্মরণীয়। এই মহামানবের জীবিতকালেই তাঁর জীবনী নানা তত্ত্ব-তথ্যে সমৃদ্ধ করে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত হয়। চৈতন্যজীবনী কেন্দ্র করেই 'চরিত সাহিত্য' শাখার উদ্বোধন ঘটে বাংলা সাহিত্যে। জীবনের রেখাচিত্ররূপে সংস্কৃত ভাষায় যে জীবনী-গ্রন্থগুলি লেখা হয় তার নাম ও গ্রন্থকারদের নাম নিম্নে বর্ণিত হ'লো।

(ক) মুরারি গুপ্তের—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ বা মুরারি গুপ্তের কড়চা।

(খ) কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ রচিত—'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' ও 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'।

(গ) স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

(ঘ) প্রবোধানন্দের—'চৈতন্য চরিতামৃত'।

বৈষ্ণব ভক্তগণ ভক্তির আলোকে শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য লিখেছেন। বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিবৃন্দ হলেন—বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' প্রথম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থরূপে চিহ্নিত। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' বৈষ্ণব তত্ত্ব-তথ্য সমৃদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। কবির অন্ত্য খণ্ডটি মূল্যবান। লোচনদাস ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য দু'খানি চৈতন্য জীবনীকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের আদি-মধ্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ দান করে অন্ত্যলীলাটি অতি সংক্ষেপে লেখার ফলে যে অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যের অন্ত্যলীলাটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সে অভাব পূর্ণ করেছেন। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে চৈতন্যদেবের সামগ্রিক জীবন কাহিনীর তত্ত্ব-তথ্য সমৃদ্ধপূর্ণ রূপটি আস্বাদিত হবে। আলোচ্য চার জন কবি ছাড়া চূড়ামণি দাসের চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ ও অন্যান্য জীবনী গ্রন্থকাররূপে হরিচরণ দাস, ঈশান নাগর, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখের নাম মাত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের গ্রন্থাদির কাব্যমূল্য তেমন নেই।

8.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলি নির্দেশমত উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১৩ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত স্থানে লিখুন।

গ্রন্থ		রচয়িতা
(ক) চৈতন্য চরিতামৃত	—	লোচন দাস
(খ) চৈতন্যমঙ্গল		বৃন্দাবন দাস
(গ) চৈতন্য ভাগবত	—	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
(ঘ) অদ্বৈতমঙ্গল		নিত্যানন্দ দাস
(ঙ) প্রেমবিলাস	—	হরিচরণ দাস
(চ) চৈতন্যচন্দ্রোদয়	—	পরমানন্দ সেন

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	
(ঙ)	
(চ)	

2. নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' কাব্যের ভাষা :
1. সংস্কৃত
2. প্রাকৃত
3. পালি

(খ) বৃন্দাবন দাসের কাব্যের বিন্যাস :
1. 2 খণ্ডে
2. 4 খণ্ডে
3. 3 খণ্ডে

(গ) চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো :
1. চৈতন্য ভাগবত
2. চৈতন্য চরিতামৃত
3. চৈতন্য মঙ্গল

(ঘ) লোচন দাসের কাব্যের রীতি হ'লো :
1. যাত্রা
2. পাঁচালী
3. নাট্য

(ঙ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনাকাল :
1. পঞ্চদশ শতাব্দী
2. ষোড়শ শতাব্দী
3. সপ্তদশ শতাব্দী

3. শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

(ক) বাণভট্ট রচনা______করেন।

(খ) রাম পালের সভাকবি______রামচরিত লিখেছেন।

(গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে_______তত্ত্বের নানা দিক আলোচিত হয়েছে।

(ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্ত্য খণ্ডে_______ পরিচ্ছেদ আছে।

(ঙ) লোচন দাস_______ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

(চ) চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক আদি চরিত্র গ্রন্থ_______।

8.9 মূলপাঠ ঃ বৈষ্ণব পদসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের একক 4-এ প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-পদাবলি সাহিত্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পরই এই এককে চণ্ডীদাস সমস্যা ও পদাবলি সাহিত্যে কবি চণ্ডীদাস ও 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির কবি-পরিচিতি ও কবিকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ঐ একক পাঠ করে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা জন্মে থাকবে তাকে পটভূমিকা হিসাবে রেখে, চৈতন্যযুগে যে সব পদকর্তা বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন—এই এককে তাঁদের পরিচিতি ও কবি-কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনায় প্রাক্-চৈতন্যযুগের সঙ্গে চৈতন্যযুগের কবিদের মৌলিক পার্থক্যের নানা দিক জানতে পারা যাবে।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকে নিয়ে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' থেকে শুরু করে সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় যে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তার পথ ধরেই সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চৈতন্যোত্তরযুগের কবিগণ পদরচনা করলেও নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বাসকে সহজে মেলাতে পারেননি চৈতন্যপূর্ব কবিদ্বয়ের সঙ্গে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার ভাবনার উৎস কোনো ধর্মীয় দর্শন নয়, সমাজজীবনের নর-নারীর প্রেমভিত্তিক রচনা প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য। তবে, বিদ্যাপতির পদগুলি সচেতন শিল্পীর অলঙ্কার-সজ্জিত, যৌবনাবেগে প্লাবিত; পদগুলি মানবিক প্রণয় কবিতার রূপেই বাঙালি লেখক ও পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দ দাসের হাতে তা আরও সমৃদ্ধ হয়। রোমান্টিক ভাবতন্ময় কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব পরবর্তীকালে বহু পদকর্তার মধ্যে দেখা যায়। চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস এ ব্যাপারে সার্থক কবি। এই এককে চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকর্তাদের পদসমূহের সঙ্গে এই এককের কবিদের সৃষ্টিসম্ভারের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হবে।

চৈতন্যসমকালে ও পরে বৈষ্ণবপদ রচনার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ লক্ষ্য করা যায়। তবে চৈতন্যোত্তর যুগেই এর স্বর্ণফসল ফলেছে। চৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বাদির প্রভাব তেমন দেখা যায়নি যা চৈতন্যোত্তরকালে গভীর ও ব্যাপকরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান এবং রাধিকা তাঁর হ্লাদিনী শক্তির সার—এই ধর্মীয় ভাবনা জাত চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলি। তবে এই ভাব-বিশ্বাসের মূল তত্ত্বটির শৈল্পিক চেতনার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলেই এ যুগের পদগুলি এতো সমৃদ্ধ। এ যুগের বেশীর

ভাগ পদই কান্তাপ্রেম আশ্রয়ী মধুর রসে স্নাত। এই পর্যায়ের বৈষ্ণব কবিগণকে দু'টি স্তরে ভাগ করে নীচে আলোচনা করা হ'লো।

(ক) চৈতন্যসমকালীন কবি ঃ চৈতন্যদেবের বহু ভক্ত বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন এ সময়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গবিষয় পদ রচিত হয় চৈতন্যসমকালে। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব দর্শন তেমন প্রাধান্য পায়নি। তবে প্রেমে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব গভীররূপেই পড়েছে।

(১) মুরারি গুপ্ত ঃ চৈতন্য জীবনীকার মুরারি গুপ্তের হাতে রাধাপ্রেমের কবিতাও প্রকাশ পেয়েছে চৈতন্যদেবের অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তই প্রথম পদাবলি রচনা করেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তিনি সাত-আটটার বেশি গান (পদাবলি) লিখেছেন বলে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। তাঁর রচিত পদগুলির মধ্যে—

'স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসিয়েছি।
কি করিবে কুলের কুকুরে।।'

পদাংশে প্রেমবিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের প্রকাশ ঘটেছে। আর একটি হৃদয়স্পর্শী গানে বিরহিণীর গভীর মর্ম যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণলীলা ও গৌরীলীলার পদগুলিতে কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

(২) নরহরি সরকার ঃ চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে কবির জন্ম। তিনি পঁচিশটির মতো পদ রচনা করেন। তবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনাতেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরাঙ্গকে নাগর এবং নিজের নাগরীরূপে কল্পনা করেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি পদ রচনা করেছেন। ভাষা সহজ সরল। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে ছিটেফোঁটা আদিরসও আছে। উচ্চাঙ্গের কবিগুণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

(৩) বাসুদেব ঘোষ ঃ বাসুদেব ঘোষও নরহরি সরকারের মতো 'গৌর নাগরী' ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি সার্থক হয়েছে। নিমাইসন্ন্যাসের পদগুলি ভাষার সারল্যে ও করুণ রসের ছোঁয়ায় হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। চৈতন্য সমকালীন অন্যান্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন শিবানন্দ সেন, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং সামান্য কিছু পদ রচনা করেন। তবে, তিন জন ঘোষ ভ্রাতার মধ্যে বাসুদেব ঘোষই বৈষ্ণব সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতি লাভ করেন। এই সব কবি ছাড়া যদুনন্দন, গোবিন্দ আচার্য, বাসুদেব দত্ত প্রমুখ চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা সামান্য কিছু পদ রচনা করলেও কবিত্বের দিক থেকে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য কবিগণের আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

(খ) চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী ঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের আমরা দেখতে পাই। এই সময়সীমায় বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ পদকর্তারা বৈষ্ণব পদাবলিকে এক সমৃদ্ধ স্তরে নিয়ে গেছেন। কলিযুগে কৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেবকে জ্যোতির্ময় ভাগবত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোয় আলোচ্য কবিগণ নতুন ভাবরসে মগ্ন হয়ে যে সব পদ উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে কাব্য সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বলতে গেলে এঁরাই বৈষ্ণবপদাবলির ঐশ্বর্যযুগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। নীচে আলোচ্য কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'লো।

(১) বলরাম দাস ঃ বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে একাধিক বলরামের উল্লেখ থাকলেও প্রাচীনতর বলরাম দাসই আমাদের অলোচ্য। কবি কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

কবির ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে ১৩৬টি এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে ১৭৬টি পদ পাওয়া যায়। কবির বাৎসল্যলীলার পদগুলি অতুলনীয়। রাধা-প্রেমের সকল বৈচিত্র্য নিয়েই তিনি পদ লিখেছেন। বলরাম দাসের কিছু কিছু পদ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল।

'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির।'

—এই দুটি চরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লক্ষণীয়। বাৎসল্য রসের পদগুলিতে মা যশোদার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টির সঙ্গে শিশু গোপালের চুরি করে ননী খাওয়ার চিত্র কবি কোমল মধুর রূপে এঁকেছেন। কবির রচনারীতিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত শব্দের মালা গেঁথে কবি বহু পদকে সৌন্দর্যদান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধার রূপানুরাগের পদাংশ তুলে ধরা হ'লো—

"কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালা রূপখানি।।"

২. **জ্ঞানদাস ঃ** চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তবে কবির কাব্য-প্রতিভার সার্থক স্ফূরণ ঘটেছে বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিতে।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের ভক্ত এবং নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কাছে 'কাঁদড়া' গ্রামে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত 'খেতুরী উৎসবে' কবি উপস্থিত ছিলেন।

জ্ঞানদাস ভাবের কবি, হৃদয়ধর্মের কবি। পূর্বরাগ, অনুরাগ পর্যায়ে কবির অনন্ত প্রেমের কড়িধরা স্বপ্নমুহূর্তে সাক্ষাৎ দর্শনে আত্মাবিহ্বলা রাধিকার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।।"

রূপানুরাগ আক্ষেপানুরাগের পদসমূহেও কবি রাধার অন্তরের আর্তি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। এই আর্তি প্রকাশে জ্ঞানদাস তাঁর কল্পনার রাধার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছেন। এইজন্য রাধার হৃদয় বেদনায় কবিহৃদয় বেদনরসে স্নাত হয়েছে। চণ্ডীদাসের মতোই প্রেমবোধের জগৎ উদঘাটনে জ্ঞানদাস গভীর ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের মতোই সারল্য ও আন্তরিকতা জ্ঞানদাসের পদগুলির পরতে-পরতে আছে। কবির লেখনীতে কৃষ্ণরূপের বর্ণনায় রাধার অনুভূতিই যেন ভাষারূপ পেয়েছে।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।"

এই দুই চরণ রবীন্দ্রভাবনাকেও আপ্লুত করেছিল। রূপের সরোবরে আঁখি ডুবে যাওয়া ও যৌবনের বনে পথ হারিয়ে যাওয়া—ছবি হিসেবে অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে ভরা বলেই এই চিত্ররূপের মধ্যে জ্ঞানদাসের ভাব ব্যাকুলতা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রূপকল্প সৃষ্টিতে কবিকৃতির স্বাক্ষর তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের পদেই পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ রচনার ক্ষেত্রে কবি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। তবে এই পদগুলি তেমন সার্থক হয়নি। কিন্তু চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করে জ্ঞানদাস বাংলা ভাষায় যে পদগুলি রচনা করেছেন সেইসব পদেই কবির প্রতিভা ও কবিকৃতি অনেকটা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রসগত বিচারে উভয় কবির মধ্যে গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলির সাহিত্যে জ্ঞানদাস 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য'

রূপেই পরিচিত। এই পরিচিতি অনেকাংশেই সাথক। কিন্তু জ্ঞানদাস রূপশিল্পী, ভাবশিল্পী; অন্যদিকে চণ্ডীদাস সাধক মরমিয়া কবি। জ্ঞানদাসের নিজের বিরহ পদটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

জ্ঞানদাসের রচনায় গভীর অকৃত্রিম ভাব আছে। কবি ভাব ও ভাবের প্রকাশরীতির মধ্যে সার্থক সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুযায়ী পদ রচনা করলেও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সচেতন কবি যে ভাব, ভাষা ও চিতকল্পের মধ্য দিয়ে ভাবপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন তা অধুনিক মনকেও স্পর্শ করে।

(৩) গোবিন্দদাস ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক, পরম বৈষ্ণব চিরঞ্জীব সেন ছিলেন গোবিন্দদাসের পিতা। মাতামহ দামোদর সেন ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সংগীত সাধক ও শাক্তমতে বিশ্বাসী। বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই বিপরীত বিশ্বাস ও সাধনধারার উত্তরাধিকারী গোবিন্দদাস। ষোড়শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে কবির জন্ম। প্রথম জীবনে শাক্তমতে বিশ্বাসী এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বহু পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে কবি মঞ্জরী ভাব-সাধনার অংশীদার অর্থাৎ সখীর সাহায্যকারিণী। 'প্রার্থনা'র পদে এই রূপটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে কবির ২৯৭টি পদ আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বজন স্বীকৃত কবি গোবিন্দদাস।

কবি-কৃতি ঃ ভাষার দিক থেকে গোবিন্দদাস 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য' এবং বাংলা সাহিত্যে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপে পরিচিত। শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন।

ছন্দের ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের প্রয়োগে, শব্দবিন্যাসের লালিত্যে গোবিন্দদাসের তুলনা নেই। আপন মনের ভক্তি ও কবিত্বশক্তির দ্বারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ।

কবির, "নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।" পদটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর 'অভিসার' পর্যায়ের পদগুলি। মেঘমেদুর বর্ষণক্লান্ত বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে অভিসারিকা রাধা কবির লেখনীতে অনন্যরূপ পেয়েছে। বর্ষাভিসারে কবি শ্রেষ্ঠ। 'ঘন ঘন ঝন ঝন বরজ নিপাত' মুহূর্তে দুঃসাহসিক রাধিকা প্রাণ তুচ্ছ করে প্রিয় মিলনের জন্য সংকেতস্থানে গমনের যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে, তা অতুলনীয়। কবি মুলত চিত্ররসের কবি। এই চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে কবি সংগীতের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর চিত্র বস্তুধর্মী, ভাবধর্মী নয়। প্রসাধনকলার দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়াতে ভাবগভীরতা তেমন দেখা যায় না।

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।****" পদটি গোবিন্দদাসের অভিসারের অন্যতম পদ। রাধিকার প্রিয়মিলনের এই প্রস্তুতিচিত্রে গভীর আর্তির সঙ্গে মিশে গেছে হৃদয়ের প্রত্যাশামুখী মিলন উল্লাস। এর সঙ্গে যুক্ত আছে অনন্ত প্রেমের পিপাসা যা, বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে তেমনভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় না। উত্তর-চৈতন্য যুগের অন্যান্য কবির লেখনীতে গোবিন্দদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে রয়েছেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী,

রায়শেখর (কবিশেখর) লোচনদাস, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, হরিবল্লভ প্রমুখ কবি। এঁদের মধ্যে অন্যতম পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর)। কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। প্রকৃত চিত্র রচনার পাশাপাশি, শব্দ ঝঙ্কারের প্রতি কবির বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মাথুর পর্যায়ের একটি অনবদ্য পদ—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

এখানে শব্দ ঝঙ্কার যেমন আছে, তেমন চিত্রও ধ্বনি অনুগামী হয়েছে।

লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে 'গৌরনাগরী' ভাবের অনুসরণ আছে। ইনি ছন্দ ব্যবহারে শ্বাসাঘাতযুক্ত ছড়ার ধরনের ত্রিপদী ছন্দ যা 'ধামালি' নামে পরিচিত, ব্যবহারে আকর্ষণ বোধ করতেন। ফলে পদগুলিতে লঘু চটুলতা প্রকাশ পেত যেমন,

"বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
কোন্ বিনোদিনী গাঁথিলে মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে।"

এ ছাড়া অন্যান্য কবি পদ রচনায় তেমন সাফল্য লাভ করেননি।

8.10 সারাংশ

প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে ভক্তিরসের যে বন্যা প্রবাহিত হয়, তার প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পঞ্চরসের ধারায় স্নাত বৈষ্ণবপদাবলির মূল রস—মধুর রস। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমই প্রধান সুর। মধুর রসের আলিঙ্গনে এই প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে পদাবলি সাহিত্যে। এই সৃষ্টি সম্ভার একাধারে গান ও বৈষ্ণব সাধন-ভজনের দর্শন। তবে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণের হাতে গৌরাঙ্গবিষয়ক ও বাৎসল্য রসের পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে নব সংযোজন।

চৈতন্য সমকালের কবি মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব ঘোষ উল্লেখযোগ্য কবি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার পদগুলিতে মুরারি গুপ্তের কবিত্বের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় এবং সহজ সরল ভাষায় রচিত বাসুদেব ঘোষের পদগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বৃন্দাবনদাসের নাম স্মরণীয়। এঁদের সঙ্গে বলরামদাসের নামও যুক্ত করতে হয়। প্রচলিত শব্দের দ্বারা তিনি বহু পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলি অনবদ্য।

নিত্যানন্দের ভক্ত ও তাঁর স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষায় পদ রচনা করলেও বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন ভাবের কবি, হৃদয়ের কবি। চিত্ররূপকল্পতায় কবির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। তাঁর 'মাথুর' অর্থাৎ বিরহ পর্যায়ের পদগুলি হৃদয়স্পর্শী। ভাব ও ভাবের প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে কবি সার্থকভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

বৈষ্ণব ও শাক্ত—দুই বিপরীত বিশ্বাস ও সাধনার ধারা কবি গোবিন্দদাস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের যথাযথ সজ্জায় সজ্জিত কবির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি হৃদয়ে অনুরণন জাগায়। ভাষা ও রীতির দিক থেকেই গোবিন্দদাস 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য'। বাংলা সাহিত্যে কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। 'অভিসার' পর্যায়ের পদগুলি কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চৈতন্যোত্তর যুগের বহু বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের ভাব-ভাবনা ও প্রকাশরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই পর্যায়ের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিতার স্রষ্টা হলেন লোচনদাস, রায়শেখর, শ্যামদাস, কবিরাজ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী হরিবল্লভ; এঁদের মধ্যে অন্যতম পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর)। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। প্রকৃতিচিত্র কবির হাতে জীবন্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি শব্দঝঙ্কার সৃষ্টিতেও কবি সার্থক। লোচনদাস একাধারে চৈতন্য-জীবনী রচয়িতা ও পদকর্তা। তাঁর পদে লঘু চটুলতার পরিচয় আছে।

8.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর লেখা হয়ে গেলে 113 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচে প্রশ্নগুলির তিনটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে পর পর। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) জ্ঞানদাস ভাবশিষ্য ছিলেন— : 1. বিদ্যাপতির
2. চণ্ডীদাসের
3. লোচনদাসের

(খ) গোবিন্দদাসের কাব্য-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে— : 1. প্রাক্-চৈতন্য যুগে
2. চৈতন্য সমকালে
3. চৈতন্য পরবর্তীকালে

(গ) বলরামদাসের শ্রেষ্ঠ পদ হ'লো— : 1. মধুর রসের
2. বাৎসল্য রসের
3. শান্ত রসের

(ঘ) গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি রচিত হয়েছে— : 1. ব্রজবুলি ভাষায়
2. প্রাকৃত ভাষায়
3. বাংলা ভাষায়

2. শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ করুন।

(ক) 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদটির রচয়িতা ———।

(খ) বৈষ্ণবপদাবলির ঐশ্বর্য যুগের প্রমাণ পাওয়া যায় ———।

(গ) 'পদকল্পতরুতে' বলরামদাসের——— পদ পাওয়া যায়।

(ঘ) জ্ঞানদাস———শিল্পী———শিল্পী।

(ঙ) গোবিন্দদাসকে——— 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

3. নীচের বক্তব্যগুলি/ঘটনাগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) জ্ঞানদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।	☐	☐
(খ) গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।	☐	☐
(গ) চৈতন্য সমকালীন কবি বাসুদেব ঘোষ।	☐	☐
(ঘ) 'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে' পদটির রচয়িতা লোচনদাস।	☐	☐
(ঙ) বাসুদেব ঘোষ 'গৌরনাগরী' ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।	☐	☐

8.12 উত্তর সংকেত

8.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) (3) 1486, (খ) (2) ঈশ্বরপুরী, (গ) (3) শেষ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশের শুরু, (ঘ) (1) কাজী।

2. (ক) 1553 খ্রিঃ, (খ) জগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী, (গ) কেশব-ভারতী, (ঘ) সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, (ঙ) হরিদাস।

8.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল, (খ) বৃন্দাবনদাস—চৈতন্য ভাগবত, (গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্য চরিতামৃত, (ঘ) নিত্যানন্দদাস—প্রেমবিলাস, (ঙ) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল, (চ) পরমানন্দ সেন—চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

2. (ক) (1) সংস্কৃত, (খ) (3) আদি, মধ্য, অন্ত্য খণ্ডে, (গ) (2) চৈতন্য চরিতামৃত, (ঘ) (2) পাঁচালীর ঢঙে, (ঙ) (2) ষোড়শ শতাব্দী।

3. (ক) হর্ষচরিত, (খ) সন্ধ্যাকর নন্দী, (গ) অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ, (ঘ) ৩২টি, (ঙ) নরহরি দাস, (চ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতম্ (মুরারি গুপ্তের কড়চা)

8.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) (2) চণ্ডীদাসের, (খ) (3) চৈতন্য পরবর্তীকালে, (গ) (2) বাৎসল্যরসের, (ঘ) (1) বাংলা ভাষায়।

2. (ক) জ্ঞানদাস, (খ) ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, (গ) ১৩৬টি, (ঘ) রূপ, ভাব, (ঙ) শ্রীজীব গোস্বামী।

3. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক।

8.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।

2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 9 ❑ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি—ভারতচন্দ্র রায়—শাক্ত পদাবলি—কবিগান

গঠন

9.1 উদ্দেশ্য
9.2 প্রস্তাবনা
9.3 মূলপাঠ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি
9.4 সারাংশ
9.5 অনুশীলনী 1
9.6 মূলপাঠ ঃ ভারতচন্দ্র রায়
9.7 সারাংশ
9.8 অনুশীলনী 2
9.9 মূলপাঠ ঃ শাক্ত পদাবলি আখ্যান
9.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
9.11 অনুশীলনী 3
9.12 উত্তর সংকেত
9.13 গ্রন্থপঞ্জি

9.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি সপ্তদশ শতাব্দীর—

- মুসলমান কবিদের বাংলা সাহিত্যে নানা অবদানের কথা জানতে পারবেন। বিশেষ করে, আরাকান রাজসভার কবিদ্বয়—দৌলত কাজী ও আলাওল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত-যুগোচিত শিল্পমার্জিত রচনাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে তাঁর কবি-কৃতির মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- শাক্ত পদাবলির অনন্য স্রষ্টা রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চক্রবর্তীর পদ রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন। এর সঙ্গেই কলকাতা নগরের পত্তন ও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির পরিবেশ কবিওয়ালাদের সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

9.2 প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম ও আরাকানের অধিবাসী সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান, হাজি মহম্মদ প্রমুখ লেখকগণ নানা বিষয়ে পুস্তিকা ও কাব্য লিখেছেন। তবে এ-যুগেই আরাকানের রাজসভার কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত সমগ্র বাঙালি জাতির কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন—উভয় কবির 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য। সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যও সর্বজনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভাবতচন্দ্র রায় নিন্দা ও প্রশংসা—দুই-এর ভাগী। বহু রচনার মধ্যে তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দি, ফারসি, সংস্কৃতে সমৃদ্ধ ভারতচন্দ্র শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যকে তিনি নাগররীতির বৈদগ্ধ্যে শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'রূপে চিহ্নিত। অবক্ষয়ী যুগেও রাজসভাকবি হয়েও তাঁর সৃষ্টি সচেতনভাবে বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দিতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রকে আমরা আধুনিকতার অগ্রদূত বলতে পারি।

রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চক্রবর্তী দুজনেই সমাজের দুঃখ-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শাক্ত পদাবলি রচনা করেছেন। শক্তিতত্ত্বের চেয়ে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনাই শাক্ত পদাবলিতে লক্ষ্য করা যায়। শাক্ত সংগীতের পাশাপাশি বাউলসংগীতের কথাও সংক্ষেপে আছে। কলকাতা নগরের পত্তন। 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠা' রাজ-রাজড়াদের অবক্ষয়ী চিন্তা-চেতনার খোরাক হিসেবে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগানের মূল্যায়ন সংক্ষিপ্তাকারে আছে। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ধারাগুলি সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হবে এই এককে।

9.3 মূলপাঠ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহম্মদ সগির রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়ে) -এর একক-(3)-এ আলোচনা করা হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে চৈতন্য প্রভাবে সমৃদ্ধ যুগেও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের কাব্য-কবিতা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—চরিত সাহিত্য, জঙ্গনামা, ধর্ম সাহিত্য ইত্যাদি। সুফিবাদের প্রভাব বাংলা ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে দেখা যায়। তবে, সুফিদের সাহিত্যকে ইসলামি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। আলোচ্য কাব্য-কবিতার লেখকরূপে সৈয়দ সুলতান, শেখ চাঁদ, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ লেখকগণ আছেন।

আরাকানের মুসলিম কবিদের রচনা, বাংলায় প্রচলিত অনুবাদ, মঙ্গলজীবনী ও পদাবলি সাহিত্যধারার পর এর নূতন সংযোজন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এখানে নূতনত্ব তো বটেই, মানবিক জীবনবোধ—জগৎ-জীবন চিন্তা, মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী, বস্তুত দেবতা ও দেবকল্প মানুষের আদর্শায়িত ধর্মাশ্রিত সাহিত্য থেকে ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে এসেছে। এতদিনের কাব্যে মানুষের কথা মাঝে-মধ্যে এলেও তা ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আরাকানের কবিরা ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মহিমাকে তাঁদের নূতন সৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেছেন। ফলে, ভক্তির বদলে প্রেম, দেবতার পরিবর্তে মানুষ—মানুষের কামনা-বাসনা, জীবনের শত-সহস্র অনুভব এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আরাকান-রোসাঙ্গ রাজসভার আনুকুল্যে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের সৃষ্টিসম্ভারই মূলত বর্তমান পাঠের আলোচ্য বিষয়। আরাকানের রাজারা বর্মী হলেও স্থানটি অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্নিহিত থাকায় এবং রাজসভার অমাত্যবর্গের মধ্যে বহু জ্ঞানী-গুণী বাঙালি—এই দুটি কারণে বাংলা ভাষার শুধু চর্চা নয়, বলতে গেলে এই অঞ্চলে দ্বিতীয় মাতৃভাষারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচে উভয় কবির পরিচিতি ও কবি-কৃতির আলোচনা করা হলো :

1. **দৌলত কাজী ঃ** চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবির জন্ম। তিনি

আরাকানের বৌদ্ধ নরপতি থিরি-থু-ধম্মার (শ্রী সুধর্ম) রাজসভায় উপস্থিত হন। আরাকানরাজ তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য সমাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে প্রভাবশালী রাজকর্মচারী সেনাপতি আশরফ খানের নজরে পড়েন এবং নানাদিক থেকে কবি তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পান। থিরি-থু-ধম্মার শাসনকাল ১৬২১ খ্রিঃ—১৬৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের মধ্যে দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়নার গান' রচনা শুরু করেন। কবির অকালমৃত্যুতে কাব্যখানি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে আলাওল শেষ করেন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে।

কবি-প্রতিভা ঃ মিয়া সাধনের 'সতী মৈনাবত' হিন্দি ভাষায় রচিত;এই কাব্য অবলম্বনে দৌলত কাজী কাব্যখানি লেখেন। অনেকের ধারণা কবি মুল্লা দাউদের 'চন্দায়ন' কাব্যের দ্বারাও কবি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দৌলত কাজীর আখ্যানকাব্যখানি বাংলা ভাষায় পাঁচালীর রীতিতে রচিত বলেই এর গল্পরসের প্রতি বাঙালির এতো আকর্ষণ। দৌলত কাজী লোক-কাহিনীকে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত পূর্ণাঙ্গ আখ্যানরূপে তাঁর কাব্যে বিন্যস্ত করেন। যদিও তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যখানি সমাপ্ত করার পূর্বেই মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করেন সৈয়দ আলাওল।

কাব্য-কাহিনী ঃ গোহারীর রাজকুমারী চন্দ্রাণীর সঙ্গে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয়। মৃগয়াসূত্রে চিরদুঃখী চন্দ্রাণীর সঙ্গে রাজা লোর-এর সাক্ষাৎ হয় ও প্রেম জন্মায়। গুপ্তপ্রেম শুরু হয়। এর পরিণতিতে বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে বামন নিহত হন। লোর গোহারী দেশের রাজা হন। তিনি চন্দ্রাণীকে বিয়ে করে মহানন্দে মগ্ন হন। এদিকে লোর-এর স্ত্রী ময়না বিরহযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শিব-দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। ছাতন নামে এক লম্পট রাজকুমারের কু-প্রস্তাব ময়না ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কবির অকালমৃত্যুতে এখানেই কবি দৌলত কাজীর কাব্যের সমাপ্তি।

কবির মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পরে (১৬৫৯) সৈয়দ আলাওল কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। দৌলত কাজীর কাহিনীর সঙ্গে পার্শ্বকাহিনী যুক্ত করে আখ্যানভাগকে রূপকথাধর্মী রূপ দিয়ে লোর-চন্দ্রাণীর পুত্রসহ ময়নার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা এবং দুই স্ত্রী নিয়ে লোরের সুখের জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে আলাওল কাব্যের মিলনান্তক সমাপ্তিরেখা টেনেছেন।

দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়নামতী' কাব্যখানি হঠাৎ যেখানে শেষ হয়েছে— সেই অসমাপ্ত অংশটি কবি আলাওল দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেছেন। এই অংশটিই কবির মৌলিক রচনা। 'সতী ময়না'র যে অংশটুকু তিনি সংযোজন করেছেন তা হ'লো— দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক পরিণতির শেষে মিলনান্তক সংযোজন। তাঁর লেখায় দেখা যায়, বিরহযন্ত্রণায় কাতর ময়নাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল কুট্টনী। কিন্তু তার প্রলোভনের ফাঁদে ধরা না দিয়ে 'সতী ময়না' তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। একাকীত্বের হাহাকার থেকে কবি 'সতী ময়না'র জীবনে কিছুটা স্বস্তি দিতে সৃষ্টি করেছেন এক সখীর চিত্রকে। এই সখীর নানা উপকথার মধ্য দিয়েই কবি ময়নার বিরহযন্ত্রণা লাঘব করতে চেয়েছেন। যে মিলনান্তক উপকথাটি সখী পরিবেশন করেছেন তার দ্বারাই উদ্বোধিত হয়ে 'সতী ময়না' এক ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছিল স্বামীর কাছে। বহুকাল পরে স্বামী লোর-চন্দ্রাণীসহ ময়নামতীর কাছে ফিরে আসে। তারপর ভুল বোঝাবুঝির চির অবসান। দুই সতীনে স্বামীর সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে মহা আনন্দে বাকি দিনগুলি কাটায়। এইভাবে আলাওল দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক কাব্যকে মিলনান্তক পরিণতি দান করেন।

আলাওল যে অংশটুকু কাব্যে সংযোজন করেছেন, তা কাব্যমূল্যের বিচারে অকিঞ্চিৎকর। কাব্যের বাঁধন-ছাঁদন তেমন নেই। অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথার জাল বুনে তিনি কাব্যখানিকে ভারাক্রান্ত করেছেন।

দৌলতকাজীর কবিত্ব ও মেজাজের ধারা আলাওল সঠিক অনুসরণ করতে পারেননি। গতানুগতিক মিলনান্তিক পরিণতি টেনেছেন।

কবি-প্রতিভা ঃ বাংলা সাহিত্য দেব-দেবীর জগৎ ছেড়ে দৌলত কাজীর হাতেই রক্তমাংসে গড়া বাস্তব নর-নারীর কামনা-বাসনা, প্রেমাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। মুসলমান কবির হাতে হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, সতীত্বের আদর্শ বাস্তবরসে স্নাত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি উদার সুফি ধর্মাবলম্বী হয়েও তাঁর কাব্যে হিন্দু যোগ-সাধনার উল্লেখ করেছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে অর্থাৎ লোর-চন্দ্রাণীর প্রণয় অংশে ফারসি কিস্‌সার ছাপ কিছুটা থাকলেও কবি তাঁর সৃষ্টিতে হিন্দু পুরাণ-দর্শনের প্রয়োগও সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। ময়নার বিরহ-বেদনার মধ্যে বৈষ্ণব-পদাবলির ছায়াসম্পাত লক্ষ্য করা যায়। আখ্যান বর্ণনায় ও বিচিত্র ভাবানুভূতি প্রকাশে কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রণেও কবির দক্ষতা দেখা যায়। সতী ময়নামতী, বীর লোরক ও ভাগ্যহতা চন্দ্রাণীর চরিত্র বাস্তবধর্মী হয়েছে।

নারী মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার হিসাবেই কবি চিহ্নিত। দৌলত কাজীর কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও কিছু দেখা যায়। এতে মনে হয়, কবি সংস্কৃত ভাষাও জানতেন। কবির বর্ণনারীতি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি কাহিনী-গ্রন্থনেও গতিরাগের চিহ্ন আছে।

2. **সৈয়দ আলাওল ঃ** আরাকান রাজসভার বিখ্যাত বিদগ্ধ কবি সৈয়দ আলাওল। হিন্দু-মুসলমান উভয় পাঠকের কাছে, বিশেষ করে হিন্দুসমাজে খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যটি। এ ছাড়া আরবি-ফারসি বহু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এবং দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করে তিনি তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

কবি-পরিচিতি ঃ 'সেকেন্দারনামা' ও 'সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল' গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, কবি ফতেবাবাদের শাসকবর্গের অমাত্যপুত্র ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কবির জন্ম এবং ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে কবি দেহত্যাগ করেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে জীবন-জীবিকার জন্য কবি মগরাজের সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিতে বাধ্য হন। মগরাজ দরবারের অভিজাত মুসলমান অমাত্যগণ আলাওলের কবিত্ব, সংগীত প্রতিভা ইত্যাদির পরিচয় জেনে কাব্য-সাহিত্য চর্চার জন্য কবিকে উৎসাহিত করেন। আরাকানের মুসলমান শাসকবর্গের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আরবি-ফারসি-হিন্দি বিভিন্ন কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে স্বকীয় প্রতিভার দৃষ্টান্ত রাখেন। কিন্তু ভাবতেও কষ্ট হয়—এই স্রষ্টাকে বিনা অপরাধে বহুদিন আরাকানের রাজ-কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে মুক্তি পেয়ে পুনরায় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। যাঁরা কবিকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, বিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ মুসা এবং আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মা-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্য-পরিচয় ঃ আলাওল ফারসি বা হিন্দি বই থেকে যে সমস্ত কাব্য অনুবাদ করেন, সেগুলি হ'লো— সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৪) 'সয়ফুলমূলক-বদি উজ্জমাল' (১৬৫৮-৭০), সেকেন্দারনামা (১৬৭২), পদ্মাবতী (আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

পদ্মাবতী বাদে অন্য সমস্ত উল্লিখিত গ্রন্থই মুসলমান সমাজে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর মূল কারণ—এই সব গ্রন্থ ইসলামি কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানা মূল গ্রন্থের অনুবাদ। সিংহলরাজকন্যা ও মেবারের রানী পদ্মাবতী বা পদ্মিনী অবলম্বনে রচিত কাহিনী হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় 'পদ্মাবতী' কাব্য কবি আলাওল হিন্দি ভাষায় রচিত, অযোধ্যার সুফি মতাবলম্বী ভক্তকবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ'

গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস রোমান্সরস মিশিয়ে লিখেছেন। ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার আধিক্য রয়েছে। এই কাব্যে ধর্মীয় ভাব-ভাবনা বা রূপকাশ্রয়ী কোনো কিছু নেই। ইতিহাসের উপাদান সামান্য থাকলেও একে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রোমান্টিক-ঐতিহাসিক' কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। জায়সীর 'পদুমাবৎ' হিন্দি কাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও কবি-প্রতিভার স্পর্শে 'পদ্মাবতী' মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারার নূতন দরজা খুলে দেন। পদ্মাবতীর কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনায় কবি আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা বৈষ্ণব পদের অনুসরণে। এই গ্রন্থে ১১ টি আবেগ-উচ্ছ্বাসভরা গান আছে। পারিবারিক জীবনকথা ও বারমাসী বর্ণনার মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারার কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন এই 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের জন্যই। পয়ার-ত্রিপদীর নিখুঁত ছান্দসিক প্রকরণে ও বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবে 'পদ্মাবতী' অনুবাদ গ্রন্থ হয়েও বিশেষত্বের দাবী রাখে।

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের সৃষ্টি তেমন উচ্চাঙ্গের না হলেও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। তার কারণ— পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু কবিগণ যখন চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও বৈষ্ণবপদ রচনার মধ্য দিয়ে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে মগ্ন—ঠিক সেই সময় এই দুই মুসলমান কবি বাংলার জন-হাওয়া-মাটির সঙ্গে যুক্ত সাধারণ নর-নারীর বিরহ-মিলনের কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক আখ্যান লিখে বাংলা সাহিত্যের একমুখীন ধারাকে পাল্টে দিয়েছেন। বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক এই কাব্যখানি সেইজন্যই প্রশংসার দাবী রাখে। দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কবি-প্রতিভার তুলনাত্মক বিচারে বহু সমালোচকই দৌলত কাজীকেই শ্রেষ্ঠতর বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে, দুই কবির মূল্যায়নে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—"বাংলায় হিন্দি ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ দরবারের দুজন সভাকবি, দৌলত কাজী ও আলাওল।"

9.4 সারাংশ

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতাব্দীকে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল যে সৃষ্টিসম্ভার উপহার দিয়েছেন, তাতে দুই কবি সমগ্র সমাজের কবিরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়না'র কাব্যখানি লেখেন। তবে, গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই বিয়োগান্তক পরিণতিতে কাব্যখানির ছেদরেখা পড়ে কবির অকাল মৃত্যুর জন্য। হিন্দিভাষী মিয়া সাধনের গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় রচিত 'সতী ময়না'র কাহিনীর সঙ্গে প্রচলিত লোককাহিনীকে বিন্যস্ত করে আলোচ্য কাব্যটি রচনা করেন দৌলত কাজী।

নপুংসক চন্দ্রাণীর স্বামী বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ—যুদ্ধে বামন নিহত। লোর ও চন্দ্রাণীর বিবাহ— সুখে নব জীবনযাপন। স্বামী-বিচ্ছেদে লোরের প্রথমা পত্নী ময়নার বিরহযন্ত্রণা—এই পর্যন্ত কাহিনী দৌলত কাজীর গ্রন্থে আছে। কবির হাতে লোর-চন্দ্রাণী বা সতী ময়না বাস্তব জীবনরসে সমৃদ্ধ। কবির হাতে হিন্দু সমাজের প্রতিফলন, ধর্মবিশ্বাস, সতী রমণীর পবিত্র আদর্শ চিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। চিত্রকল্প ও প্রসঙ্গ নির্বাচনেও কবি হিন্দু সমাজের পরিবেশ রচনায় সার্থক। তাঁর হাতে সতী ময়না, বীরনায়ক লোর ও বিবাহিতা ভাগ্যবঞ্চিতা চন্দ্রাণীর চরিত্র বাস্তবানুগ হয়েছে। সুফি ধর্মমতাবলম্বী কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু যোগসাধনাও যুক্ত হতে দেখা যায় এই কাব্যে। কবি যে সংস্কৃত ভাষা জানতেন তার নমুনা কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষাও তিনি কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। কবির বর্ণনারীতি প্রাঞ্জল, যার ফলে কাব্যে গতি সৃষ্টি হয়েছে। নারী মনস্তত্ত্বের বাস্তবধর্মী প্রকাশ দেখা যায়।

দৌলত কাজীর পাশাপাশি সে-যুগের সর্বাধিক প্রচারিত মুসলমান কবি হলেন—'সৈয়দ আলাওল'। তিনি বহু আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। সেগুলি হলো—'হপ্ত (সপ্ত) পয়কর', 'তোহ্‌ফা', 'সেকেন্দারনামা', 'সয়ফুলমুলক বদি-উজ্জামাল', 'পদ্মাবতী'। তবে 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য কবি হিন্দুসমাজের পরম আদৃত। কবির মৌলিক সৃষ্টি হলো—দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'সতী ময়না' কাব্যের শেষাংশ। আলাওলের সর্বোত্তম রচনা 'পদ্মাবতী'। জায়সীর কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হলেও কবি অনুকরণ করেননি। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় কবির অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় আছে। রোমান্টিক প্রণয়-কাব্য হিসাবে হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

স্বামী-বিচ্ছেদে আত্মহারা ময়নার কঠোর সাধনা, কুট্টনীর কু-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান; সখীর পরামর্শে সৎ ব্রাহ্মণকে লোরকের কাছে প্রেরণ। লোরক-চন্দ্রাণীর পুত্রসহ প্রত্যাবর্তন। স্বামী ও দুই সতীনের সুখে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি। দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক কাব্যকে আলাওল গতানুগতিক ধারায় মিলনান্তক করেছেন।

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল দেব-দেবীর মাহাত্ম্যধর্মী বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অস্বীকার করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজজীবন থেকে বাস্তবরস আহরণ করে—বাস্তবধর্মী জীবনরসস্নাত কাব্য বাংলা সাহিত্য-আঙিনায় নিয়ে আসেন। একঘেয়ে ধারাকে অস্বীকার করে বাস্তব জীবনছন্দকে বাংলা সাহিত্যে গ্রথিত করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়।

9.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১৩২ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) দৌলত কাজী 'পদ্মাবতী' রচনা করেছেন।	☐	☐
(খ) আলাওল পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।	☐	☐
(গ) আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্মার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন।	☐	☐
(ঘ) 'সতী ময়না'র কাহিনী বাস্তবধর্মী।	☐	☐
(ঙ) 'জায়সী'র 'পদুমাবৎ' কাব্য ফারসি ভাষায় রচিত।	☐	☐

2. শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসান :
   (ক) দৌলত কাজী ———————— আমলে 'সতী ময়না' কাব্য রচনা করেন।
   (খ) আলাওল 'সতী ময়না'র ———————— পরিণতি দান করেন।
   (গ) 'সেকেন্দারনামা'————————ভাষায় রচিত গ্রন্থের থেকে অনূদিত।
   (ঘ) চন্দ্রাণীর স্বামী————————ও ———————— ছিলেন।

3. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :
   (ক) লোর যুদ্ধে পরাস্ত করে নিহত করে— : 1. গোহারী রাজাকে
   2. বামনকে
   3. আশরফকে

(খ) 'সতী ময়না' কাব্যটি— : 1. মহাকাব্য
2. লিরিক
3. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

(গ) সৈয়দ আলাওলের 'তোহ্‌ফা'— : 1. হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদ
2. ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ
3. ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ

(ঘ) 'ময়না' চরিত্রটি— 1. দুর্বল
2. দোদুল্যমান
3. বলিষ্ঠ

(ঙ) চন্দ্রাণীর চরিত্রটি— : 1. বাস্তবধর্মী
2. অলৌকিক
3. অবাস্তব

9.6 মূলপাঠ ঃ ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির জগতে তেমন কোনো স্মরণীয় কিছু নেই। এই সময় মৌলিক সাহিত্যও কিছু রচিত হয়নি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালির ইতিহাস, সমাজ ও পরিবার জীবনের পট পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল আমলের শেষের দিকে বাংলার মানুষ শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে, বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটেছে, বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে, সমাজজীবনে অবক্ষয়ী ভাবনার প্রাবল্য, লেখকগণও গড্ডলিকার স্রোতে ভাসমান—সেই যুগেই 'অমাবস্যার চাঁদ' রূপে আবির্ভূত হলেন ভারতচন্দ্র রায়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নূতন দিগন্তের নির্দেশ করেন। বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তাঁকে আমরা প্রথম শ্রেণীর বিদগ্ধ কবিরূপে চিহ্নিত করতে পারি। নীচে কবির ব্যক্তি-পরিচিতি ও তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লো।

কবি-পরিচিতি ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রক্ষিত পুঁথি অবলম্বনে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি প্রকাশ করেন। এর কিছুকাল পরেই কবি ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও চরম নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

কবির জন্ম সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে, কিন্তু ধনীর সন্তান হয়েও তাঁকে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত হতে হয়েছে। হাওড়া হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্র রায়। তিনি বর্ধমানরাজের দ্বারা সর্বস্বান্ত হলে কবিকে বাল্যবয়সেই বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে চলে যেতে হয়। সেখানে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই কবি সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পরে ফারসি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার জন্মে। নিজ পছন্দমতো বিয়ে করার জন্য পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হন। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে কবি হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে কিছুদিন থাকেন এবং ফারসি ভাষা শিক্ষায় মনসংযোগ করেন। তাঁকে এরই মধ্যে কিছুদিন বর্ধমানরাজের কারাগারেও বন্দী জীবনযাপন করতে হয়। কারাগার থেকে পালিয়ে বৈষ্ণববেশে পুরীতে শঙ্করাচার্যের মঠে থেকে এক কীর্তনদলের সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ান। পথিমধ্যে শালিপতির সঙ্গে দেখা—তিনি জোর করে কবিকে

গৃহে ফিরিয়ে আনেন। কবি সস্ত্রীক চন্দননগরে ফারসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে বসবাস করেন। দেওয়ানজীর চেষ্টায় এবং কবির নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভায় চাকরি লাভ করেন। মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে মুলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আদর্শে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার জন্য প্রেরণা জোগান। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে কবি দেহরক্ষা করেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে"—কাব্য পঙ্‌ক্তিটি যথার্থ।

কাব্য-পরিচয় ঃ আনুমানিক ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ—এই ৪৮ বছর কালের মধ্যেই শত ঝড়ঝঞ্ঝার পাথার পেরিয়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রতিকূল পরিবেশ-পটভূমিকাতেও কবি তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। নিন্দা-প্রশংসা দুইয়েরই অধিকারী কবি। প্রথম জীবনে সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও ব্রতকথাজাতীয় লেখার মধ্য দিয়ে কবির আত্মপ্রকাশ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা ও রতিমঞ্জরীর আদর্শে তিনি 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এ-সব সৃষ্টির সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই। ভারতচন্দ্রের খ্যাতির ভিত্তিমূলে রয়েছে তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি। এ ছাড়া 'বসন্ত বর্ণনা', 'বর্ষামঙ্গল' ও 'কৃষ্ণের উক্তি' ইত্যাদি কিছু ক্ষুদ্র কবিতাও রচনা করেন। 'রায় গুণাকর' উপাধি কবিকে দেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

অন্নদামঙ্গল ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যটি রচনা করে কবি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে 'রায় গুণাকর' উপাধি পান। এই কাব্যের প্রধান গুণ এই যে, পরস্পর গভীর সম্পর্কান্বিত তিনখানি কাব্য এর সঙ্গে সংহতরূপে সংযুক্ত। কাব্য তিনখানি হ'লো—(১) 'অন্নদামঙ্গল', (২) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' ও (৩) 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' বা 'মানসিংহ'।

'অন্নদামঙ্গল' প্রথম খণ্ড ঃ চিরাচরিত মঙ্গলকাব্যের রীতিতে কাব্যোৎপত্তির কারণ, আত্মচরিত, সমকালীন দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক বর্ণনা ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার চিত্র—এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' দ্বিতীয় খণ্ড ঃ এই খণ্ডের আখ্যানটি পূর্ব প্রচলিত 'কালিকামঙ্গল' অনুসৃত। নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গলে'র আদর্শ কবি গ্রহণ করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যা ও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, নানা বিপত্তি, শেষে কালিকার প্রসাদে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ—বহুল প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনেই এই খণ্ড রচিত। কাব্যের আরম্ভে ভবানন্দ মজুমদার ও মানসিংহের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমি রচনার চেষ্টা থাকলেও মূল কাহিনী-অংশের সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের যোগ নেই।

তৃতীয় খণ্ড ঃ ভারতচন্দ্র বাংলাদেশে মোগল অভিযানের পটভূমিতে ভবানন্দের প্রতি দেবীর কৃপা এবং ভবানন্দের 'রাজা' উপাধিলাভের বর্ণনা করেছেন। এই খণ্ডটিকে আমরা অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য প্রচার কাব্যরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

মূল্যায়ন ঃ মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারা ও সংস্কার পরিত্যাগ করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে কবি দেব-দেবী বা শাপভ্রষ্ট নর-নারীর জগৎ ছেড়ে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন। হিন্দি-ফারসি মিশ্রিত কবিতাগুলির স্বাদ-বৈচিত্র্যই লক্ষণীয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেই। এই কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো এই যে, পূর্ণ পৌরাণিক ছাঁদের কাব্য হয়েও, বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ ও মানুষের চিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'দেবখণ্ডের' বর্ণনায়

মুকুন্দরামের প্রভাব লক্ষণীয়। পুরাণ থেকে নানা প্রসঙ্গ সংকলিত হলেও কাশীধামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় নূতনত্ব আছে। এই অংশটি কবি 'কাশীখণ্ড' নামক একটি উপপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রথম খণ্ডের হরিহোড়ের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। ভবানন্দ চরিত্রটি ঐতিহাসিক।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের সংযোগ ক্ষীণ নয়। বিদ্যাসুন্দরের প্রাণয়-কাহিনী মানসিংহের কাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত। দক্ষযজ্ঞ নাশ, উমা-মহেশ বিবাহের উৎসে পুরাণ ও মহাকবি কালিদাসের প্রভাব থাকলেও বিষয় দুটি নির্বাচনে মুকুন্দর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। মুকুন্দর কালকেতুর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে হরিহোড়ের দারিদ্র্যের চিত্রের মধ্যে। ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর কলহ মুকুন্দরামের ধনপতি উপাখ্যানের লহনা-খুল্লনার কলহের দ্বারা প্রভাবিত। এই সব নানা প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র যে প্রতিভাধর কবি ছিলেন—তা সর্বজনস্বীকৃত।

যুগসন্ধি পর্বের কবি ভারতচন্দ্র স্পষ্টভাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বাহ্যিক আঙ্গিককে অবলম্বন করে নূতন কাব্যরীতির আভাস দিয়েছেন। কবির সৃষ্টি প্রসাদগুণসম্পন্ন ও রসপূর্ণ হয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত সংসার জীবনের নানা নীচতা, ইন্দ্রিয়বিলাস, ভোগপিপাসা, বাঙালির গৃহবধূর কৌতুহল, হিংসা-দ্বেষ, দুই সতীনের কোন্দল, হীরা-মালিনীর বেসাতির হিসেব-নিকেশ ইত্যাদিতে কবি স্নিগ্ধ-রসোজ্জ্বল জীবনদর্শনের প্রতি আলোক সম্পাত ঘটাতে পেরেছেন। আদর্শ কক্ষচ্যুত আকর্ষণীয় চরিত্র হলো হীরা-মালিনী। কবির ভাষায়—

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।"

আলঙ্কারিক চাতুর্যপূর্ণ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র অনন্য। প্রমথ চৌধুরী বিশ্বখ্যাত হাস্যরস শিল্পী 'Cervantes'-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের মিল খুঁজে পেয়ে লিখেছেন—"এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি।" স্নিগ্ধোজ্জ্বল জীবনের পূজারী ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অবচেতচিত সেই সদা দুখী।।"

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে জয় করতে পারেননি বলেই তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তীর তিনি নিক্ষেপ করেছেন। দুঃখদীর্ণ জীবনচিত্র আঁকতে কবিচিত্তের অবাধ উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে হাসির ঢেউ-এ ঢেউ-এ সমাজভিতকে আঘাত করেছেন।

চরিত্র চিত্রণে কবির স্বকীয়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতচন্দ্রের হাতে দেব-দেবী স্বর্গের মহিমা ত্যাগ করে বাংলাদেশের অতি চেনা চরিত্র হয়েছেন। তাই দেবতারা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয়ের পাত্র না হয়ে—আমাদেরই একজনা হয়েছেন। মহাদেব, অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব ইত্যাদি চরিত্র পৌরাণিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে কবির রঙ্গ-রসিকতার ধারায় স্নাত হয়ে আমাদের জীবনসাথী হয়েছেন। এক কথায় কবির হাতে দেবতা দেবত্ব হারিয়ে মানব-মানবী হয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের হীরা-মালিনী ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র তেমন সার্থক হয়নি। 'মানসিংহ' বা 'অন্নদামঙ্গল' খণ্ডের অতিরঞ্জন ও ইতিহাস বিকৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে এই খণ্ডের অপ্রধান চরিত্রগুলি সার্থক হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষা অতুলনীয়। ড. ক্ষেত্র গুপ্তের ভাষায়—"ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষাশিল্পের তাজমহল। ছন্দনির্মাণ, শব্দচয়ন ও বয়নে, চিত্র ও সংগীতরস সৃজনে, অলঙ্করণের পারিপাট্যে তিনি বাংলা কাব্যের অতি সচেতন কবিদের মধ্যে অন্যতম।" কবি তাঁর 'যাবনী মিশাল' ভাষায় রূপদক্ষ শিল্পীর মতো মনের ভাবকে ব্যক্ত করেছেন। হিন্দি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায় কবির ছিল বিশেষ দখল। কবির ভাষা দক্ষতার নিদর্শন—

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে।।
লটাপট্ জটাজুট্ সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ কলক্কল্ টলট্টল্ তরঙ্গা।।"

গীতিরসের মূর্ছনার নিদর্শন—

"কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।"

সচেতন মননঋদ্ধ কবি ভাষা প্রয়োগে পাণ্ডিত্য দেখাননি। সকলের উপযুক্ত ভাষায় কাব্য লিখেছেন।

কবির লেখায় রাজ সভাকবির মণ্ডনকলা অক্ষুণ্ণ আছে। যার ফলে 'বিদ্যাসুন্দরে'র মতো কাহিনীও নাগররীতির বৈদগ্ধ্যে শিল্পসম্মত হয়েছে। গ্রামীণ ও আবেগবহুল ভাষাকে কবি নাগরিক ও মননপ্রধান করে তুলেছেন। ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে তিনি বহু শব্দকে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়েছেন। ভারতচন্দ্র রচিত বহু প্রবাদ আজও চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধির প্রাখর্যে দেদীপ্যমান।

উদাহরণ—

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'
'বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ।'
'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।'
'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী'—ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীলতার দায়ে যেমন অভিযুক্ত—তেমনি কবি ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই শব্দব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধকাম কবির ভাষা সংযোজনার সার্থকতাকে অকপটে স্বীকার করে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"রাজ সভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য।"

বায়ুগ্রস্ত না হয়ে নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে যদি রসবোধ ও সৌন্দর্যদৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় তাহলেই ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। কবির 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে আমরা 'নতুনমঙ্গল' কাব্যরূপেই চিহ্নিত করব। সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি গুণের জন্যই ভারতচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

9.7 সারাংশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতির সংকট-মুহূর্তে হাওড়া-হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার পেড়ো গ্রামে বর্ধিষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান শৈশব লগ্নেই ঘরছাড়া হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। প্রতিকূল অবস্থা, কারাবাস, অন্তর্ধান আবার গৃহী হয়ে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষ কবি—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবিরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অমর কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। তবে এর পূর্বেই সত্যনারায়ণের পাঁচালী, রসমঞ্জরী

ও ছোট ছোট কবিতা তিনি রচনা করেন। কবির প্রতিভা বৈশিষ্ট্যের চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে তিনি বাস্তব জীবনরসস্নাত 'নতুন-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' আর তৃতীয় খণ্ড হ'লো 'মানসিংহ'। প্রথম খণ্ডের শুরুতে 'মঙ্গলকাব্যে'র রীতি অনুযায়ী কাব্যোৎপত্তির কারণ, আত্মচরিত ইত্যাদি থাকলেও কাব্যের গভীরে ধীরে ধীরে সুখ-দুঃখ বেদনামথিত বাস্তব জীবনই চিত্রিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের কাহিনী ক্ষীণ সূত্রে গ্রথিত নয়—যতটা দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে দেখা যায়।

নূতন কাব্যরীতির আভাস ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখা যায়। কবির কাব্যখানি প্রসাদগুণসম্পন্ন রসপূর্ণ। কবি জীবনকে হাস্যোরসোজ্জ্বল করে এঁকেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হলেও তা হৃদয়রসে জারিত। এর উৎস কবির হৃদিগভীরে। তাঁর কাব্য ভাষাসম্পদে পরিপূর্ণ। হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে তিনি বহু শব্দ বাংলা ভাষা শব্দভাণ্ডারে অনায়াসে সংযোজন করেছেন। গ্রামীণ কথ্যভাষাও তাঁর লেখনী স্পর্শে গৌরবের স্থান দখল করেছে। তাঁর কাব্যে অলঙ্করণ মণ্ডলকলার যথাযথ প্রয়োগও দেখা যায়। কবির বহু বাণী প্রবাদবাক্যের মহিমালাভ করেছে। চরিত্র চিত্রণে, ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োগে, সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যগুণে ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি আকর্ষণীয় হয়েছে। রাজসভার মনোরঞ্জন করেও কবি যুগের অবক্ষয়কে গভীরভাব উপলব্ধি করে তাঁর কাব্যকে অনুভূতির জগৎ থেকে সচেতনভাবে বুদ্ধির প্রাখর্যে সুশোভন করেছেন। কবির বাক্-বিভূতি, ছান্দসিক ও আলঙ্কারিক প্রকরণ অনবদ্য। এইজন্যই ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ—সবাই তাঁর কাব্যের ভাষা-শিল্পের প্রশংসার পঞ্চমুখ।

9.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে 133 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে সঠিক উত্তর বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য— :
1. তিন খণ্ডে বিন্যস্ত
2. দুই খণ্ডে বিন্যস্ত
3. চার খণ্ডে বিন্যস্ত

(খ) ভারতচন্দ্র দক্ষ ছিলেন— :
1. ইংরেজি ভাষায়
2. হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায়
3. প্রাকৃত, গ্রিক ভাষায়

(গ) ভারতচন্দ্র রাজসভা কবি ছিলেন— :
1. ভবানন্দের
2. বর্ধমান মহারাজার
3. কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের

(ঘ) 'রসমঞ্জরী' কাব্যখানি— :
1. মহাকাব্য
2. গীতিকাব্য
3. অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ

(ঙ) ভারতচন্দ্রের মৃত্যু— : 1. 50 বছর বয়সে
2. 48 বছর বয়সে
3. 60 বছর বয়সে

2. শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন :

(ক) ভারতচন্দ্র_______পরগনার________গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) ভারতচন্দ্র দেওয়ান_______ চৌধুরীর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

(গ) বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী________এর আদর্শে রচিত।

(ঘ) "কথায় হীরার ধার________তার নাম।"

(ঙ) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'_________প্রকাশ করেন।

3. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করুন :

	ঠিক	ভুল
(ক) ভারতচন্দ্র আধুনিক যুগের কবি।	☐	☐
(খ) ভারতচন্দ্র 'রায় গুণাকর' উপাধি পান।	☐	☐
(গ) ভারতচন্দ্র যথার্থ ভাষাশিল্পী ছিলেন।	☐	☐
(ঘ) 'অন্নদামঙ্গলে'র তৃতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'।	☐	☐
(ঙ) কৃষ্ণনগরের মহারাজা ভারতচন্দ্রকে বন্দী করেন।	☐	☐
(চ) দেবখণ্ডের বর্ণনায় মুকুন্দরামের প্রভাব আছে।	☐	☐

9.9 মূলপাঠ : শাক্ত পদাবলি আখ্যান

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যালোচনায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র পাশাপাশি কাব্যরস বৈচিত্র্যে শাক্ত পদাবলি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলির জগৎ চারশ' বছরের ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ কিন্তু শাক্ত পদাবলির উৎপত্তিও মধ্যযুগের শেষ পাদে—সীমা মাত্র একশ' বছর। শাক্ত পদাবলি ও বাউল সংগীতের উদ্ভব লগ্নের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—চরম অব্যবস্থা-অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ বরাভয়দাত্রী মা কালিকার আশ্রয় অনুসন্ধানী হয়। বর্গির হাঙ্গামা, রাজ-কর্মচারীদের শোষণ-শাসন সর্বস্তরে ভীতিসঞ্চার করেছিল। এ-সবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'পরম করুণাময়ী', 'কালভয়হারিণী' দেবী কালিকার প্রতি ভক্ত সন্তানদের অভিযোগ, আবদার, আর্তি ও মুক্তি প্রার্থনা ইত্যাদি শাক্ত পদাবলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে শাক্তপদ ও পদকর্তাদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তন্ত্রের ক্রিয়াদি ও তার গৌপনীয়তা ও রহস্যের মধ্যে যে অনুভূতির ব্যাপারটি ছিল রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত শাক্ত সংগীতের মধ্য দিয়ে তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তন্ত্রের তত্ত্ব-রহস্যকে নানা রূপকের মোড়কে মুড়ে অলঙ্করণ সজ্জায় ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। যে-সব গানে কবি-চিত্তের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিই সংগীত বা সার্থক পদ হয়েছে। আর যে-সব পদে তত্ত্বকথা, গূঢ় সাধনার কথা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি সঠিক পদ হয়ে ওঠেনি। জমিদার, দেওয়ান থেকে সাধারণ স্তরের মানুষও শাক্তপদ রচনা করেছেন। তবে এই সাহিত্য ধারার স্মরণীয় কবিদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, সুফিধর্মের প্রচার, চৈতন্যদেবের সর্বজনীন লোকধর্ম—সমাজজীবনে ধর্ম সমন্বয়ের

যে ধারার সৃষ্টি করেছিল তার পথ ধরেই বাউল সংগীতের সৃষ্টি। এর উদ্ভবকাল অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউলধর্ম এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।" বাউলেরা 'মনের মানুষে'র অনুসন্ধানী। সংকীর্ণ আচার-বিচার, প্রথা-প্রকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এঁরা। বাউল সঙ্গীত জগতের মধ্যমণি হ্লেন লালন ফকির। নিম্নে শাক্ত পদাবলির স্মরণীয় কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এবং বাউল সংগীতের মধ্যমণি লালন ফকির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো :

শাক্ত পদাবলি ঃ শাক্ত পদাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি **রামপ্রসাদ সেন**। 'কবিরঞ্জন' উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। কবির পিতার নাম রামরাম। উত্তর ২৪-পরগনার হালিশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে ছিল কবির বাসস্থান। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। কিছু কৃষ্ণকীর্তনও তিনি লিখেছেন। তবে কবির খ্যাতি মূলত শ্যামাসংগীতের স্রষ্টারূপে। তাঁর এই সংগীত সাধক কবির ভক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত। ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসার মিশ্রণে কবির শ্যামাসংগীতগুলিতে আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে সুমধুর সম্পর্কের সেতুবন্ধন ঘটেছে। ভাবসমৃদ্ধ সরল বাচনভঙ্গি রামপ্রসাদের গানগুলিকে হৃদয়স্পর্শী করেছে। শাক্ত পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর পদগুলি আত্যন্তিক সুরে রঞ্জিত হয়েছে। কবির কাব্য-পরিচিতি ও কবি-কৃতির পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লো :

বিদ্যাসুন্দর ঃ অনেকের ধারণা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মনোরঞ্জনের জন্য রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গলে'র মোড়কে আদি রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কবিকে, 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' বিদ্যাসুন্দরের অনুসরণে রামপ্রসাদ কাব্যখানি রচনা করেন। চরিত্র পরিকল্পনায় কবির কিছুটা কৃতিত্ব থাকলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যের জনপ্রিয়তায় এই কাব্যখানি প্রায় হারিয়ে গেছে।

কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন ঃ কবির দুই ক্ষুদ্র কাব্য হলো কালীকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন। কালীকীর্তনে কবি বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে কবি-প্রতিভার বিকাশ মোটেই হয়নি। কৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও একই বক্তব্য। কবির কবিত্বের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির মূলে রয়েছে শাক্তসংগীত।

শাক্ত পদাবলী ঃ বর্তমানে রামপ্রসাদের প্রায় তিনশত পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। পদাবলির বিভিন্ন স্তরের পদগুলিকে আমরা কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করতে পারি—

১. উমা-বিষয়ক, ২. সাধন-বিষয়ক, ৩. কালিকার স্বরূপ-বিষয়ক, ৪. শাক্ততত্ত্ব দর্শন ও নীতি বিষয়ক।

কৌলীন্যপ্রথা, গৌরীদান প্রথা, সতীদাহ প্রথা—এককথায় যুগটি ছিল 'নারীমেধ' যুগ। এর পাশাপাশি সমাজে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, সত্যভ্রষ্টতা, শাসকবর্গের অত্যাচার—সব মিলিয়ে সমাজজীবনের পীড়ন-লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনা করে কবি অন্ধকারবিনাশী মহাশক্তির উদ্বোধনসংগীত রচনা করেন।

মাতৃজাতির বেদনার ছবিটি 'আগমনী' ও 'বিজয়া' অংশে কবি 'হিমালয়-মা মেনকা-উমা' এবং 'শিব-উমা-গঙ্গা'র সংসারজীবনের চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে। বাৎসল্য রসের ধারায় এই পর্যায়ের পদগুলি মধুর ও করুণ রসে স্নাত। তবে কবির এই পর্যায়ের পদসংখ্যা অল্প এবং গুণগত উৎকর্ষও প্রথম শ্রেণীর নয়।

'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদগুলির মধ্য দিয়ে কবি সমাজের দুঃখদীর্ণ জীবনের আর্তিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'মা আমায় ঘুরাবি কত' কিংবা এখন সন্ধ্যেবেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল' ইত্যাদি চরণে হৃদয়ের আর্তি ও ভক্ত কবির ঐকান্তিক আকূতি প্রকাশ পেয়েছে।

সাধনরীতি-সংক্রান্ত কবিতাগুলির শিল্পরূপ তেমন নাই। তবে তত্ত্বভাবনা ও ভক্তিসাধনার বিষয় রূপকের মধ্য দিয়ে কবি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তৎকালীন সমাজচিত্র জীবন্তভাবে প্রকাশ পেলেও কাব্য কৃতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত শ্যামারূপ চিত্রণে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিত্ব শক্তি ও সাধন-ঐশ্বর্যের নিবিড় প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভক্তিরস সৃজন করেছেন কবি। উদাহরণ—

"ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।।"

সংসার জ্বালায় জর্জরিত কবিকণ্ঠে বেদনমথিত বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

"আমি কি দুখেরে ডরাই।
তবে দাও মা দুঃখ আর কত চাই।।
আগে-পাছে দুখ চলে মা যদি কোনখানেতে যাই
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।"

রামপ্রসাদের প্রকাশরীতি সহজ-সরল-হৃদয়স্পর্শী। ভাবসমৃদ্ধ সরল বাচনভঙ্গীই রামপ্রসাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন—

"মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।।"

শ্যামার সঙ্গে ভক্ত কবির মা-ছেলের সম্পর্ক। মান-অভিমান কটুকথার মধ্য দিয়ে তাঁর কোনো কোনো পদ আমাদের একান্ত সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ঘুড়ি, কলুর বলদ, কলুর ঘানি ও চাষাবাদ ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত জিনিসগুলি রূপকের মধ্যে এনে ভক্তিরস সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম-বাংলার কথ্যরীতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ডিক্রি, ডিসমিস, আসামি ও নিলাম ইত্যাদি ইংরেজি ফারসি শব্দের সংযোজন করেছেন। রামপ্রসাদের বহু পদ প্রবাদ বাক্যের মতো দেশবাসীর কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হয়। দৃষ্টান্ত—

"রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধুমত্ত হলি বিষয় রসে।।"

কিংবা—

"মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা— যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।"

শাক্ততত্ত্ব সাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিশিয়ে সহজ-সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় রচিত রামপ্রসাদের গানগুলি আজও আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধভাবে তন্ময় করে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— "তাঁর (রামপ্রসাদের) গানগুলি উদার আকাশের মতো বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ-বিদ্বেষ দুর করে দেয়। বাঙালির হৃদয়ে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে।"

কমলাকান্ত চক্রবর্তী ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি হলেন কমলাকান্ত চক্রবর্তী। তিনি বর্ধমান

জেলার কালনা মহকুমার অম্বিকা-নগরবাসী ছিলেন। কবি নিজে ছিলেন ভক্ত সাধক। রামপ্রসাদের কবিতার প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হলেও তাঁর পদগুলিতে গভীর আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর অলৌকিক জীবনকথা রামপ্রসাদের মতোই সমাজজীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাল্যকালে টোলে পড়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। মাতুলালয়ে চলে আসার পর তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে সভা-পণ্ডিত করেন। তাঁর জীবনের সন-তারিখাদি সঠিক পাওয়া না গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্র-সাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। এতে কবির সামান্য আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি তন্ত্র-সাধনামূলক হলেও তত্ত্বের আড়ালে-আবডালে কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধন-ভজন করতেন, টোল খুলে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা পড়াতেন এবং সময়-সুযোগে শ্যামাসংগীত রচনা করতেন। বস্তুত শ্যামাসংগীত রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবি-প্রতিভা ঃ কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশ পদ আছে। শাক্ত পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে 'আগমনী ও বিজয়া' অংশের গানগুলিই কবিকে অমর করে রেখেছে। এ অংশে কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনাদগ্ধ মা-মেনকার হৃদ্‌বেদনা কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বিজয়া' অংশে আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় কবি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। দৃষ্টান্ত—

"ফিরে চাওগো উমা তোমার বিধুমুখো হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাওগো।"

স্নেহবিহ্বল বাঙালি মাতৃ হৃদয়ের ছবি মানবিক মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। রামপ্রসাদের প্রভাবে প্রভাবিত কবিতার নমুনা—

"কালী সব ঘুচালী লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন রাখবি কিনা রাখবি সেটা।।"

কমলাকান্তের সংগীতের ভাষা ও বিন্যাসরীতি পরিচ্ছন্ন—সংহত। জগজ্জননীর স্বরূপ এবং কবির অনুভূতি সঞ্জাত গানগুলিও অনবদ্য। যেমন—

"শুকনো তরু মুঞ্জরে ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবনতলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকলে গাছে।।" অথবা,
"তাই শ্যামারূপ ভালবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।।"

আবেগ, কল্পনা-রচনারীতির সঙ্গে ভক্তিরসধারা একাকার হয়ে কমলাকান্তের বহু সংগীত কাব্যগুণে উন্নত হয়েছে।

শাক্ত পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র, রামদুলাল, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, দাশরথি রায় কিছু কিছু শাক্তপদ লিখেছেন।—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাব্যধারার রেশ দেখা যায়। মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসংগীতগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাউল গান ঃ সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'বাউল'। বাউল সম্প্রদায় ভাবমগ্ন মানুষ। তাঁরা গুরুবাদী। বাউল গানে জাতিগত ভেদাভেদশূন্য অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ঝরণাধারা দেখা যায়। বাউল গানের জগতে

উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন—**লালন ফকির**। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১১৬ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতের পরম মুগ্ধ ভক্ত। তিনিই প্রথম লালনের সংগীত প্রকাশ করেন। এখনও বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া অঞ্চল জুড়ে তাঁর বহু হিন্দু-মুসলমান ভক্ত আছেন। হিন্দুর সন্তান বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গীদল দ্বারা পরিত্যক্ত হন। সিরাজ তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে এসে সুস্থ করেন এবং বাউলধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁর স্ত্রী—মুসলমান ঘরে স্বামী ছিলেন বলে তাকে পরিত্যাগ করেন। সংসারমুক্ত লালন বাউল সংগীতের কর্ণধার হয়ে গ্রামে গ্রামে সংগীত গেয়ে বেড়ান। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাকে বিয়ে করে একই সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম ও সাধনকর্ম করতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লালনের ২০টি গান প্রকাশ করেন। বর্তমানে তাঁর ২০১ টি সংগীত গবেষক, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর আরও সংগীতের অনুসন্ধান চলছে।

তত্ত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে লালন তাঁর গানে মানবিক আবেদনকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবিত্ব ও ধর্মভাবের সমন্বয়ে তাঁর গানগুলি অপরিসীম সাহিত্যমূল্যের অধিকারী। মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসায় তাঁর গানগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে। যেমন—

"মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।"

জাত-পাতের সংকীর্ণ ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে কবির গানে কাব্যিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।"
লালনের—'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।'
"সামাল সামাল তরী, ভব-নদীর তুফান ভারী।।"

ইত্যাদি গানগুলি যেমন ভাবতন্ময়তার স্বর্ণ-ফসল, তেমনি কবিত্বশক্তির দ্যোতক। লালন রূপক প্রয়োগে সার্থক। তাঁর গানে মাটির ভাষার সঙ্গে ফারসি শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে নূতন ভাষার সৃষ্টি করেছে। প্রাণের সজীব স্পর্শ তাঁর সংগীতে লিরিক মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছে।

গাথা সাহিত্য ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কাব্যরূপে গাথা-গীতিকা—ঐতিহাসিক ছড়া ও কাব্য পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার, শোষণ, শায়েস্তা খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁর জমিদারদের ওপর অত্যাচার, সিরাজ ও মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে বহু ছড়া রচিত হয়। তবে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, বন্যা, কোম্পানির অত্যাচার-কেন্দ্রিক ছড়াগুলি জনপ্রিয় ছিল।

ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে 'রাজমালা' ও 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি দীনেশচন্দ্র সেন প্রচারিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'—বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী গীতিকা সংকলন। গীতিকাগুলি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না, তবে রচনাগুলির মধ্যে গোষ্ঠী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনা, লোকাচার-দেশাচারের পরিচয় আছে। ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আখ্যায়িকাগুলি নর-নারীর ব্যর্থ প্রেমের আত্মত্যাগ ও অশ্রু-বেদনায় উজ্জ্বল। এগুলি প্রধানত লৌকিক-প্রণয়, ইতিহাসনির্ভর রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানমূলক রচনা। এতে প্রেমের আবেগ যেমন আছে, তেমনি প্রেমের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয়ও আছে। সর্বোপরি মানবিক আবেদনে গীতিকাগুলি অসামান্য সৃষ্টি হিসেবে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নব-গঠিত কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠে রাজার দল।' অর্থাৎ কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের রুচি নিম্নগামী হয়। এই বিশেষ সমাজে এক ধরনের গীতিবাদ্য—যাত্রা-পাঁচালী সমাদৃত হয়। এদের বিশেষ রুচির উপযোগী কবিগান, টপ্পা, যাত্রা-পাঁচালী রচিত হতে থাকে। এই কবিওয়ালারা শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত না হলেও স্বভাব-কবিশক্তি বলে মুখে মুখে রচনা করে আসর মাতিয়ে রাখত। 'চাপান' ও 'উতরে'র মাধ্যমে কবিগান গীত হত। স্থূল অমোদ-প্রমোদের খোরাকরূপে দাঁড়াকবি, হাফ-আখড়াই, তর্জা ইত্যাদি দেখা দিল। এই সব গানের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অশিষ্ট ও গ্রাম্য স্থূলরসে পূর্ণ।

নিতাই, বৈরাগী, নীলমণি পাটনী, ভোলা ময়রা, কেষ্টা মুচি, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রমুখ কবিওয়ালারা বাজার মাৎ করেন। তবে কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসু, হরু ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ কিছুটা উচ্চমানের ছিলেন। রাম বসুর 'সখীসংবাদ' ও 'বিরহসঙ্গীত' এর দৃষ্টান্ত। নিম্নে প্রাচীন কবিওয়ালা গোঁজলাগুই-এর কবিসংগীতের নমুনা দেওয়া হ'লো।

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী, আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতন মণি।"

এর পাশাপাশি গীতিমূর্ছনায় নায়িকার হৃদয়-বেদনা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন রাম বসু।

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি-ছি ধরো না।"

যাত্রাগানে কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্যমঙ্গল বেশ জম-জমাটভাবে বিকশিত হয়েছিল। টপ্পাগানের জগতে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালীমির্জার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দাশরথি রায়ের পাঁচালীও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ মুহূর্তে সন্ধিলগ্নের কবি ঈশ্বর গুপ্ত।—তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে বাংলা সাহিত্যে নূতন স্রোতধারার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে আছে।

9.10 সারাংশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শাক্ত-গীতি কবিতার সৃষ্টি হয়। সমকালীন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় আত্মমুক্তির তাগিদে—বিভেদকামী সমাজে সমন্বয় আনতে, দিশেহারা জাতীয় জীবনে শক্তি, শান্তি ও স্বস্তি আনতে শাক্ত কবিগণ 'কালভয়হারিণী' 'পরম করুণাময়ী' মায়ের অভয় চরণে আশ্রয় নিলেন। ভক্ত সন্তানদের আর্তি ও প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে শাক্ত পদাবলিতে। বৈষ্ণব পদাবলি, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনসংগীত, তান্ত্রিক তত্ত্ব ও সাধনা, শিব-দুর্গাকেন্দ্রিক পৌরাণিক ও মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলেই শাক্ত পদাবলির সৃষ্টি। উমাসংগীত ও শ্যামাসংগীত এই দুই প্রধান শ্রেণীর পদগুলিই সমাজজীবনকে আন্দোলিত করেছিল। শাক্ত

পদাবলির অমর স্রষ্টা হলেন রামপ্রসাদ সেন কমলাকান্ত চক্রবর্তী। দুই কবিই গৃহী-মানুষ হয়েও হয়েছেন সমাজ-জীবনের শরিক। বিদ্যাসুন্দরের স্রষ্টা রামপ্রসাদ শাক্তসংগীতের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনশ'র ওপর গান রচনা করে কবি নিরাবরণ-নিরাভরণ প্রাণের বাণী যেভাবে শুনিয়েছেন—তা হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। তাঁর সংগীতে অধ্যাত্মবাদের চেয়ে ধূলি-ধূসরিত বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বলতে গেলে অধ্যাত্মসাধনা, বাস্তবতা ও কাব্যরসের মিশ্রণে তাঁর সৃষ্টি কালজয়ী হয়েছে। কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক হয়েও শাক্তসংগীত রচনায় রেখে গেছেন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর ভণিতায় প্রায় তিন'শ পদ পাওয়া যায়। রূপকের মোড়কে, মার্জিত বিন্যাসরীতিতে রচিত তাঁর সংগীতগুলি হয়েছে গাঢ়বদ্ধ। রামপ্রসাদের মতই কমলাকান্তের লেখাতেও আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির মধ্যে সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। শাক্তগীতিধারার ঐতিহ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতেও প্রবাহমান। কাজী নজরুল ইসলাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রহস্যবাদী 'বাউল'-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব; গুরুনিষ্ঠ বাউলগণ মানবজীবন ও মানবদেহকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক-বাহক এই বাউল সম্প্রদায়। বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও বাউল সংগীতের রচনাকাররূপে লালন ফকিরের নামটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ভাবময়, মরমী বাউলসংগীত আজও প্রত্যেকের প্রাণে দোলা দেয় এবং মানবিক চেতনাবোধ জাগ্রত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু গীতিকা এবং ঐতিহাসিক ছড়া ও কাব্য রচিত হয়। কল্পনার জগৎ থেকে সরে এসে, সমকালীন যুগের প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত হয়েই অনেকে এই জাতীয় রচনায় হাত দেন। তবে প্রকৃত তথ্যনিষ্ঠা এ সব লেখায় তেমন নেই। ময়মনসিংহ, পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থদ্বয়, গীতিকার উজ্জ্বল নিদর্শন। রাজমালা, মহারাষ্ট্র পুরাণ দু'খানি কাব্য কিছুটা প্রশংসার দাবী রাখে।

কলকাতা নগরীর পত্তন। হঠাৎ ধনিক-বণিক সমাজের আবির্ভাব। তাদের রুচি মেটাতে নিম্নমানের কবিগান, যাত্রা টপ্পা, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির সৃষ্টি।—এর পরবর্তী সময়ে যুগসন্ধিকালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব—অতঃপর নবজাগরণে আন্দোলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ।

9.11 অনুশীলনী 3

নীচের সমস্ত প্রশ্ন একে একে উত্তর করুন। উত্তর শেষে 133 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন :

(ক) শাক্ত পদাবলির উদ্ভব— : 1. সপ্তদশ শতাব্দীতে
2. ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে
3. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

(খ) কমলাকান্ত ছিলেন— : 1. তন্ত্র সাধক
2. বৈষ্ণব সাধক
3. নাস্তিক

(গ) 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন— : 1. কমলাকান্ত
2. রামপ্রসাদ
3. লালন ফকির

(ঘ) 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' গানটির রচয়িতা— : 1. লালন ফকির
2. হরু ঠাকুর
3. রামপ্রসাদ

(ঙ) 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' হ'লো— : 1. গীতিকাব্য
2. ঐতিহাসিক কাব্য
3. মহাকাব্য

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) শাক্ততত্ত্ব কোনো ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে গড়ে ওঠেনি।	☐	☐
(খ) সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি।	☐	☐
(গ) কৃষ্ণরাম দাস অষ্টাদশ শতকের কবি।	☐	☐
(ঘ) 'আমি কি দুখেরে ডরাই'—পদ্যাংশটির রচয়িতা রামপ্রসাদ।	☐	☐
(ঙ) রামপ্রসাদের প্রকাশরীতি জটিল।	☐	☐
(চ) আধুনিক যুগের অন্যতম শ্যামাসংগীত রচয়িতা জীবনানন্দ দাস।	☐	☐
(ছ) এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী—যাত্রাগান করতেন।	☐	☐
(জ) 'মৈমনসিংহ গীতিকা' লোকসাহিত্য।	☐	☐
(ঝ) 'রাজমালা' পৌরাণিক কাব্য।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) অনেকের ধারণা রামপ্রসাদ__________মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন।

(খ) রাম প্রসাদের দুই ক্ষুদ্র কাব্য হলো __________ __________।

(গ) কমলাকান্ত প্রথম জীবনে __________ তন্ত্রসাধনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

(ঘ) দাশরথি রায় __________গানের জন্য বিখ্যাত।

(ঙ) গোঁজলাগুই ছিলেন _________ কবিওয়ালা।

(চ) রাম বসুর _________ ও _________ গান উচ্চমানের।

9.12 উত্তর সংকেত

9.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

2. (ক) শ্রীসুধর্মা, (থিরি-যু-ধম্মা), (খ) মিলনান্তক, (গ) ফারসি, (ঘ) বামন-নপুংসক।

3. (ক) বামন, (খ) রোমান্টিক প্রণয় কাব্য, (গ) ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ, (ঘ) বলিষ্ঠ, (ঙ) বাস্তবধর্মী।

9.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) – (1) তিন খণ্ডে, (খ) – (2) হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায়, (গ) – (3) কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের, (ঘ) – (3) অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ, (ঙ) – (2) ৪৮ বছর বয়সে।
2. (ক) ভুরশুট, পেঁড়ো, (খ) ইন্দ্রনারায়ণ, (গ) কালিকামঙ্গল, (ঘ) হীরা, (ঙ) ১৮৪৭ খ্রিঃ বিদ্যাসাগর।
3. (ক) (ভুল), (খ) (ঠিক), (গ) (ঠিক), (ঘ) (ভুল), (ঙ) (ঠিক)।

9.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) – (3) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, (খ) – (1) তন্ত্রসাধক, (গ) – (2) রামপ্রসাদ, (ঘ) – (1) লালন ফকির, (ঙ) – (2) ঐতিহাসিক কাব্য।
2. (ক) (ভুল), (খ) (ঠিক), (গ) (ভুল), (ঘ) (ঠিক), (ঙ) (ভুল), (চ) (ভুল), (ছ) (ঠিক), (জ) (ভুল)।
3. (ক) কৃষ্ণচন্দ্র রায়, (খ) কালীকীর্তন—কৃষ্ণকীর্তন, (গ) ‘সাধকরঞ্জন’, (ঘ) পাঁচালী, (ঙ) প্রাচীন, (চ) সখীসংবাদ-বিরহসংগীত।

9.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 10 ❑ আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্য

গঠন

10.1 উদ্দেশ্য
10.2 প্রস্তাবনা
10.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ মিশনারিদের অবদান
  10.3.1 ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
10.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
10.5 অনুশীলনী 1
10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
  10.6.1 সাময়িক পত্র ঃ পদ্যচর্চার বিকাশ
10.7 গদ্যশিল্পী ও গদ্যশিল্পের বিবর্তন
  10.7.1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)
  10.7.2 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)
  10.7.3 প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
  10.7.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)
  10.7.5 অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)
  10.7.6 দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়
  10.7.7 বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫)
10.8 গদ্য, প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা
10.9 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
10.10 অনুশীলনী 2
10.11 উত্তর সংকেত
10.12 গ্রন্থপঞ্জি

10.1 উদ্দেশ্য

ইতিহাস জিজ্ঞাসা সচেতন মনের পরিচায়ক। একটি জাতি—তার দেশ, দেশের ইতিহাস, সমাজ, মানুষের জীবনাচরণ, তার ভাষা, সাহিত্য লোকবিবরণ জানবার আগ্রহ থেকেই ইতিহাস রচনার সূচনা। জাতির জীবনভাবনার রূপ রূপান্তর সাহিত্য শিল্পীর মননে অনুভবে ধরা পড়ে। সে সম্পর্কে ধারণা দেবার অভিপ্রায় থেকেই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

তাই সাহিত্য-ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জাতিকে জানবার বিশেষ সুযোগ থাকে। আত্মান্বেষণের জন্য মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের গুরুত্ব অসীম। সেই বোধ থেকেই স্নাতকস্তরের ভাষার পাঠ পরিকল্পনায়

সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা মান্যতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পাঠ্য হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বসহকারে নির্বাচিত হয়েছে।

- এই অংশটি পাঠ করে আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সাধারণভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।
- আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা গদ্যের বিকাশ ও গদ্যে লেখা প্রথম পর্বের প্রধান বইগুলির পরিচয় হবে।
- এই জানা, বোঝা ও পরিচয় থেকে আপনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে ও লিখতে পারবেন।

10.2 প্রস্তাবনা

২৩শে জুন, ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার নবাবের পরাজয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হয়। পরিশেষে দেশ বিদেশীর পদানত হয়। ঠিক এর ৩ বৎসর পর (১৭৬০) অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু : বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগের সমাপ্তি।

এতদিন দেশের শাসকরা হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে ছিল ভারতবাসী। তাঁরা দেশের মানুষের শুভাশুভ, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার যাঁরা শাসকের আসনে এলেন, তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ দেশ পরিচালনার দিশারী হয়ে গেল। ইংরেজ অধিকার বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক বিনষ্টির ইতিহাস। এরই মধ্যে বাঙালির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জারকরসে বাঙালির চিত্তলোকের উদ্বোধনে, মননে-চিন্তনে ফল্গুধারার মত নূতন যুগের নূতন ভাবনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। ফলে, উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙালির মানসলোকে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার প্রতিফলন তার ধ্যান-ধারণা, জীবন-দর্শনে, সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ফলত, ইংরেজ বিজয়ে বাংলাদেশ ও তার সাহিত্য মধ্যযুগের অবসানে নব্যযুগের অবসানে নব্যযুগে পৌঁছল। এ হল অন্তহীন কালপ্রবাহে নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ত অগ্রসর হওয়া।

নবাবের পতনে ইংরেজাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ঔপনিবেশিক শোষণ, সমাজের সর্বস্তরে অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, ভূমিব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দেশে মধ্যস্বত্বভোগী নতুন জমিদার, ইজারাদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ফলে, প্রজার ভূমিস্বত্ব বিলোপ পেল। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন ধরল। দেশজ সনাতনী শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হ'লেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও নতুন শিল্প গড়ে তোলা হ'ল না। এদেশ বিলিতি পণ্যের বাজারে পরিণত হ'ল।

ফলত, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় বাঙালির মনে ও মননে ভৌম চেতনা সঞ্চারিত হয়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী প্রথাসিদ্ধ গীতিধর্মিতার অন্তঃসলিলা ধারাটিও সমানভাবে এ সময় বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নতুনতর ভূমিব্যবস্থার অভিঘাতে এতদিনকার গ্রামীণ সংস্কৃতির পোষক-বাহক স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্টপোষণার অভাবে লোকায়ত কবি-শিল্পীরা বৃত্তি হারিয়ে শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হ'লেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতি সর্বত্র নতুন চেতনার প্রবল আঘাত, সংঘাত জাতির জীবনে যে অনুভবের সঞ্চার করে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন তাতে সমিধ

জোগায় আর তারই পরিণতিতে আধুনিক জীবনবোধের উদ্বোধন ঘটে। বাঙালির জীবন-ভাবনায় আধুনিক শিক্ষাজাত যুক্তিবাদ, মানবহিতবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারী চেতনা এবং স্বাদেশিকতার পাশাপাশি রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বাস্তব বোধজাত কতকগুলি ধারণা জন্মে; পরিণতিতে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের চিন্তাগুলি বাঙালির একাংশকে সক্রিয় করে তোলে। মিশনারি সিভিলিয়ানদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ অতিক্রম করে বাঙালি তার মানসমুক্তির কারণেই নিজের উপলব্ধিকে সকলের বোধগম্য করে ব্যক্ত করবার জন্য দৈনন্দিন জীবনের ভাষা—বাংলা গদ্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। দোম আন্তোনিও মনোএল, কেরি, মার্শম্যানের গদ্য চর্চা থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা তাই স্বরূপে স্বতন্ত্র। শেষোক্ত গদ্য লেখকরা লোক সংস্কার থেকে চেতনার মুক্তি ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার পর সাহিত্য ও শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী অংশে এর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হবে।

10.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ মিশনারিদের অবদান

বাংলা গদ্যচর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জগৎ-জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনার ফল। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপাদান উপস্থাপনা দেবমাতৃকার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এবং অপৌরুষেয়তা আরোপের ফলে দৈবীভাষা হিসেবে পদ্যের বহুল ব্যবহার ছিল। পদ্য ছিল সেদিনের আবেগের ভাবপ্রকাশের ভাষা। বিচার বিশ্লেষণের কাজটি চলত পর্যায়ের ব্যবহারে, তার স্থিতিস্থাপকতার গুণে। কিন্তু য়ুরোপের অভিঘাতে সমাজজীবনের ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন; মানববোধ, ভৌমচেতনা, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যিক গদ্য ভাষার প্রয়োজনবোধ প্রবল হয়ে উঠল। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গদ্য অপরিহার্য হ'ল। সাহিত্যও হয়ে উঠল বহুমুখী ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন। গদ্যচর্চায় ইংরেজ সংস্পর্শ যেমন বাঙালির চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি একাধিক খ্রিস্টিয় মিশনারির অবদানও এ ক্ষেত্রে কম নয়। এদের রচনায় চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব ও এলোমেলো বিন্যাসের বাহুল্য থাকায় গদ্যের শৈশব উত্তাল হতে পারেনি।

এই গদ্যশিল্প ও সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় নেবার পূর্বে পূর্বসংস্কারটির কিছু সন্ধান নেওয়া দরকার। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্য ছিল অনেকটা ব্রাত্য। এর ব্যবহার হোত সহজিয়া বৈষ্ণব কড়চায় আইন-আদালতে, দলিল-দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে। এ সময়ে রচিত "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি", 'দেহ-কড়চা', চুক্তি অভিযোগ, আত্মবিক্রয় পত্রাদিতে ব্যবহৃত ভাষা একদিকে ক্রিয়াকর্ম বর্জিত, কাটাকাটা, ভাঙাভাঙা, অপরদিকে ইসলামি শব্দ, আরবি-ফার্সির বাহুল্য—গদ্যের স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ধর্ম প্রচারের তাড়নায় বিদেশী মিশনারিদের গদ্যগ্রন্থগুলিও এ ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি।

প্রসঙ্গক্রমে পর্তুগীজ মিশনারিদের তিনটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বইগুলি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে রোমান ক্যাথলিক পাদরিদের দ্বারা রচিত। দেশীয় ভাষা ব্যতিরেকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে খ্রিস্টের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে দোম আন্তোনিও রোজারিও 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', এবং 'মনোএল-দা আসসুম্পসা' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth Bhed) এবং বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। প্রথমটির পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলেও কোনো মুদ্রিতরূপ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। দোম আন্তোনিও-র পুস্তিকাটির মুল লক্ষ্য হিন্দুধর্মের অসারতা এবং খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। এজন্য তিনি

বৈষ্ণব কড়চার ঢঙে পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আন্তোনিও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান বলে হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে জানতেন, তাই তাঁর গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তীব্র আক্রমণ আছে। মনোএল-এর গ্রন্থদুটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। তখনও বাংলা হরফে ছাপার এদেশে বা অন্যত্র কোনো অবকাশ ছিল না। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারার্থে মিশনারিরা বাংলা ভাষা শিখে এ দেশবাসীর বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায়ে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন। বইটির প্রথমাংশে বাংলা ব্যাকরণের শব্দ, ধাতু, অব্যয়, বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে বহু বাংলা পর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ করেছেন। মনোএল পর্তুগীজ ধর্মযাজক; তাঁর বাংলা ভাষায় অবাঙালিসুলভ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ক্ষেত্রবিশেষে দোম-আন্তোনিয়র থেকে তাঁর রচনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ কথোপকথনের ঢঙে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিতর্কাশ্রয়ী রচনা। মনোএল-র রচনা সাধুভাষার ধাঁচে গড়া। তাঁর পদবিন্যাস ও বাক্য গঠনে সাধুভাষার মত সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আন্তোনিয়র রচনা—গুরু—"অনেক লোক প্রতিদিনে একবার মালা জপে, ইহার কারণ কি?"—শিষ্য—"কারণ এহি, বিনে ভক্তিতে জপে। ভক্তিতে যে জপে, সেই যেমন ধ্যান তেমত লাভ পাইবে।"

পর্তুগীজ মিশনারিরা ধর্মান্তরীকরণের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন কিন্তু পলাশীর পর, বিশেষত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানির পর, ইংরেজ বণিক ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুভব করেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ও প্রশাসনের স্বার্থেই দেশীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক আর এ জন্য দরকার গদ্যের অনুশীলন। এই উদ্যোগের পেছনে যেহেতু কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়নি, তাই বঙ্গ জনসমাজ এ ধরনের গদ্য চর্চায় অনেকটা পৃষ্ঠপোষণাও করেছে। ১৭৭৪ সালে এ দেশে বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনে ইংরেজি আইনের বঙ্গানুবাদ করা হয়। হ্যালহেড বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য Grammar of the Bengali Language (১৭৭৮) প্রকাশ করেন। বইটি বৈয়াকরণের দৃষ্টি দিয়ে লেখা। বইটি ইংরেজিতে রচনা করলেও কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র থেকে প্রচুর উদাহরণসহ প্রথম ছেনিকাটা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়। এ বইতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এ সময় কতকগুলি আইনের বই ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়, যেমন—ইম্পেকোড (১৭৮৫), বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারি কার্যবিধি (১৭৯১) কর্ণওয়ালিস কোড (১৭৯৩) প্রভৃতি। এই বইগুলির সাহিত্য মূল্য উল্লেখযোগ্য না হলেও বাঙালির ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলকাতায় খ্রিস্টিয় যাজকদের মিশন স্থাপন ও ধর্মপ্রচারে বাধা দেওয়া হয়, তাই কেরি ও তাঁর সহকর্মীরা দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মিশন প্রতিষ্ঠা করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারার্থে বাইবেলসহ অন্যান্য প্রচার গ্রন্থ বাংলায় রচনা করেন। কেরি অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' (St. Mathers Gospel) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে নিউ টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ ও ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশত মুদ্রিত হয়। পরে সমগ্র গ্রন্থ ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপুস্তক নামে প্রকাশিত হয়। বাইবেলের প্রথমদিকের অনুবাদের ভাষা ছিল জড় এবং কৃত্রিম। স্বভাবত আক্ষরিক অনুবাদের জন্য এমনটি ঘটেছে। ফলে বাক্যবিন্যাস ও পদান্বয়ে উগ্র ফিরিঙ্গীয়ানা আছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীরামপুর মিশন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতসহ কতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা এবং ব্যাকরণ অভিধান সাময়িক পত্র প্রকাশ করে বাংলার সারস্বত সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

10.3.1 ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলাদেশে দেওয়ানি পাওয়ার পর ভারতব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙক্ষায় ইংরেজ এ দেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা-ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। স্বল্পশিক্ষিত বিদেশী বিভাষী যে সমস্ত সিবিলিয়ান এ দেশে ব্যবসা বা প্রশাসনের পরিচালনার জন্য আসেন, তাঁদের শিক্ষার জন্য ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (৪ঠা মে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের কাজ ছিল ইংলন্ড-আগত তরুণ সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা। এ কাজে কেরির সঠিক উদ্যোগে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ খুবই সক্রিয় ছিল। ১৮৫৪-তে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নে এই কলেজের অবদান উল্লেখযোগ্য। সিবিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা শেখাবার দায়িত্ব উইলিয়ম কেরির ওপর ন্যস্ত হলে তিনি কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। কলেজের ভাষাপাঠের সামগ্রিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও শিক্ষক নিয়োগে তাঁর মনস্বীতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য তিনি মালদহ, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী থেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ফারসিনবীশ মুন্‌শী নিয়োগে উদ্যোগী হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কলেজ স্থাপনের একবছরের মধ্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ভাবে কেরির প্রেরণায় বাংলা গদ্যের অনেক লেখক তৈরি হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের উৎকর্ষেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

কেরি লক্ষ করেছিলেন, এ দেশে তৎকালে প্রচলিত কাব্য বা সাহিত্য, সিবিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে আদৌ কার্যকরী নয়। তাই তিনি ভাষাবৈচিত্র্য ও সরস উপস্থাপনার কথা মনে রেখে গ্রন্থ পরিকল্পনা করেন। তদনুসারে কেরি স্বয়ং ও সহযোগী পণ্ডিত মুন্‌শীদের গদ্যগ্রন্থ রচনা ও অনুবাদে উৎসাহিত করলেন। ফলশ্রুতিতে কেরির বাংলা শিক্ষক মুন্‌শী রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা', (১৮০২) স্বয়ং কেরি 'কথোপকথন' (১৮০১), 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮)—দুটি অনুবাদ এবং 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (রচনা 1813, প্রকাশ ১৮৩৩)—দুটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপ ফেব্‌ল্‌সের' অনুবাদ 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর ফারসি তুতিনামার অনুবাদ 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক রচনা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পৌরাণিক রচনা 'পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮১২) উল্লেখ্য প্রকাশন। গোলোকনাথ শর্মা কলেজের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তার বই 'হিতোপদেশ' (১৮০২) কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত ও কলেজ পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। সিবিলিয়ান পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পাঠ্য তালিকা বিশ্লেষণ করলে কেরির ভাষা-সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে ধ্যানধারণাটি স্পষ্ট হবে। কেরি বুঝেছিলেন কোনো ভাষা শেখাতে হলে সেই ভাষার বাচনভঙ্গী, গঠন-রীতি, যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয় এবং দেশীয় ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে সেদিকেও নজর রাখতে হবে, তাই কেরিপরিকল্পিত গ্রন্থের মধ্যে—(১) আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্যযুক্ত বাক্যবিন্যাসের ইসলামিক গদ্য, (২) চলিত কথোপকথনের গদ্য (এর বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত, দ্রুত এবং প্রায়শ,

একই শব্দের বারবার প্রয়োগযুক্ত), (৩) কথকতাসুলভ বর্ণনামূলক গদ্য (এটি সাধারণত একটি সুনির্দিষ্ট বনিয়াদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, এর ভাষা কখনও লঘু, কখনও দ্রুতসঞ্চারী), তেমনি (৪) কিছু সংস্কৃত প্রভাবিত গুরুগম্ভীর সাধু ভাষায় রচিত গ্রন্থও আছে।

প্রকাশিত বইয়ের শ্রেণীবিন্যাস নীচে দেওয়া হল :

গ্রন্থ ও ভাষাবৈশিষ্ট্য

ইসলামি শব্দবহন বাক্যবিন্যাস	চলিত কথোপকথনের ভাষা	কথকতা সুলভ বর্ণনামূলক ভাষা	সংস্কৃতাশ্রয়ী গুরুগম্ভীর সাধুভাষা
১। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১। কথোপকথন (মৌলিক রচনা)	১। লিপিমালা	১। প্রবোধ চন্দ্রিকা
২। কথোপকথন (খানসামা, খেদমোদগার মশালচি, হুকাবরদার)	২। প্রবোধচন্দ্রিকা (সংলাপ অংশ)	২। বত্রিশসিংহাসন	২। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট
৩। রাজাবলী (জিম্মা, কিল্লা, দখল জবান, ওয়গয়রহ্)		৩। ইতিহাসমালা	৩। পুরুষ পরীক্ষা।

কেরি পরিকল্পিত বইগুলিকে আবার মৌলিক অনুবাদ হিসেবে বিভাজন করলে দেখা যাবে তা ছিল খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। মৌলিক গ্রন্থগুলি আবার ভাষা ও লিপিশিক্ষা; জীবনী, ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন; অনুবাদ— ইংরেজি, সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী থেকে অনুবাদ, বস্তুত গদ্য রচনার প্রথমযুগ থেকেই বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল অনন্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিন জন প্রধান গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে গেলে কেরির বাংলা ভাষা শিক্ষক ফারসিনবিশ মুন্সী রামরাম বসুর কথা বলতে হয়। তিনি শ্রীরামপুর থেকেই কেরির ঘনিষ্ঠ। সেখানে কেরির ঘনিষ্ঠ হিসেবে মিশন প্রকাশিত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি কেরির সহযোগী হিসেবে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এ যুগে তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০৩)। বাঙালি রচিত বাংলা ভাষার ও বাঙালির মুদ্রিত এবং প্রকাশিত প্রথম বই। এটি মৌলিক রচনা এবং প্রথম রচিত ঐতিহাসিক জীবনীর নিদর্শন। এই বইটিতে সংস্কৃত-ফারসি-আরবি-বাংলা শব্দ যেমন, তেমনভাবে পদ বাক্য বিন্যাসে চরম অমনোযোগের পরিচয় আছে। এ কথা ঠিক তখন গদ্যের কোনো আদর্শ সামনে ছিল না। রামরাম সে পথে বিচরণে প্রয়াসীও হয়নি। তাঁর গদ্যে সৃষ্টিশক্তি বা শৃঙ্খলার পরিচয় নেই।

রামরামের অপর বই লিপিমালা (১৮০২) চল্লিশটি চিঠির সংকলন। এক রাজার অন্য রাজাকে লেখা দশটি, রাজা কর্তৃক চাকরকে লেখা পাঁচটি ও অন্যান্য পঁচিশটি চিঠি আছে। চিঠিগুলির মাধ্যমে লেখক পুরাণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এ দিক থেকে রচনা রীতি মৌলিক। বইটি বিবরণধর্মী। ভাষা ফারসি বর্জিত অনেকটা সহজ ও সংযত।

কেরি 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা'র (১৮১২) গ্রন্থকার হিসেবে পরিচিত। কথোপকথনে পল্লীবাংলার কথ্যভাষা ও ইতর জনসাধারণের মুখের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানির কাজ পরিচালনার জন্য জনসংযোগ জরুরি, তাই ইংরেজ সিবিলিয়ানদের কাজ চালাবার উপযোগী আলাপচারিতার ভাষা, চলিত কথোপকথনের ভাষা শেখাবার জন্যই মনে হয় কথোপকথনের পরিকল্পনা। বইয়ের একত্রিশটি অধ্যায়ে মজুর, ঘটক, মেয়েলি কথোপকথন, মেয়ে-কোন্দল, মেয়েদের হাট করা, জমিদার-রায়ত প্রভৃতি প্রতিদিনের দিন-যাপনে যে মানুষগুলির সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়, তাদের কথোপকথন সংকলন করা হয়েছে। ফলে এর মধ্যে সমাজের জীবন্ত মানুষগুলোর একটি বাস্তব ছবি, অনেকটা তাদেরই কথ্যভাষায় ফুটে উঠেছে।

যেমন, "আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।
ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
আমরা মাচ আর কলাইর ডাল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।"
(স্ত্রীলোকের কথোপকথন)

বইটির মধ্যে বাংলা প্রবাদ প্রবচন, হাস্যপরিহাস, গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ, মেয়েলি কোন্দল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এগুলি ধর্মপ্রচারক কেরির জনজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। অনেকে অবশ্য মনে করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই ভাষাগ্রন্থের রচয়িতা। বইটি যদি কেরির নিজের রচনা নাও হয়, তথাপি এর পরিকল্পনায়, ভাষা ও বিষয় সম্পর্কে যে মনস্বীতার পরিচয় আছে, তাও একজন বিদেশী পাদরির পক্ষে বিস্ময়ের। 'ইতিহাসমালা' ইতিহাসের বই নয়, দেশী-বিদেশী 14টি গল্পের সমষ্টি। ভাষা পরিচ্ছন্ন। এগারো বছরে গদ্যরূপের যে বিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় আছে। সম্ভবত বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম গল্প বলার গৌরব কেরিরই প্রাপ্য।

কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বইয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩, প্রকাশ, ১৮৩৩) ছাড়াও রামমোহনের ব্যাকরণ' তাঁর শিল্পীসত্তা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ভাষা সংস্কৃতানুসারী হলেও আড়ষ্ট নয়। বরং সংস্কৃতের প্রভাবে গুরুগম্ভীর সাধুভাষা রীতির একটি ছাঁদ গড়ে দিয়েছে। 'রাজাবলি' সংস্কৃত থেকে অনুবাদ অনুসরণে রচিত। ভারতবর্ষের রাজা ও রাজবংশের এক ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। বইটিতে পৌরাণিক থেকে ইতিহাসের মধ্যযুগের সুলতান বাদশাদের কথা, শেষে কোম্পানির কাজের সংক্ষিপ্ত কাহিনী আছে। ভাষা সংস্কৃতবহুল হলেও, স্থানে স্থানে 'যাবনী মিশাল' আছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভার স্মারক। রচনা ও প্রকাশের মধ্যে ২০ বছরের ব্যবধান। লেখক বইটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ থেকে উপাখ্যান ও রচনারীতি সংগ্রহ যেমন করেছেন, তেমনি লৌকিক কাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টিরূপে পরিগণিত। তাঁর রচনায় কলেজে অনুসৃত চলিত-কথ্য-সাধু সংস্কৃতানুসারী সবকটি গদ্যরীতির প্রয়োগ আছে। কথ্যরীতির বাস্তব ভিত্তিটি মেনে নিলেও সাধু গদ্যরীতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। সেই পথ ধরেই বিদ্যাসাগরের পর সাধুরীতি অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের কথ্যরীতির গদ্যের উদাহরণ : "মোরা চাষ করিব ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অল্প করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুলি পুষিব।...শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।"

10.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

নবাবি আমলের অবসানে ইংরেজ অধিকারের ফলে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায়, নূতন সমাজ-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এ দেশের শাসককুলের প্রয়োজনে অর্থকরী ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটল। দেশী ও বিদেশী ভাবধারার দ্বন্দ্বে-সংঘাতে ধর্মসংস্কার স্বদেশচেতনার মধ্য দিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে লাগল। ফলে বাঙালির জীবনবোধেরও পরিবর্তন ঘটল। সাংস্কৃতিক চেতনায় নূতন বোধ সঞ্চারের ফলে বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার হোল। এ সময়ে সাহিত্যে বস্তুজগত ও মানুষ প্রাধান্য পেল। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে গদ্যভাষা ও সাহিত্যিক গদ্যরীতির উদ্ভব ঘটল। গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ গদ্যে অনুবাদ প্রকাশের তাগিদে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত।

10.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে 155 পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :
   - (ক) সাহিত্য ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে ....জানবার বিশেষ......................থাকে।
   - (খ) অন্নদামঙ্গলের কবি...................... মৃত্যু, বাংলা সাহিত্যেও....................সমাপ্তি।
   - (গ) দোম আন্তোনিও রচিত গ্রন্থের নাম.................।
   - (ঘ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থের রচয়িতা.....................।
   - (ঙ) হ্যালহেডের বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচিত হয়.................... খ্রিস্টাব্দে।
   - (চ) কেরি অনূদিত প্রথম বই..।
   - (ছ) কেরির ভাষা শিক্ষকের নাম.................।
   - (জ) রামরামের বই.....................40টি চিঠির সংকলন।
2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।
   - (ক) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু : (1) ১৭৫৭ (2) ১৭৫০ (3) ১৮৬০
   - (খ) শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা : (1) ১৮০০ (2) ১৮০১ (3) ১৭৬০
   - (গ) কেরির কথোপকথন প্রকাশিত হয় : (1) ১৮১২ (2) ১৮০১ (3) ১৮০০
   - (ঘ) রামরাম বসুর লিপিমালার প্রকাশ : (1) ১৮০২ (2) ১৮০১ (3) ১৮০৬
   - (ঙ) প্রবোধচন্দ্রিকার রচয়িতা : (1) উইলিয়ম কেরি, (2) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (3) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
3. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।
   - (ক) কেরির কথোপকথনের ভাষা : 1. কথ্যরীতির (2) ইসলামি গদ্যরীতির (3) সংস্কৃত প্রভাবিত

(খ) মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষপাত ছিল : (1) কথ্যরীতির প্রতি (2) সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতির প্রতি (3) সাহিত্যিক চলিত ভাষার প্রতি।

4. (ক) শ্রীরামপুর মিশনে থাকাকালীন কেরি দুখানি বই অনুবাদ করেন।—বই দুটির নাম উল্লেখ করুন।

(খ) বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ রচয়িতা কে? বইটি কোন্ বছর প্রকাশিত হয়?

(গ) ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট কে রচনা করেন? প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

(ঘ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল। উদাহরণ দিন।

(ঙ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অন্তত দুটি 'হিতোপদেশ' অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক কে কে?

10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

10.6.1 সাময়িক পত্র ঃ গদ্যচর্চার বিকাশ

মার্সম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রথম বাংলা মাসিক দিগ্‌দর্শন এবং ঐ বছর মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। বাঙালি পরিচালিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' (সাপ্তাহিক) ১৮১৮ জুনে প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়। সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। মিশনারি পরিচালিত সাময়িক পত্র সমাচার দর্পণ 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' প্রকৃতপক্ষে ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ১৮১৯ সালে শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা আরও একটি বাংলা মাসিক পত্র 'গস্পেল ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। অল্প কিছুদিন চলেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই জুলাই 'সমাচার দর্পণ'-এ হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়। রামমোহন তার উত্তর পাঠান। 'দর্পণ' কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ না করায় তিনি শিবপ্রসাদ শর্মা নাম নিয়ে সেপ্টেম্বরে ১৮২১ দ্বিভাষিক পত্রিকা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করেন। পরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। এখানে খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান সব ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। রক্ষণশীল ভবানীচরণ অসন্তুষ্ট হয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (মার্চ ১৮২১) সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রে পরিণত হয়। রামমোহন ভবানীচরণের মতাদর্শগত বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক তাঁদের দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। সে সময় এ বাদানুবাদ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রামমোহনের যুক্তি ও বিশ্লেষণী শক্তির পাশাপাশি ভবানীচরণের সাংবাদিক নিষ্ঠা, রসজ্ঞ জীবনদৃষ্টি ও মননশীলতা তাদের আলোচনার প্রধান আকর্ষণ ছিল। অতঃপর প্রকাশিত দুটি পত্রিকা 'পশ্বাবলী' (ফেব্রুয়ারি ১৮২২) ও 'বঙ্গদূত' (মে ১৮২৯)-এর উল্লেখ করতে হয়। প্রথমোক্তটি পাদ্রী লসন সংকলিত পশুবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিক, সম্পাদনা করেন নীলরত্ন হালদার। রামমোহন, দ্বারকানাথ পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চারে এই পত্রিকার কিছু ভূমিকা আছে।

'সংবাদ প্রভাকর' (জানুয়ারি ১৮২৩) ঈশর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত। তাঁর সমকালে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জনপ্রিয়তার কারণে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ক্রমে সপ্তাহে তিনবার, পরে দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় 'প্রভাকরই' প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। পত্রিকাটি সাংবাদিকতার একটি মান তৈরি করেছে। এতে দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হোত। প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি তরুণ কবিদের পৃষ্ঠপোষণায় তাঁদের কবিতা ও সমকালের অনেক রচনা প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সমকালে বাংলা ভাষায় আরও কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রাচীনপন্থী 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (মার্চ, ১৮৩১)—সম্পাদক শেখ আলীমুল্লা—প্রথম মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ফারসি দ্বিভাষিক পত্রিকা। গুণমানে উল্লেখযোগ্য নয়। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (জুন ১৮৩১) ইংরেজি-শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়। 'বিজ্ঞান সেবধি' (এপ্রিল ১৮৩২)-তে ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরে প্রকাশ করা হোত। আগস্ট, ১৮৪৩-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানে "লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। বিজ্ঞান ও মানবিকীবিদ্যা চর্চার, বিশেষত অক্ষয়কুমারের দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চমানের প্রবন্ধ প্রকাশের সুবাদে পত্রিকাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িকের মর্যাদা পায়। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালির চিত্তলোকের উদ্বোধন এই পত্রিকার অন্যতম অবদান। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সচিত্র মাসিক—'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এতে পুরাবৃত্ত, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা, তীর্থ বৃত্তান্ত, জীবসংস্থান খাদ্যদ্রব্য, বাণিজ্যদ্রব্য, নীতিগর্ভ কাহিনী, নূতন বইয়ের সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হোত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (নভেম্বর, ১৮৫৮) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা হোত। সংবাদ প্রকাশে নির্ভীকতা, সংবাদ নির্বাচনে দক্ষতা এবং সংবাদ পরিবেশনে নৈপুণ্য—সাংবাদিকের এই গুণগুলি দ্বারকানাথের থাকায় 'সোমপ্রকাশ' একটি আদর্শ পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালাগালি করবার পূর্বতন ধারাটি বর্জন করে সংযত, রুচিসম্মত ভাষায় দ্বারকানাথ অন্যকে সমালোচনা করে সমাজ ও দেশের স্থায়ী কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন। সোমপ্রকাশের চোদ্দ বছর পর 'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল ১৮৭২) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করে নিয়েছিল বঙ্গদর্শন সাময়িক পত্রের জগতে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল। ধর্ম, তর্ক বা নূতন নূতন বিষয়ে অবতারণা ছাড়াও সাহিত্যের অনুশীলনেও যে সাময়িক সাংবাদপত্রের ভূমিকা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এ কথা কেউ তেমন উপলব্ধি করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তাঁর প্রতিভা বিকাশের যেমন পোষকতা করেছিল, তেমনি সাহিত্যক্ষুধা দূর করতে বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান পেল। পত্রিকার প্রয়োজনে, ভিন্নরুচি পাঠকের তৃপ্তি সাধনের প্রয়োজনে তিনি যেমন ইতিহাস, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিচিত্র ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন, তেমনি সমকালের বহু লেখককে অনুপ্রাণিতও করেছেন। ফলে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে মননশীল শক্তিশালী একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল।

10.7 গদ্য শিল্পী ও গদ্য শিল্পের বিবর্তন

রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) : রামমোহন ডিগবীর দেওয়ানি ছেড়ে কলকাতায় আসেন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রামমোহন এ সময় অভিজ্ঞতায়, বিদ্যায় বিত্তে সমৃদ্ধ। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত-ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। যুক্তিবাদী, শাস্ত্রজ্ঞানী এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক। দীর্ঘদিন ইংরেজ সাহচর্যে ও ইংরেজি জ্ঞানবিদ্যাচর্চার প্রভাবে এবং নূতন যুগধর্মের প্রেরণায় সুবেদী রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি ধারার স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ মানবাধিকারবোধ, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী ছিল সেদিন অনেকটা অভাবিত। রামমোহন এই আন্তরিক তাড়না থেকেই জাতির মানসমুক্তির বাসনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও ঐতিহ্যের সরণী দিয়ে খোলা হাওয়া বইয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ এই পনেরো বছরের মধ্যে অনুবাদ, টীকাভাষা, প্রচারপত্র, বিতর্কমূলক রচনাসহ ব্রহ্মসংগীত, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, গায়ত্রীয় অর্থ প্রভৃতি মিলিয়ে তিরিশটি বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ছাড়াও তাঁর ইংরেজিতে রচনার সম্ভারও খুব কম নয়। সর্বত্র তিনি ক্ষুরধার মনীষার পরিচয়বাহী যুক্তিপথ অনুসরণ করেছেন। কখনও বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেননি বরং বিরুদ্ধের কটূক্তির উত্তরে যুক্তি দিয়ে নিরসনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর রচনায় আশ্চর্য সংযম ও রুচিবোধের সঙ্গে স্মিত হাস্যরস বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহনের সমগ্র রচনাকে তিনটি ধারায় বিন্যস্ত করা যায়—অনুবাদ-ভাষ্য, বিতর্কমূলক ও মৌলিক। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫); ঈশ, কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষৎ অনুবাদ-ভাষ্য (১৮১৫-১৮১৯); অনেকটা বোধগম্য ও রচয়িতার মননশীলতার পরিচায়ক। যেমন, "প্রার্থনায় যে কর্মফল সে অনিত্য, আমি তাহা জানি। অনিত্য বস্তু যে কর্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মাতেই প্রাপ্ত হয়েন না।"—এর অনুবাদ মুলানুগ, যথাস্থানে যতি ব্যবহারে অর্থ বোধ হয়। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), সহমরণ-বিষয়ক, প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ (সহমরণ বিরোধী পুস্তিকা) ১৮১৮, ১৮১৯, কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) প্রকৃতি বিতর্কমূলক রচনায় তাঁর মনস্বীতার পরিচয় আছে। কোথাও কোথাও সংবেদনশীলতার কারণে তাঁর গদ্য হয়ে উঠেছে সুখপাঠ্য : "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?...আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮), 'ব্রহ্মসংগীত' (১৮২৮), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৮৩৩) প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ। প্রথম দুটি বেদান্ত ও উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে ব্রহ্মবাদ প্রচারার্থে রচিত। ব্রহ্মসংগীতের 'স্মরপরমেশ্বর অনাদ্দিকারণে" এবং "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর" প্রভৃতি গানে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত বৈরাগ্য ও বিশ্বের প্রতি বৈদান্তিক ঔদাসীন্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

রামমোহনই প্রথম বেদেশী-দেশী গদ্যকারদের গদ্য চর্চাকে ধর্মপ্রচার বা পাঠ্যবইয়ের সীমা থেকে বাহিরে নিয়ে এসেছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র "অনুষ্ঠান" বা ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে গদ্য লিখতে ও পড়তে হয়। তিনি গদ্যের শৈশবেই বেদান্ত উপনিষদ অনুবাদ করে, গদ্যরূপকে একটা শক্ত-ভিতে প্রতিষ্ঠা

দিয়েছিলেন। গুরুগম্ভীর বিষয় বাংলায় আলোচনা যে সম্ভব তা দেখিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর রচনা বিতর্কমূলক হওয়ায় সাবলীলতার অভাব ছিল। কৃত্রিম ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার পদস্থায় ও দূরান্বয়দোষ ও যতিপাতে শৃঙ্খলার অভাব এবং সংস্কৃতানুসারী সুদীর্ঘ জটিল বাক্য সর্বত্র সাবলীল ও স্বচ্ছন্দচারী হয়নি।

10.7.1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

রামমোহন সংস্কৃতপ্রভাবিত গদ্যরচনার যে ধারা সূচনা করেছেন, সেই পথেই ঈশ্বরচন্দ্রের পদচারণা। রামমোহনের প্রথম প্রেরণা ধর্মসংস্কার, পরে ক্রমশ তা সমাজসংস্কার থেকে বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর কর্মসূত্রে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শিক্ষা থেকে সমাজ সংস্কারে লিপ্ত হন। শেষোক্ত কাজে তিনি নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে তাঁকে ছদ্মনামে একটি সরস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করতে হয়েছিল। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় অবদান গদ্যছন্দ আবিষ্কার। পদ্যের মত গদ্যের ছন্দ আছে এবং তা "পদ্যের ছন্দ-সুষমা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ও স্বাভাবিক।" হৃদয়ের সংবেদনার ফলে যে উচ্চারণ সৌকর্যের সৃষ্টি বাক্যের ভেতর স্বাভাবিক যতিপাতে তা ছোট বড় ছেদ সৃষ্টি করায় একটি 'সুষম বাক্যগঠনরীতি' গড়ে ওঠে, বিদ্যাসাগর সেটি 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) রচনাকালে অনুভব করেছিলেন। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা গদ্যের এক অনন্য শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" পরেই মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।" দুটি বাক্য বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চরিত্রে অনমণীয় পৌরুষ "বহমান সংবেদনশীল করুণার্দ্র প্রাণ, সর্বংসহ মানবপ্রেম" যেমন দেখতে পাই, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলার গদ্যভাষায় 'উশৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত' করে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করেছেন। শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও বিস্তার, আর্তজনের দুঃখমোহন বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের স্পর্শেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। সমাজসংস্কার, ভাষাসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে রামমোহনের উত্তরসাধক মনে করা হয়। কিন্তু ভাষাচর্চায় রামমোহন গদ্যকে ব্যবহার করেছিলেন শাস্ত্র ও ধর্মতর্কের প্রয়োজনে, বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বহু ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি যে সমস্ত বই অনুবাদ করেছেন, তা ছিল প্রধানত সংস্কৃতে লেখা। এখানে তাঁর রামমোহনের থেকে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ ছিল।

বিদ্যাসাগরের সমস্ত রচনার মধ্যে মৌলিক ও অনুবাদ এই দু'ধরনের বই দেখতে পাই। প্রথম বই 'বাসুদেব চরিত' পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) ভারতীয় রচিত প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দুই খণ্ড) (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' (প্রথম) ১৮৭১, ঐ (দ্বিতীয়) ১৮৭৩, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (রচনা ১৮৫৩, প্রকাশ ১৮৯২), 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরের মরমী হৃদয়ের বেদনা-ভারাক্রান্ত অনুভবগুলিকে অসামান্য ভাবরসে প্রকাশ করেছে।

১৮৪৭ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে হিন্দুস্থানী 'বৈতাল পচ্চীশী'কে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'তে অনুবাদ করেন। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) কালিদাসের নাটকের কাহিনীর গদ্য অনুবাদ। 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)

ভবভূতির উত্তররামচরিত্রের দুটি অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অংশবিশেষ সংবলিত। অনুরূপে কয়েকটি ইংরেজি বই থেকেও তিনি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, যেমন—শ্রীরামপুরের যোশুয়া মার্শম্যানের 'History of Bengal' অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), ঈশপ থেকে 'কথামালা' (১৮৫৬), সেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' থেকে 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। অনুবাদেও বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা ছিল। তাঁর অনুবাদ মূলানুসারী হলেও আক্ষরিক আনুবাদ নয়। এখানে তাঁর সাহিত্যিক সততা ও শুদ্ধ রসবোধ তাঁর রচনাগুলিকে মৌলিক রচনার মতই রমণীয় সুখদ করেছে। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। রচনার কিছু উদাহরণ দিয়ে ভাষা-শিল্পী হিসেবে বিদ্যাসাগরের গদ্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হোল।

(1) "কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ?"—(শকুন্তলা)

(2) "তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনো প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না।"—(বিদ্যাসাগর চরিত)

বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা ভাষায় পদসংস্থানরীতি, তাই পদবিন্যাসে শৃঙ্খলা এনে ভাষায় শ্রী এনেছিলেন। অনুভব করেছিলেন গদ্যছন্দের অস্তিত্ব, আলোচ্য উদাহরণে যথাযথ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে ছন্দোস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন, ফলে রচনাংশ অভিধাকে অতিক্রম করে অসামান্য রূপ রস লাভ করেছে।

এ ছাড়াও তাঁর বিতর্কমূলক পুস্তিকা আছে। এগুলি তিনি ছদ্মনামে ('কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য', 'ভাইপো সহচরস্য') লিখেছেন। 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) রচনা দুটি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির প্রতিবাদের উত্তর। 'ব্রজবিলাস' বিধবা বিবাহ বিরোধী ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বক্তৃতার উত্তর। এ সব পুস্তিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের সরস কৌতুকপ্রিয়তা, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা এবং শুভ্র হাস্যরস সৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

10.7.2 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)

(বাবুসকল) "পোষাক পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন। কাহার দুই কাহার কাহার চারি পাশ বালিশ আছে, পিতলবান্ধা, কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহ বা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন"। (নববাবুবিলাস পৃঃ ১৬৩)

রামমোহন সাধু গদ্যের ভিত গড়েছেন বিদ্যাসাগর তার ছাঁদ বেঁধে দিয়েছেন। তাঁরা সংস্কৃত প্রভাবিত সাধু গদ্যরীতিকে হাতিয়ার করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণাকে ও সাহিত্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। এই সাধু গদ্যতেই রামমোহন যুগের অন্যতম শক্তিশালী লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গ -ব্যঙ্গ-নক্সা রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটা যুগ থেকে আরেকটা যুগে উত্তরণকালে চিরাভ্যস্ত সমাজজীবনে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়ই। রামমোহন, ভবানীচরণ, এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন পথের পথিক হওয়ায় ভবানীচরণ প্রাচীন পন্থী 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে প্রধানত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকেই তাঁর হাতিয়ার করেন। উনিশ শতকের প্রথমপাদের মোসাহেব পরিবৃত অশিক্ষিত বাবু সমাজের স্বরূপ উদঘাটনে ভবানীচরণ

বাস্তবানুগ একটি চিত্র উদ্ধৃত অংশ তুলে ধরেছেন। তাঁর পদবিন্যাসের সাবলীলতা গদ্যরীতিকে স্বচ্ছন্দচারী করেছে, ফলে ব্যঙ্গরস সহজেই ফুটে উঠেছে। 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) প্রশ্নোত্তরের আকারে কলকাতার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী "জ্ঞাত" করার জন্য নক্‌সা জাতীয় রচনা। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) বাবু সমাজের জীবন্ত বর্ণনা—উপন্যাস রচনার একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০) গল্প ও নক্‌সার সংমিশ্রণে উশৃঙ্খল বাবুদের মতই নারীজীবন ও তার পরিণতির ছবি এতে এঁকেছেন।

10.7.3 প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লঘু রঙ্গরসের নক্‌সাজাতীয় রচনার কতকটা অনুসরণ আছে প্যারীচাঁদের (ছদ্মনাম—টেকচাঁদ ঠাকুর) আলালের ঘরের দুলাল-এ। বইটির মধ্যে ব্যঙ্গ প্রণোদিত হাস্যরস সত্ত্বেও বইটি স্মরণীয় হয়েছে তার ভাষা বৈশিষ্ট্যের জন্য। যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সে ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "সেইদিন হইতে বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি।" এ ভাষার ভঙ্গি সহজ ও সরল। সাধু ক্রিয়ায় সর্বনাম পদের আশ্রয়ে তদ্ভব-দেশী শব্দ বেশি ব্যবহার করে মুখের ভাষার আদলে সর্বজনবোধ্য একটি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। ছোট ছোট বাক্য, কোনো কোনো পদের পুনরাবৃত্তি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে ভাষাকে অনেকটা সজীব ও উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। যেমন—

"একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটো হন হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষীরাজের বংশ—টঙ্‌স টঙ্‌স ডঙ্‌স ডঙ্‌স করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই ঢাল বেগড়ায় না।"—

—উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কথ্যরীতি লেখকের আদর্শ। বাংলা গদ্যকে সাবলীল করে তোলবার সাধনায় প্যারীচাঁদের এ হোল সচেতন প্রয়াস।

ইতোপূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আমরা লক্ষ্য করেছি কেরি মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্যোগে চলিত কথোপকথনের গদ্যরচনার প্রচেষ্টা, রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের' (১৮৫৩) সংলাপে কথোপকথনের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। এ সবই বলা যেতে পারে কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। প্যারীচাঁদের এ প্রয়াস ছিল গদ্য শিল্পের প্রয়োজনের তাগিদে। তাঁর রচনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না,—যেমন অভিশ্রুতির পরিবর্তে অপিনিহিতের ব্যবহার, একই সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাধু-চলিত রূপের ব্যবহার (ধেয়ে আইল) বা চলিত ক্রিয়াপদকে সাধুরূপ দেবার চেষ্টা ['উঠতেছেন' (উঠছেন) = উঠিতেছেন], [পালিয়া (পালিয়ে) = পালাইয়া] ফারসি আরবি শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদের প্রথম বই 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) সামাজিক নক্‌সা। কলকাতার নব্য ধনী পরিবারের ছেলে মতিলালের নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিত্র বইটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলাল ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শে প্রথম বাংলা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা। তাঁর অন্যান্য রচনা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬১), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'অভেদী' (১৮৭১) প্রভৃতি। সমকালের পানদোষ প্রভৃতি সমালোচনার পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও সমাজ-কল্যাণ, নারীশিক্ষা,

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। প্যারীচাঁদ বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহায়তার নারীশিক্ষা প্রচারার্থে সহজ চলিত ভাষায় ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন।

10.7.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

কালীপ্রসন্ন তাঁর তিরিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনেই কিছু স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। গদ্য শিল্পে তাঁর কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতা সত্ত্বেও আজও মান্য। বিদ্যানুরাগী কালীপ্রসন্ন কিশোর বয়সেই 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁর কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এ ছাড়াও সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা, পরিদর্শক নাম দৈনিক, পরিশেষে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনা করেন। এই সব পত্র-পত্রিকায় তিনি বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ বিষয়োপযোগী গুরুগম্ভীর সাধুভাষায় লিখেছিলেন। নিজে বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্ন তৎকালীন নাগরিক জীবনের উশৃঙ্খলতা, নূতন বিত্তবানদের বিকৃত জীবনযাপন আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যরসাত্মক বর্ণনা কলকাতার সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় (প্রথম খণ্ড ১৮৬২) প্রকাশ করেছেন। বইটিতে 'বারোইয়ারী পূজা', 'গাজনের সঙ', 'হুজুগ', 'সাত-পেয়ে গরু', 'মাহেশের স্নানযাত্রা' প্রভৃতি নিখাদ চলিতে লেখা কতকগুলি রচনা স্থান পেয়েছে। সহজবোধ্য কথোপকথনের গদ্যরীতি অনুসরণ করলেও প্যারীচাঁদ সাধুর কাঠামোটি একেবারে বিসর্জন দিতে পারেননি। এই দ্বিধাই তাঁর ভাষাকে কিছুটা দুর্বল করেছে। কালীপ্রসন্ন এই ব্যাপারে একেবারে স্বচ্ছন্দ। তাঁর গদ্য ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার ও বাক্য গঠনরীতি সবদিক থেকেই ছিল চলিত অনুসারী। যেমন—"শহরে সকল দোকানেই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘনিয়ে আসচে ততই বাজারের কেনাবেচা বাড়চে, ততই কলকাতা গরম হয়ে উঠচে।"

10.7.5 অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত একই বছর জন্মেছেন। দু'জনেরই বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণে ও তার সমৃদ্ধিতে সবিশেষ অবদান আছে। গ্রন্থ প্রকাশের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের 'ভূগোল' (১৮৪১), 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)-র পুরোগামী হলেও বিদ্যাসাগরের রচনার বহুগামিতা ও সৃষ্টিশীল রচনার প্রাথমিক আয়োজন হিসেবে বিশেষ অবদান জুগিয়েছে। তাঁর গদ্যের শব্দপ্রয়োগ অভিধাকে অতিক্রম করে চিত্র-ধ্বনির মাধ্যমে সরস ও অনুভববেদ্য করে তুলেছে। পক্ষান্তরে জ্ঞানসাধক অক্ষয়কুমার তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব মনোভাবের দরুণ গদ্যকে ব্যবহার করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-শৃঙ্খলায়, জ্ঞানের ও মননের চর্চায়।

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা গদ্যে সাধুরীতির একটি মান্যরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে। রামমোহন ও সাময়িক পত্রাদির গদ্যচর্চার মধ্য দিয়ে তা অনেকটা স্বচ্ছন্দও হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমারের পদচারণা এই ধারাকেই অনুসরণ করেছে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মপ্রচারার্থে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে অক্ষয়কুমারকে তার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তত্ত্ববোধিনী অক্ষয়কুমারের সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা রাষ্ট্র, সমাজ ও ইতিহাস

সম্পর্কে সমসাময়িক বাঙালির মননে নূতন আলোক সঞ্চার করেছিল। তাঁর জগৎজীবন সম্পর্কে অপার কৌতূহল ছিল, অধ্যাত্মতত্ত্ব বেদান্তচর্চায় নিবদ্ধ না থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় নৃতাত্ত্বিক জর্জ কুম্বের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেটি অনুবাদ করেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এরই পরিপূরক গ্রন্থ 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) কুম্বের Moral Philosophy অনুসরণে রচিত।

অক্ষয়কুমারের অনেকগুলি পাঠ্যবই লিখেছিলেন—'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড (১৮৫৩-৫৯)। শেষোক্ত বইটিতে লেখক ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। সাধু গদ্য এতদিন যুক্তি-বুদ্ধির পথ অনুসরণ করেছে। অক্ষয়কুমার সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইমারত গড়লেও তাঁর কল্পনা বিলাসেরও যে অভাব ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক রূপক কল্পনায় নিবন্ধগুলি।

অক্ষয়কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ১৮৭০, দ্বিতীয় ১৮৮৩) হোরেস হেম্যান উইলসনের 'The Religious Sects of the Hindus' নামের গবেষণা গ্রন্থের অনুসরণে পরিকল্পিত। বইটি ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভর।

ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত ধর্ম ও উপধর্ম বহু বিচিত্র রূপের পরিচয় বইটিতে পাওয়া যায়। এতে অক্ষয়কুমারের তথ্য অন্বেষণ, তার মূল্যায়ন, মনন ও মনীষার পরিচয় আছে। তাঁর ভাষা সরল না হলেও উপস্থাপনার গুণে জড়তাবর্জিত। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস আলোচনায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্ভর ভাষাশৈলীর পুরোধা হিসেবে অক্ষয়কুমারকে গণ্য করা যায়।

10.7.6 দেবেন্দ্রনাথ ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হলেও সংসারবিমুখ ছিলেন না। ভূদেবচন্দ্রের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল হিন্দু ও ভারতীয় সমাজজীবন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার গ্রন্থি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাধর্মী 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৫৯-৬০), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬০-৬১), 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২) অধ্যাত্মভাবে ভাবিত ভাবুক-প্রচারকের রচনা। ভাষায় তাই কবিত্ব ও কল্পনার সৌরভ আছে। তাঁর 'আত্মজীবনী' (১৮৯৫) ভ্রমণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এতে হিমালয়ের প্রকৃতি-অরণ্যানী, পাহাড়ি গ্রামজীবনের ছবি অত্যন্ত সংযত প্রকাশভঙ্গীতে কাব্যিক সুষমায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচারপ্রবন্ধ' (১৮৯৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি বইগুলির জন্য সমধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন শাস্ত্রনিষ্ঠ অথচ যুক্তিবাদী, জ্ঞানে উদার অথচ সুক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, বহুদর্শী সমাজ-সংস্কারক। চিন্তাঋদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ মৌলিক সিদ্ধান্তসমৃদ্ধ এই রচনাগুলিতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা যুগপ্রচলিত পারিবারিক আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা, শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ভারতীয় আদর্শকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনারীতিতে যুক্তির ভাব বেশি থাকায় ভাষা হয়েছে আতিশয্যবর্জিত গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুগ। কাব্যরসের কিঞ্চিৎ অভাব থাকলেও অপেক্ষাকৃত সরল ও স্বচ্ছন্দ। যেমন—"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন ও সম্বর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র : উনিশ শতকে ভারত ইতিহাস অন্বেষায় যে কয়জন বাঙালি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বহুভাষাবিদ এই পণ্ডিত পুরাতত্ত্ব, বিশেষত উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব আলোচনার জন্য স্মরণীয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিল্পিক দর্পণ', 'শিবাজী চরিত্র', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) পত্রিকা সম্পাদনায়। প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'তে তিনি বাংলা পুস্তক সমালোচনা প্রবর্তন ও ভৌগোলিক পরিভাষা রচনা করেন। শিল্প, বাণিজ্য, শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধে তিনি নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বিষয়ের গুরুত্ব ও বক্তব্যের গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজেন্দ্রলাল গদ্য ভাষা ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটিই বঙ্গদর্শন যুগে গদ্যের গোড়াপত্তন করেছে।

10.7.7 বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

উনিশ শতকের সূচনা থেকে অর্ধশতাব্দীর গদ্য চর্চার পরিণত রূপ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনে পাওয়া যায়। বাংলা গদ্যভাষাশিল্পের বিবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাংলা গদ্যচর্চার প্রাথমিক আয়োজন অনেকটা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করে শুরু হলেও রচনায় স্বকীয়তার পরিচয় প্রথম থেকেই ইতস্তত লক্ষ্য করা গেছে। বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধিকারে ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর গদ্যের বিবর্তনে সূক্ষ্ম ধারাটি দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী থেকে বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর-রজনী-কমলাকান্তের দপ্তরে আবিষ্কার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতির প্রধান বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়— ১. বাক্য ক্রমশ সরল ও আকারে ছোট হয়েছে; ২. প্রকৃতি বা পাঠক সম্বোধন করে রচনার সরসতা ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন; ৩. অন্তরঙ্গ বর্ণনাভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও ৪. সংযোজক ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে সমাপিকা ব্যবহার এবং নিশ্চয়াত্মক বাক্যের পরিবর্তে প্রশ্নাত্মক বাক্য প্রয়োগ করে রচনায় নাটকীয়তা এবং পদ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবেগ সঞ্চার করেছেন।

এভাবে বাংলা গদ্যভাষায় শতাব্দীর সূচনা থেকে দেশী-বিদেশী গদ্য লেখক প্রশাসন, সমাজ-সংস্কার, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজনে গদ্যশিল্পের বিবর্তন ঘটিয়েছেন। অর্ধ শতাব্দীর এই আয়োজনের একটি চূড়ান্ত রূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে পেয়েছি। এখন গদ্য অনেকটা মননের ভাষা, তথ্যের যুক্তির বাহন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় আমরা পরবর্তী অংশে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

10.8 গদ্য প্রবন্ধ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা

গদ্য ভাষার বিকাশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধশিল্প গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধ বস্তুত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত বিশ্লেষণাত্মক গদ্য রচনা। চিন্তাসমৃদ্ধ স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনা প্রবন্ধের মৌলিক লক্ষণ। এই প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রয়োজন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন মন, লেখবার ভাষা হিসেবে গদ্যের ব্যবহারযোগ্যতা ও তার জন্য শিক্ষিত পাঠক। উনিশের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ, প্রেমভক্তিবাদের পরিবর্তে ভৌমচেতনা থেকে বর্তমান সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আকৃষ্টবোধ করে। এ থেকেই

প্রবন্ধ পড়বার মত একটি সামাজিক প্রতিবেশ গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অন্যান্য গদ্যশিল্পের মত প্রবন্ধেরও অনুশীলনের যুগ। দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রথম সার্থক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত বলা যায়।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে জগৎ-জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও নানা বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশিত হলেও সে সমস্ত রচনা উপস্থাপনার জড়তা ও ভাষার কৃত্রিমতার জন্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। প্রথম যুগের ধর্ম বিষয়ক বাদানুবাদে সাধারণ পাঠক আকর্ষণ বোধ করেনি। প্রকাশ-নৈপুণ্য, প্রসাধন-সৌষ্ঠব বা প্রসাদ গুণ না থাকায় এ যুগের রচনার পাঠক ছিল নিতান্তই সীমিত। 'প্রবন্ধে' মননশীলতার সঙ্গে ভাবানুভূতির সমন্বয় ঘটায় গদ্যশিল্প হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসকে উন্মেষ, প্রত্যূষ, মধ্যাহ্ন, পরিণতি—চার ভাগে ভাগ করা যায়।

বাংলা প্রবন্ধ

উন্মেষ	**প্রত্যূষ**	**মধ্যাহ্ন**	**পরিণতি**
যুরোপীয় মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর রচনা	রামমোহন ভবানীচরণ অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ভূদেব মুখোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র	বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুসারী লেখকবৃন্দ : সঞ্জীবচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসু অক্ষয়কুমার সরকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী প্রাবন্ধিক গোষ্ঠী

বস্তুত সচেতনভাবে গদ্য প্রবন্ধ রচনার সূচনা যুরোপীয় মিশনারিতে, পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। উন্মেষ ও প্রত্যূষপর্বের গদ্যগ্রন্থ নিবন্ধের পূর্ববর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রেই প্রবন্ধের যৌবনপ্রাপ্তি, তার মধ্যাহ্ন দীপ্তি। ঔপন্যাসিক খ্যাতি তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তাকে অনেকটা আড়াল করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাবন্ধিক হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হতে পারতেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রয়োজনে এবং সুশিক্ষিত পাঠক তৈরির পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আনন্দের খোরাক যোগাতে লঘু-গুরু ভঙ্গিতে নানা রস-সংযোগে বিচিত্র বিষয় ও মর্জির প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থাবলি—'লোকরহস্য' (১৮৭৪)—হাস্য রসাত্মক নক্‌শা 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫)—বিজ্ঞানকে সাধারণ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় রচনা : 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) পরি একত্রে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৩), শ্রীমদ্ভাগবতক গীতার ব্যাখ্যা (১৮৮১), 'ধর্মতত্ত্ব, বা 'অনুশীলন' (১৮৮৮)। এই তালিকা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র বিষয়চারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির সাহায্যে তিনি নবযুগের মানুষকে নূতন চিন্তার সঙ্গে জীবনপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ বাস্তবমুখী, পরিচ্ছন্ন নৈয়ায়িক যুক্তিনির্ভর। দেশের, সমাজের মানুষের মঙ্গল কামনায় তিনি অপরাধ অসহিষ্ণু বীর্যশালী শাসক। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যে যেমন কঠোরতা আছে, তেমনি আছে নির্মল ব্যঙ্গ যা মাধুর্য ও স্মিত হাস্যের কোমল স্নিগ্ধতায় পূর্ণ।

এর সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে যুক্ত ছিল প্রবল স্বদেশানুরাগ ও দার্শনিকসুলভ চিন্তাশীলতা। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় এক নুতন মানের প্রবর্তক। তিনি সংযম ও শিল্পচেতনা দিয়ে সাহিত্যালোচনায় পশ্চিমী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে সমগ্রের বোধেই সৌন্দর্য উপলব্ধি সম্ভব। শব্দ ও অলঙ্কারের বিশ্লেষণ সমালোচনার প্রধান অবলম্বন হতে পারে না। স্বভাবানুকারিতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রাণ। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন দৃষ্টির সমন্বয়ের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তিরসের যোগ ঘটিয়েছিলেন। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় তাঁর 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধে। লোকরহস্য ও কমলাকান্তের কতিপয় রচনায় তার পর্যাপ্ত পরিচয় আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে যুরোপীয় দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজবাদের পক্ষ সমর্থন করেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম গ্রন্থ রচনা করলেও কার্ল মার্কস-এর মতবাদের সঙ্গে প্রবন্ধ দুটির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। পরিণত বয়সে তিনি গীতার মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন। 'কৃষ্ণচরিত্র' একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহাভারত কাল্পনিক আখ্যান নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টিশীল উপন্যাস ও মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও সমালোচনার যে ধারা প্রবর্তন করেন তা সে যুগের বহু শিল্পীব্যক্তিত্বকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বঙ্গ দর্শনের আসরে স্থান করে নেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও বঙ্কিমযুগোত্তরকালে যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা "বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত"—বঙ্কিমানুসারী লেখকরূপে পরিচিত। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঞ্জীবচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও, তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীজাতীয় রচনা 'পালামৌ' এক অনন্য সৃষ্টি। রচনাটি কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমষ্টি হলেও কবি-কল্পনার আশ্রয়ে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিরূপে গণ্য। বাস্তব চিত্রানুসরণে তাঁর গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি রচনাকে স্বচ্ছন্দ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে **চন্দ্রনাথের** আবির্ভাব। তাঁর আর্যামির জন্য তিনি এক সময় মুক্তদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। চন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি প্রধানত শাস্ত্র ও সমাজ সমস্যামূলক। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রেরণা হলেও, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক প্রাচীনপন্থী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর দ্বারা। 'হিন্দু-বিবাহ-ব্যবস্থা ও আচার' সম্পর্কিত রচনাগুলি তাঁর উদাহরণ। 'ফুলের ভাষা' 'অনন্ত মুহূর্ত' প্রভৃতি রচনায় তাঁর কল্পনাপ্রবণতার পরিচয় আছে। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালিদাসের নাটকের মধ্যে তিনি ভারতীয় সমাজ-আদর্শ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি ও রচনারীতিটিকে আত্মসাৎ করে প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হলেও, মননে, উপস্থাপনায় কিছুটা নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে সাধু হলেও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও অন্তরঙ্গতায় চলিত গতিছন্দের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রচনা ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-সংস্কৃত সাহিত্য আশ্রয় করলেও প্রসাদগুণযুক্ত—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও কৌতুকরসসমৃদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য ও হিন্দুধর্মপ্রচারক। তাঁর বাংলা গদ্য নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বিশিষ্টতা দাবী করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ভারতীয় ঐতিহ্যসন্ধানী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কয়েকটি বই যেমন 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' এবং

বাংলায় কয়েকটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলিত সাধুভাষা হলেও, অনেকটা কথ্যধর্মী। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের পূর্ণরূপ থাকা সত্ত্বেও কথ্যভাষায় দ্রুতি তাঁর রচনাকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যদান করেছে। অন্যত্র তিনি কথ্যভাষা ও কথ্যরীতি যদৃচ্ছ ব্যবহার করে গদ্যকে অনেকটা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সহজ সর্বজনবোধ্য গতিশীল অথচ পৌরুষে দৃপ্ত করেছেন— কোথাও তারল্য প্রকাশ পায়নি। যেমন, "বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ, কলকাতার ভাষা।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরীতিকে অনুসরণ করেও তাঁর স্বকীয়তায় বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সূচনা করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় তথ্যবিচার ও তত্ত্বচিন্তা ও বিশ্লেষণের সুষম বিন্যাস আছে। তিনি বিজ্ঞান আলোচনা দিয়ে শুরু করলেও দার্শনিক উপলব্ধিতে শেষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আলোচনার নিদর্শন আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' ও 'কর্মকথা' তার পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। এদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন। 'পৃথিবীর বয়স' ও 'ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম' রচনায় ঘরোয়া ভাব ও পরিহাসপ্রবণতা, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় লেখকের সুগভীর স্বাদেশিকতাবোধের সঙ্গে কবিত্ব প্রকাশিত হওয়ায় রচনাগুলিকে অপূর্ব প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করেছে। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র গদ্য রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র ছন্দোময় গদ্যের পূর্বসূরী বলা যায়। বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের কবি শিল্পী সত্তাটির মূর্ত রূপ শেষোক্ত রচনাটির কোমল ভাবাবেগাপ্লুত বর্ণময় চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য পর্বের প্রাবন্ধিকদের রচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে একটি পরিণতির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। এর পর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী প্রাবন্ধিকরা ভাষাকে অসামান্য প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও শিল্পপ্রকর্ষে বাংলা প্রবন্ধে অসামান্য অভিনবত্ব এনেছেন।

10.9 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাংলার গদ্যচর্চার শুরু ধর্মপ্রচারমূলক গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক ও বিতর্কমূলক রচনার মধ্য দিয়ে শুরু হলেও, সাহিত্যিক গদ্য বিভাগে সাময়িক পত্রিকার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিক্‌দর্শন' 'সমাচার দর্পণে' তার সূচনা হলেও, বাঙালি গদ্য-শিল্পীর হৃদয় ও মননে সৃষ্ট হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুদৃঢ় করেছে। রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমারের তন্নিষ্ঠ গদ্য সাধনার পরিণত রূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন'।

রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ—অনুবাদ ভাষ্য—বিতর্কমূলক প্রবন্ধ বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মধ্য দিয়ে তাতে প্রাণসঞ্চার করেন। অক্ষয়কুমার তাকে করেছেন মনন ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন কতগুলি সরস খণ্ডচিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তাকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গদ্যকে প্রবন্ধে, উপন্যাসে, চিন্তাপ্রধান ও রসপ্রধান—দুটি ধারাতেই সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র কালক্রমে একাধারে স্রষ্টা ও অপরদিকে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যকে একটি সুনির্দিষ্ট মানে পৌঁছে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র এদিক থেকে যুগস্রষ্টা। তাঁর প্রভাবে বাংলার প্রবন্ধ ও সমালোচনার ধারা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

ফলত বঙ্কিম অনুসারী ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকগণ তাঁর বিচিত্র বিষয়চারণার সূত্র ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, স্বদেশপ্রীতি এবং সরস রঙ্গ-ব্যঙ্গে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

10.10 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ১৫৫ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :
   (ক) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা মাসিক............ প্রকাশিত হয় .... মাসে। ঐ বছরই .... মাসে .... সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।
   (খ) বাঙালি পরিচালিত প্রথম......পত্র......১৮১৮......প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন......।
   (গ) রামমোহন......শর্মা নামে সেপ্টেম্বর......দ্বি-ভাষিক পত্রিকা......প্রকাশ করেন।
   (ঘ) সমাচার সভা রাজেন্দ্র সম্পাদক......প্রথম মুসলমান সম্পাদিত......ও......দ্বি-ভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
   (ঙ) ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র .... প্রকাশ .... ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন.........।
   (চ) রামমোহনের প্রথম প্রেরণা..........পরে ক্রমশ তা .... থেকে ....রূপান্তরিত হয়েছে।
   (ছ) বিদ্যাসাগর কর্মসূত্রে..........সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় .... থেকে .... লিপ্ত হন।
2. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক)	'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশকাল	: ১৮২১, ১৮২২, ১৮২৪
(খ)	'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক	: রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত
(গ)	পাদ্রী লসন সংকলিত পত্রিকার নাম	: পশ্বাবলী, বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ
(ঘ)	'সোম প্রকাশ' পত্রিকার (1821) সম্পাদক	: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
(ঙ)	বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র অনুবাদ প্রকাশ	: ১৮৬০, ১৮৫৪, ১৮৫৭
(চ)	অক্ষয়কুমার দত্তের স্মরণীয় বইয়ের নাম	: ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, সামাজিক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।
(ছ)	'নববাবুবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা	: মধুসূদন দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(জ)	'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রচয়িতা	: বিনয় ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র।

3. (ক) রামমোহন রায়ের দুটি অনুবাদ ও দুটি মৌলিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন। : 1 1 / 2 2
   (খ) রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের দুটি বিতর্কমূলক রচনার নাম বলুন। : 1 1 / 2 2

(গ) প্যারীচাঁদ মিত্রের দুটি বইয়ের নাম লিখুন। : 1
2

(ঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশিত দুটি পত্রিকার নাম : 1
2

(ঙ) বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি হাস্যরসাত্মক রচনা ও দুটি ধর্ম ও দর্শন জাতীয় বইয়ের নাম উল্লেখ করুন। : 1 1
2 2

(চ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন। : 1
2

4. সংক্ষেপে পরিচয় লিখুন।
(ক) বঙ্গদর্শন; (খ) কমলাকান্তের দপ্তর; (গ) পালামৌ; (ঘ) শকুন্তলা তত্ত্ব; (ঙ) জিজ্ঞাসা; (চ) বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।

10.11 উত্তর সংকেত

অনুশীলনী 1

1. (ক) জাতিকে, সুযোগ তার; (খ) ভারতচন্দ্রের, মধ্যযুগীয়; (গ) ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ; (ঘ) মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাও; (ঙ) ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে; (চ) মঙ্গল সমাচার মাতিউর; (ছ) রামরাম বসু; (জ) লিপিমালা।
2. (ক) ১৭৬০, (খ) ১৮০০, (গ) ১৮০১, (ঘ) ১৮০২, (ঙ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
3. (ক) কথ্যরীতির, (খ) সংস্কৃতানুসারী।
4. (ক) 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর', ধর্মপুস্তক।
(খ) মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাও, ১৭৪৩।
(গ) তারিণীচরণ মিত্র ১৮০৩।
(ঘ) ভাষা ও লিপিশিক্ষা, জীবনী, ইতিহাস।
(ঙ) গোলোকনাথ শর্মা (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৮০৮)।

অনুশীলনী 2

1. (ক) দিগদর্শন, এপ্রিল, মে, সমাচার দর্পণ।
(খ) সাময়িক, বাঙ্গাল গেজেটি, জুনে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।
(গ) শিবপ্রসাদ, ১৮৮১, ব্রাহ্মণ সেবধি।
(ঘ) শেখ আলীমুল্লা, বাংলা, ফারসি।
(ঙ) জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১, দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(চ) ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, বিশ্বচেতনায়।

(ছ) শিক্ষার, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কারে।

2. (ক) ১৮২২, (খ) ঈশ্বর গুপ্ত, (গ) পশ্বাবলী, (ঘ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, (ঙ) ১৮৫৪, (চ) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, (ছ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (জ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

(3 নং ও 4 নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত এক্ষেত্রে বাহুল্যমাত্র)

10.12 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
4. বাংলা সাময়িক পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক 11 ❑ যুগসন্ধির কবি ও কাব্য

গঠন

11.1 উদ্দেশ্য
11.2 প্রস্তাবনা
11.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) যুগসন্ধির কবিতা ঃ কবিওয়ালা
11.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
11.5 অনুশীলনী 1
11.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) যুগসন্ধির কবি ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল
 11.6.1 যুগসন্ধির কবি
11.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
11.8 অনুশীলনী 2
11.9 উত্তর সংকেত
11.10 গ্রন্থপঞ্জি

11.1 উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল এটি পাঠ করে আপনি আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা বা এ বিষয়ে কিছু লেখাও সম্ভবপর হবে।

11.2 প্রস্তাবনা

দশম এককে আধুনিক গদ্যভাষায় রচনার সূচনা ও তার বিকাশ পর্ব ও পরিণতি সম্পর্কে পরিচয় আপনি পেয়েছেন। এখানে আধুনিক কাব্যের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যে মধ্য যুগাবসানের অনেকগুলি চিত্র লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে একদিকে ছিল বৈচিত্র্যহীন ধর্মকেন্দ্রিকতা, ইহবিমুখতা—অপরদিকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কী অভিযানের পর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবোধের অভাবে সৃষ্টিশীল রচনার অভাব ঘটে। পরে অন্ধকার পর্বের অবসানে অনুবাদ কাব্য, মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যভাষায় প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দেয়। তারও পরে সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার আনুকুল্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে পরিবর্তন ঘটে। কতিপয় বাঙালি মুসলমান কবি রোমান্সরসে জারিত কতকগুলি আখ্যায়িকা কাব্য হিন্দি-ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে রচনা করেন। যখন চৈতন্যপ্রভাব প্রায় ক্ষীয়মাণ এবং প্রতিদিনের প্রচলিত ধারা আর পাঠককে আকৃষ্ট করছে না, তখন দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা আলাওলের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মানবিক প্রেমকাহিনী বাংলা কাব্যে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তথাপি তা দীর্ঘদিন বাঙালি পাঠককে ধরে রাখতে পারেনি। পদ্যবন্ধের গতানুগতিকতা ও ছন্দরীতির শ্লথ পরিক্রমা পাঠকসমাজকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

এদিকে মোগল সুবাদারদের দুঃশাসন—অর্থলোলুপতা, চারিত্রদৃষ্টি তার অমাত্যবর্গ ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায়, সমাজজীবনও ক্রমশ দূষিত, পৌরুষহীন, লালসা-শৈথিল্যে জড়িয়ে পড়ে। ফলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে পুরাতন অনুবাদ, মঙ্গল ও বৈষ্ণব কাব্যধারার অনুবর্তন চলছিল, কিন্তু সেখানে অতীত ঐশ্বর্য একেবারেই ছিল না। বাংলা সাহিত্যে এটি ছিল অবক্ষয়ের পর্ব। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলার সমাজ-পরিবেশ ও তার ভাব পরিমণ্ডল ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব হতে পারেনি। এ সময়কে বলা যায় 'যুগসন্ধির কাল'। এ পর্বে নব্য কলকাতার নগর সংস্কৃতির পটভূমিতে কবিগানের জন্ম।

11.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) যুগসন্ধির কবিতা ঃ কবিওয়ালা

একদিকে অপসৃয়মান সামন্তশাসিত বাংলার পুরাতন সমাজ পরিবেশ ও ভাব পরিমণ্ডল, অপরদিকে বিজয়ী ইংরেজশাসিত নূতন রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক প্রসঙ্গ অবলম্বন সত্ত্বেও ধর্মভাবমুক্ত খণ্ড কবিতায় দেশ-কাল মানুষের কথা এ সময় প্রাধান্য পেল। কবিওয়ালারা (১৭৬০-১৮৩০) নগরজীবনে কর্মশ্রান্ত মানুষকে লঘু আমোদ-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে কবিগান উপহার দিতেন। যদিও কবিগানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত, তথাপি সেখানে ভক্তিরসের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে স্থূল, চটুল মানবিক জীবনরস। কবিওয়ালারা উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের চাপানের কাটান দিতেন। অনুপ্রাস-যমকের মিশ্রণে মুখে মুখে গান বেঁধে উপস্থিত শ্রোতাদের চমৎকৃত করতেন। এই শ্রেণীর রচনায় কাব্যোৎকর্ষ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত ছিল না। রচয়িতারাও পরিচিত হতেন 'কবি' নয়, 'কবিওয়ালা' নামে। তাঁদের রচনাও 'কবিতা' নয় 'কবিগান' নামে আখ্যাত হ'ত। নগর কলকাতার নবোদ্ভুত বিত্তবান বেনিয়ান মুৎসুদ্দিদের সান্ধ্যবৈঠকে "আমোদের উত্তেজনা" পরিবেশনের জন্য কবিগানের মৌলরূপ—পদ্য বিতণ্ডার আকার পরিগ্রহ করেছিল। তর্জা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা প্রভৃতির উপাদানের সংমিশ্রণে কবিগান রচিত। এক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিসহ পাঁচালিকার দাশু রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাম বসু (১৭৮১-১৮২৮) : জন্ম শালকিয়া (হাওড়া)। লেখাপড়া শিখে কেরানির বৃত্তি নিয়েছিলেন। কবিগানের আকর্ষণে প্রথমে গান বাঁধা, পরে দল করে গান গেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার মর্যাদা পেয়েছেন। 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ পর্যায়ের' গান রচনার জন্য তিনি খ্যাত। তাঁর রচনা হৃদ্যতা ও বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্কে যথার্থই অনন্য :

উমা কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কে আছে সম্বল
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।।
শুনিয়া জামাতার দুখ কেঁদে বুক বিদরে।

উদ্ধৃত গানটিতে পরিবারজীবনের ছবি সহজ সরল ভাষা ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে।

হরু ঠাকুর : এক সময় কবিয়াল রঘুনাথ তন্তুবায়ের শিষ্য হরু ঠাকুর—হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। কবিগানের ইতিহাসে ঐতিহ্যময় দুটি নাম হরু ঠাকুর ও রাম বসু। হরু কলকাতার সিমলা পাড়ায় ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছেন। পড়াশুনায় শৈশব থেকেই তেমন অনুরাগ ছিল না। এগারো বছর বয়সে পিতৃহীন

হরু সখের কবিদল গড়েন। রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষণায় এটি পেশাদারি দলে পরিণত হয়। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর হরু দল ভেঙে দেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হরুর বাঁধা কবির গানে ধ্বনিঝঙ্কারের সঙ্গে বেশ কিছু চটকদারি উক্তি থাকত। তাঁর গায়ন পদ্ধতি ও ভাষা প্রয়োগ প্রচলিত কবিগানের দোষগুণমুক্ত ছিল না। হরুর জনপ্রিয় গান "আজ বাঁধবো তোমায় বলমাণি/করিয়ে সখীমণ্ডলী।... গো রসের অবশেষ দিব তোমার মস্তকে ঢালি।"—উদ্ধৃতি সেকালের কবি-ভাষা ও রুচির পরিচায়ক। আলোচ্য কবিয়াল তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

হরু ঠাকুরের 'লড়াই'-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার, বিখ্যাত কেষ্টা মুচি। বয়সে হরুর চাইতে বড়। হরু ঠাকুর একাধিকবার তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন। কবিয়াল ভবানী বেনে ও তাঁর শিষ্য রাম বসুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। এতে কোনো অগৌরব ছিল না।

ভোলা ময়রার গানে প্রকাশিত কবিগানের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আগমনীর একান্ত আবেগ। ভোলার অনন্য বৈশিষ্ট্য গানের আসরে সমসাময়িক লৌকিক ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়ে তাঁর প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার মুন্সিয়ানা। আত্মকথাজাতীয় নীচের কবিতাটি ভোলার প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা—

"শীত এলে লেপ চাই　　　　এলে খোল মই
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি।
শরতে হেমন্তে,　　　　বৈখাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নাহি মানি।।

****

নহি কবি কালিদাস　　　　বাগবাজারে করি বাস
পুজো এলে পুরী মিঠাই ভাজি।...
তবে যদি কবি পাই　　　　হাটে কভু নাহি যাই..."

পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি কবিওয়ালা 'এন্টুনি' ভোলা ময়রার সমসাময়িক ছিলেন। তিন পুরুষ ধরে এদেশে বাস করে বঙ্গললনাকে বিয়ে করে এন্টুনি বাংলা দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ভোলা ময়রা তাঁর জাত-ধর্ম নিয়ে আক্রমণ করলে—"তুই জাত ফিরিঙ্গি, জারহীঙ্গি.../যীশুখৃষ্ট ভজগে বেটা শ্রীরামপুরের গির্জাতে।" এন্টুনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে ব্যঙ্গ ছিল না, ছিল উদার ধর্মীয় চেতনা—"সত্য বটে বটি আমি জেতে ফিরিঙ্গি/(তবে) ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী।" এন্টুনির এ উত্তর সর্বকালের সমন্বয়বাদী ধর্মদর্শনের শেষ কথা— সেকালের পক্ষে যা ছিল একান্তই অভাবনীয়। অনুরূপে রামবাবুর একটি আক্রমণের উত্তরে এন্টুনি উদার চৈতন্যের জয় ঘোষণা করে গেয়েছেন—"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই/শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এত কোথা শুনি নাই।"

দাশু রায়—দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) ঃ কবিগানের প্রতিবেশে লালিত হলেও বিধবা বিবাহের মত শতাব্দীর কয়েকটি ভাবতরঙ্গ তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করলেও প্রধানত তিনি পাঁচালিকার হিসেবেই স্বীকৃত। কবিগানের মত পাঁচালিও আসরে গাওয়া হোত, অন্যান্য সহযোগীরা গানে বাজনায় সাহায্য করতেন। এখানে গায়ক পায়ে নূপুর ও হাতে চার মন্দিরা নিয়ে এ্কাই গান গাইতেন। চাপান-উতোর বা উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোনো অবকাশ ছিল না। দাশরথির গানে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য শ্রোতাদের চিত্ত জয় করত।

তাঁর পালাগান মধ্যযুগ প্রচলিত পুরাণ কাহিনী আশ্রিত হলেও সেখানে ভক্তি-ভাব ব্যাকুলতার পরিবর্তে যুগপ্রভাবে রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় আধুনিকতার স্বাদ এনে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দাশু রায় উনিশ শতকে জন্মেও মানসিকতায় ছিলেন অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কবিতার শেষ ধারক ও বাহক। এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেও ঈশ্বর গুপ্ত এক্ষেত্রে নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছেন।

11.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

ইংরেজ অধিকারের পর পুরাতন সমাজ পরিবেশ ও ভাবমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। ধর্মভাবমুক্ত খণ্ড কবিতায় সমসাময়িক দেশকালের পটভূমিকায় মানুষের কথা এ সময় প্রাধান্য পায়। কবিওয়ালারা পুরাণ কথার মোড়কে মানুষের কথা স্থুল-চটুল রসের ভিয়েনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপহার দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যাঁরা স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টুনি ফিরিঙ্গি এবং পাঁচালিকার দাশু রায় উল্লেখযোগ্য।

11.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে 165 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :
   - (ক) সপ্তদশ শতকে .... রাজসভার আনুকূল্যে বাংলার .... ঘটে।
   - (খ) দৌলত কাজীর........ বা ....পদ্মাবতী........ প্রেমকাহিনী বাংলা কাব্যে এক নূতন.......সন্ধান দিয়েছে।
   - (গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে পুরাতন ______ ও _______কাব্যধারার অনুবর্তন চলছিল।
   - (ঘ) কবিগানের প্রধান বিষয়______ প্রেম _______এবং _________তথাপি সেখানে ______ পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক জীবনরস।
   - (ঙ) কবিগান রচয়িতা হিসেবে বিশেষ _______অধিকারী যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ___ ___ _____ সহ পাঁচালিকার _____বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
2. সংক্ষেপে পরিচয় লিখুন :
   (ক) আলাওল, (খ) লোরচন্দ্রানী, (গ) কবিগান, (ঘ) রাম বসু, (ঙ) সংবাদ প্রভাকর।
3. (ক) ভোলা ময়রার কবিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
   - (খ) দাশু রায়কে উনিশ শতকে জন্মেও “অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কবিতার ধারক” বলা হয়েছে। ___এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।
   - (গ) ‘হরু ঠাকুরে’র সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।

10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) যুগসন্ধির কবি ঃ ঈশ্বর গুপ্ত—রঙ্গলাল

বাংলাদেশে যে সময় নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘোর কাটেনি, তখনও বাংলার কাব্য ও সংস্কৃতি জগৎ বন্ধ্যা ছিল না। কবিওয়ালারা তখন পুরাতনকেই আঁকড়ে আছেন। রাধা-কৃষ্ণ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ নিয়ে

কবির আসর বসাচ্ছেন। এই সন্ধিযুগের সাংবাদিক-কবি ঈশ্বর গুপ্ত তথাপি নতুনকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি। সমকাল ও স্বদেশ তাঁকে টেনেছে। তাই নতুন পরিবেশ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সমাজের ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলেছেন। নতুন এ পরিবেশের প্রতি টান থাকলেও, কবির আজন্ম সংস্কার তখনও সনাতন ধ্যান-ধারণার মধ্যে ছিল সীমিত। সামনের দিকে তাকালেও প্রতিনিয়ত তাঁর পিছুটান থেকে গেছে। তা কাটাতে অনেক সময় গেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিষয়বস্তু অতি সমকালীন হলেও উপস্থাপনায়—ভাষা-ছন্দে-অলঙ্কারে পুরাতন প্রত্যয়কে তিনি ত্যাগ করতে পারেননি।

অপরদিকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে গদ্য পরিচয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বীয় শিল্পকর্মে তাকে আঁকড়ে ধরতে চান। আবার দেশের ঐতিহ্য, স্বদেশ ও সমকাল তাঁকে ভাবায়। এই দুয়ের টানাপোড়েনে অতীত ইতিহাস-কিংবদন্তী থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, মূর-বায়রণের অনুসরণে মানবিক প্রেমের কথা দেশপ্রেমের কথা বলবার জন্য রোমান্টিক আখ্যান কাব্য লেখেন। কাহিনী পুরাতন, উপস্থাপনায় ভাবে-রূপে আধুনিক।

ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল যুগসন্ধিকালে বাস করে নবযুগকে চিনতে ভুল করেননি। এই চেনার ফলে মনে-মননে, ধাক্কা লেগেছিল। আগ্রহ বোধ করেছিলেন বলবার। হৃদয় ও মনের সেই দোলা উনিশ শতকের দান। সে কথাই এ পর্যায়ে বলতে চাওয়া হয়েছে।

11.6.1 যুগসন্ধির কবি

ঈশ্বর গুপ্ত **(১৮১২-১৮৫৯)** : উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল : কালীকীর্তন (১৮৩৩), ভারতচন্দ্র রায়ের 'জীবন বৃত্তান্ত' ও কাব্য সংকলন (১৮৫৫), 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'হিত প্রভাকর' (১৮৬৩), সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে রচিত 'বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩) খণ্ডাকারে সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলিতে সাংবাদিক কবির কবিব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম তাঁর কবিতায় বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়েছেন— দেশকে, মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। "তিনি বাঙ্গালা সমাজের কবি।... তিনি বাঙ্গালা গ্রাম দেশের কবি।...ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist... (তিনি) আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।... ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তীব্র ও বিশুদ্ধ।...ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন।...ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যায়ন যথার্থ এবং আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এ কথা ঠিক যে, তাঁর কবিতায় মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার পাদপূরণে ও বৈচিত্র্যসাধনে এবং অন্তরের তাগিদে যত কবিতা লিখেছেন, বিষয়বৈচিত্র্যে সেগুলি অনন্যতা দাবী করতে পারে। তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা, বাস্তব জীবনবোধ, ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের পরিচয় যেমন তাঁর কবিতায় আছে, তেমনি আছে একাধারে স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি বর্ণনামূলক, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিত্ত্ব বিষয়ক কবিতা। তিনিই প্রথম কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রূপ-রঙ্-রস মানুষের জীবনে একটি পৃথক আবেগ সৃষ্টি করে, প্রকৃতির রূপগরিমা মানবজীবন নিরপেক্ষরূপে একটি রস-স্বাতন্ত্র্য রচনা করে—এই উপলব্ধি ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে আর কোনো বঙ্গীয় কবির ছিল না। তাই তাঁর কাব্যে প্রকৃতি একটি ভিন্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তকে স্নেহ করতেন। তিনিও তাঁর ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল। মহর্ষির উদার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই দেখি গুপ্ত কবির ঈশ্বর বিষয়ক কবিতায় ঈশ্বরবোধ

একটি স্বতন্ত্ররূপ লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর কাছে নির্গুণ। এই ঈশ্বরচৈতন্য উনিশ শতকে সম্পূর্ণ নতুন। কবিই প্রথম বললেন যে ঈশ্বর ত্রাণকর্তা—"অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।/যার চিন্তামণি-চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে?— যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার/...ভক্তি ভব জলধি জলে হয় পার।।"

যে যুগে স্বদেশপ্রেম একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল, বৃটিশ শাসনে বাঙালির জাতীয় চৈতন্য যখন সুপ্তিমগ্ন, সেই সময় ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

দেশের দারুণ দুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লানমুখ মসী ছাঁদে
শোকঅশ্রু করে বরিষণ।।

"এই কণ্ঠস্বর বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব।" নিজের জীবনের দুঃখের সঙ্গে দেশজননীর নির্যাতন মিলিয়ে এক অপূর্ব গীতিমূর্ছনা সৃষ্টি করেছেন বলেই ঈশ্বর গুপ্ত 'was the reigning king of literary world in his day. চিৎকারপ্রিয় পদ্য লেখক সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত ও কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বের অবসানে ঈশ্বর গুপ্তের কবিমন কবিতার মর্মবাণী উচ্চারণে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সমাজচেতনা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান ধারা। যে কোনো আদর্শবাদী সমাজমনস্ক মানুষের মতো ইতিবাচক মনোভাব থেকে সমকালীন ইঙ্গ বঙ্গীয়দের উচ্ছৃঙ্খলাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাদের বিদ্ধ করেছেন। তিনি যখন লেখেন—

যত কালের যুব, যেন সুবো
ইংরেজী কয় বাঁকাভাবে।
ধরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

—এর মধ্যে আছে নবযুবদের প্রগতির নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—আবার স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি দেখে তিনি লিখেছেন :

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন 'এ, বি' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।

সমাজচেতনা থেকেই কবির দেশাত্মবোধের জন্ম। তিনিই প্রথম জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রম এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে বলেছেন,

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!

কখনও কখনও তিনি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ কষাঘাত করেছেন—

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো।
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।

* * * * *

আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।।

এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা কাব্যে খণ্ড কবিতার একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। তার মধ্যে আবেগ (emotion) ও কল্পনাশক্তির (imagination) কিঞ্চিৎ অভাব থাকায় গীতিকবির যে তন্ময়তা যাকে 'লিরিসিজম' বলে তা না থাকলেও ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক কবিতার প্রেক্ষাপট রচনা করে দিয়েছেন বলা যায়। প্রসঙ্গত, বাংলা কাব্যের বিকাশে ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি অবদানের কথা স্মরণ করতে হয়। তিনিই প্রথম 'সংবাদ প্রভাকরে' নতুন কাব্যপ্রতিভা আবিষ্কারে উদ্যোগী হন। অসীম সাহিত্যপ্রীতি থেকেই তরুণ কবিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি করে নব্য কবিরা ঈশ্বর গুপ্তের পৃষ্ঠপোষণায় 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' শীর্ষকে তাঁদের পারস্পরিক মতবিনিময় করতেন। এই কবি দলে যাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী স্মরণীয়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) ঃ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত রঙ্গলাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভালবেসে কাব্যচর্চার অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এই বাংলা সাহিত্যপ্রীতি থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে বীট্‌ন সোসাইটিতে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫১) পাঠ করেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্ম্মদেবী' (১৮৩২), 'শূর সুন্দরী' (১৮৬৮) এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) রচনা করে বাংলা কাব্যকে শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করে তোলেন। তাঁর এই কাব্যগুলি প্রধানত ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও জনশ্রুতি অবলম্বনে প্রণয়-রস প্রধান রোমান্টিক আখ্যানকাব্য।

রঙ্গলালের আখ্যানমূলক কাব্যের রোমান্টিক ধারা একদিকে যেমন গীতিকবিতার প্রেরণা, তেমনি পরবর্তী 'মহাকাব্য' রচনার অন্যতম প্রেরণা বলা যেতে পারে। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনাময় আবেগ, মনন প্রধান গাঢ়বদ্ধতা মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে আধুনিক যুগের বিস্তৃততর কাব্য পরিধির দিকে ফিরে এসেছে। সম্ভবত এই প্রচেষ্টা মধুসূদন দত্তকে তাঁর মৌলিক পথ আবিষ্কারে অনেকটা উৎসাহিত করেছিল।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত এবং "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি এক সময় মুক্তি-সংগ্রামী বাঙালির বীজমন্ত্র ছিল। প্রাচীন কাব্যের কোথাও স্বদেশপ্রীতির কথা ছিল না। এ কাব্যের এটিই নূতনত্ব। তাঁর 'কর্ম্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে রচিত। উড়িষ্যায় জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর আশ্রয়ে 'কাঞ্চীকাবেরী' ছাড়াও তিনি কালীদাসের 'কুমারসম্ভবে'র আংশিক অনুবাদ করেছিলেন।

রঙ্গলাল সম্ভবত অনুভব করেছিলেন কাব্যরচনায় মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্যে'র অনুসরণ যেমন নয়, তেমনি ঈশ্বর গুপ্তীয় খণ্ড কবিতাতেও বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না, তাই পদ্মিনী আখ্যানের পথ ধরেই অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। বাংলা কাব্য রচনায় ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যধারাই যে দিগদর্শক হবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। রোমান্টিক কাব্য রচনার এই বাতাবরণটিই স্বতন্ত্র ভাবে-রূপে বিহারীলাল ও তাঁর অনুসারীদের গীতিকবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

11.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার প্রয়োজনেই কাব্যরচনা করেন। প্রথাসিদ্ধ পদ্য লেখার পরিবর্তে সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত তাঁর কবিতাজগৎ জীবনাশ্রয়ী। দেশ-কাল সচেতন নানা বিষয় নিয়ে তিনি পাঠ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় ভাবাবেগ ও জীবনবোধের গাঢ়তার কোনো পরিচয় নেই; আছে জীবনের উপরিতলকে আশ্রয় করে নানা রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা। কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একাধিপত্য করলেও এ সময়ের রোমান্টিক জীবনাবেগের যে তরঙ্গবিক্ষেপ বাঙালির চিত্তলোককে উদ্বেল করছিল তা ধারণ ও প্রকাশ করবার মত শক্তি তাঁর ছিল না। রঙ্গলাল এই পালাবদলের সুরটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে তাকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় দিলেন। তাঁর পদ্মিনী, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী রাজস্থানের বীরগাথা নিয়ে লেখা। কাঞ্চীকাবেরী উড়িষ্যার কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। ইংরেজি কাব্য এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান প্রেরণা। সেখান থেকেই তিনি পদ্মিনীর স্বদেশপ্রেমের বাণী আহরণ করেছিলেন। মধুসূদনের তিলোত্তমা, মেঘনাদবধ এরই পরিণত ও সক্ষম অনুসরণ।

11.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নের উত্তর দিন। পরে ১৬৫ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক)	সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ	: ১৮৩১, ১৮১৮, ১৮৪৩
(খ)	পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশ	: ১৮৫৬, ১৮৬২, ১৮৫৮
(গ)	বীট্‌ন সোসাইটিতে বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক পাঠ করেন	: ১৮৫৮, ১৮৫২, ১৮৬০
(ঘ)	'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'— কোন কাব্যের পঙ্‌ক্তি	: কাঞ্চীকাবেরী, হিত প্রভাকর, পদ্মিনী উপাখ্যান

2. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম .... বাঙালিকে .... দীক্ষা দিয়েছেন।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত .... ঈশ্বর গুপ্ত .... (তিনি) আপন সময়ের .... ছিলেন।

(গ) যত ছুঁড়ীগুলো
..... হাতে নিচ্ছে যবে
তখন ..... সিখে ...... সেজে
.... বোল কবেই কবে।

3. (ক) ঈশ্বর গুপ্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম লিখুন।

(খ) পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

(গ) রঙ্গলালের রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করুন।

(ঘ) উড়িষ্যার জনশ্রুতি নিয়ে লেখা ......র কবি ....।

(ঙ) তুমি মা .... আমরা সব ....
শিখিনি ....।
কেবল খাব .... ঘাস।

(চ) রঙ্গলাল কালিদাসে ..... অংশটি অনুবাদ করেছিলেন।

4. (ক) ঈশ্বর গুপ্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম লিখুন।
   (খ) পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।
   (গ) রঙ্গলালের রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করুন।
   (ঘ) আধুনিক বাংলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

11.9 উত্তর সংকেত

11.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) আরাকান, সাংস্কৃতিক, জগতে, পরিবর্তন।
   (খ) লোরচন্দ্রানী, আলাওলের, মানবিক, দিগন্তের।
   (গ) অনুবাদ, মঙ্গল, বৈষ্ণব।
   (ঘ) রাধাকৃষ্ণ, উমাসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিরসের।
   (ঙ) খ্যাতির, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, দাশু রায়।
2. সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।
3. উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

11.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ১৮৩১, (খ) ১৮৬২, (গ) ১৮৫২, (ঘ) পদ্মিনী উপাখ্যান।
2. (ক) তাঁর কবিতায়, দেশপ্রেমের।
   (খ) Realist, Satirist, অগ্রবর্তী।
   (গ) তুড়ী মেরে, কেতাব, এ. বি., বিবি. বিলাতী।
   (ঘ) 'কাঞ্চীকাবেরী'র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
   (ঙ) কল্পতরু, পোষা গরু, সিং বাঁকানো, খোল বিচালী।
   (চ) 'কুমারসম্ভবে'র।
3. উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

11.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 12 ❑ আধুনিক বাংলাকাব্য

গঠন

12.1 উদ্দেশ্য
12.2 প্রস্তাবনা
12.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ আখ্যানকাব্য
12.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
12.5 অনুশীলনী 1
12.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ মহাকাব্য
12.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
12.8 অনুশীলনী 2 (আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য একত্রে)
12.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ঃ গীতিকবিতা
  12.9.1 মাইকেল মধুসূদন দত্ত
  12.9.2 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
  12.9.3 নবীনচন্দ্র সেন
  12.9.4 বিহারীলাল চক্রবর্তী
  12.9.5 সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
  12.9.6 গোবিন্দচন্দ্র দাস
  12.9.7 দেবেন্দ্রনাথ সেন
  12.9.8 অক্ষয়কুমার বড়াল
  12.9.9 দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
  12.9.10 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  12.9.11 মহিলা কবিগোষ্ঠী
12.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
12.11 অনুশীলনী 3
12.12 উত্তর সংকেত
12.13 গ্রন্থপঞ্জি

12.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান কবি ও কাব্য সম্পর্কে বিশদ পরিচয় পাবেন।
- আলোচ্য বিষয়—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য—এই তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের প্রকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। সে সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

● এককটি পড়ে আপনি বাংলা কাব্যের কয়েকজন বড় কবির সম্পর্কে জেনে, নিজেও সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

12.2 প্রস্তাবনা

যুগসন্ধিপর্বে ইংরেজাধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস দেশ-কাল-সমাজ ও অর্থনীতি তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতে নীরব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সংস্কার ধীরে ধীরে অপসৃত হল। বাঙালির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন বোধ সঞ্চরিত হচ্ছে, এ পরিচয় ক্রমান্বয়ে কবিওয়ালাদের রচনা—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও বঙ্গলালের আখ্যানমূলক কবিতায় স্পষ্টতর হয়েছে। বাঙালি নব্যপাঠক এটি উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে উনিশ শতকের আধুনিক জীবন ভাবনার দিকে বাঙালির কবি-মনীষা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। আর এখান থেকেই আধুনিক বাংলা কাব্যের মুক্তি বলা যায়। এ সম্পর্কেই বর্তমান এককে তিনটি অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি যথাক্রমে আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য। প্রত্যেক অংশেই প্রধান কবি ও তাঁদের কাব্যের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

12.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ আখ্যানকাব্য

মধ্যযুগের আখ্যানমূলক কাব্য ছিল মূলত পৌরাণিক দেব-দেবী বা অ-পৌরাণিক দেবতার পুরাণিকৃত রূপের মহিমা প্রচারমূলক। একদিকে সমকালীন শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানসিক শক্তি সঞ্চার ও অপরদিকে দেবতার চরণাশ্রয়ে পার্থিব স্বস্তি, স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ—এ ছিল কাব্য রচনার প্রেরণাস্থল। তাই এ মঙ্গল-দেবতা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এক অভিনব দেবকল্পনা। এখানে বাঙলার অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাবে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য। বাঙালির সমাজ ও পরিবারজীবনে যে নারীপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তার সঙ্গে এ দেবতারাও যেমন মান্যতা পেয়েছে, চরিত্র পরিকল্পনায়ও তেমনি বেহুলা, ফুল্লরা, লহনা-খুল্লনা, কানড়া-ই সমধিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ কাব্যের কাহিনী প্রধানত বাঙালির জীবন-অভিজ্ঞতা আশ্রয়ী। পরে মুসলমান রাজশক্তির চাপে আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের ভক্তিবাদ দৈবানুগ্রহের ওপর নির্ভরতার সূত্রে এ কাব্যের দেবতাদের অলৌকিক কৃৎ-কর্ম যুক্ত হয়। ফলে, দেবতার সন্তোষ-অসন্তোষের ওপর মানুষের শুভাশুভ নির্ভরশীল, পুরুষকার নয়—দৈবই সর্বশক্তিমান, এ প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

যুগসন্ধিকালে ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য হলেও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশ প্রেমের সূত্র ধরেই সাহিত্য পথ-পরিক্রমা করলেও ইংরেজি রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনীকাব্যের অনুসরণে কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। তাঁর কাব্যের উপকরণ হিসেবে তিনি কল্পিত উপকরণের পরিবর্তে দেশপ্রচলিত ইতিহাস বা কিংবদন্তীর থেকে উপাদান নিয়ে রোমান্টিক প্রণোয়োপাখ্যানের সঙ্গে স্বদেশ প্রেমের ভিয়েন দিয়েছেন। নব্যশিক্ষিত বাঙালির অবচেতনায়ও এ সময় পাইক-কোল-সাঁওতাল প্রভৃতি বিদ্রোহ ও আন্দোলনের ফলে, পরাধীনতার গ্লানিও সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। টডের 'রাজস্থান' এতে সমিধ জোগায়। ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় টডের গ্রন্থ অবলম্বনে রাজস্থানের বীরগাথার সাহায্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ বাঙালির দেশগৌরববোধ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। এতে টমাস মূরের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও

সেক্সপিয়র-স্কট-বায়রন প্রভৃতি ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের কিছু প্রভাব আছে। এভাবে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কাঞ্চী-কাবেরী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যে রঙ্গলাল আখ্যান কাব্যের ধারা সূচনা করেছেন। পরবর্তীকালে মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অনেক কবি এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) টডের Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর অবরোধ ও পদ্মিনীর স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য চিতায় আত্মবিসর্জনের মহিমময় কাহিনী নিয়ে রচিত। পদ্মিনীর শৌর্যবীর্য প্রতিপাদক এই কাহিনী ঐতিহাসিক পরিবেশে উপস্থাপিত হওয়ায় একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। রচনায় কোথাও কোথাও আধুনিক কবি মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও রঙ্গলাল সর্বত্র সেটি অনুসরণ করতে পারেননি। বীররসের বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রীয় প্রভাব কাটাতে পারেননি। 'কর্মদেবী' (১৮৫২) ও 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) রাজস্থানীয় কাহিনী। 'কর্মদেবী' পদ্মিনী উপাখ্যানের চেয়ে বেশি বর্ণময়। রঙ্গ লালের দেশপ্রেমের আদর্শ 'কর্মদেবী'তে স্পষ্টতর। উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯) রচিত। কর্মসূত্রে উড়িষ্যা বাসকালে রঙ্গলালের ওড়িয়া কবি পুরুষোত্তম দাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। রঙ্গলাল ঐ কাব্যটি অবলম্বনে সাত সর্গে তাঁর 'কাঞ্চী-কাবেরী' রচনা করেন। কোনো কোনো সর্গে মূলের অনুসরণ করলেও, রঙ্গলাল দু'-তিনটি সর্গে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই কাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা অংশে রাজপুত কাহিনীর প্রভাব আছে। আদি কাব্যে ভক্তিভাবের প্রাচুর্য ছিল, রঙ্গলালের কাব্যটি রোমান্টিক প্রণয়মূলক হওয়ায় ভক্তিভাব অনেকটা তরল। ভাষা সরল ও ছন্দপ্রবাহ সুললিত।

আখ্যানমূলক কাব্যধারায় রঙ্গলালের অভিনবত্ব পাঠকের রুচি পরিবর্তন ঘটালেও যুগান্তর আনতে সক্ষম হয়নি। তিনি নবজীবনোপলব্ধির মর্মস্থানটি স্পষ্ট করতে পারেননি বটে কিন্তু বাংলা কাব্যসাহিত্যকে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস, কবিওয়ালাদের স্থূল রঙ্গরসিকতা এবং ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের হাত থেকে রক্ষা করে স্বাদেশিকতা ও বীররসাত্মক উপাখ্যান পরিবেশনে উদ্যোগ নিয়েছেন।

পরবর্তীকালে এই ধারা অনুসরণে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসে, স্বদেশপ্রেম অনেকটা রোমান্স রসাচ্ছন্ন। 'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের ঘটনাক্রমকে অবলম্বন করে রচিত। এতে স্বাদেশিক মনোভাব মহৎ বীর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের রাজস্থানী ও পৌরাণিক কাহিনীর পরিবর্তে এ এক সম্পূর্ণ অভিনব আয়োজন। শতাব্দী-প্রাচীন ঘটনা হলেও সমকালের বাঙালি মানসে এটি অনেকটা জীবন্ত ঘটনা। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ইংরেজের জয় সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক মোহনলালের অসামান্য বীরত্ব স্বদেশপ্রেমী বাঙালির মনে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিল। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনার মাধ্যমে দেশের পরাধীনতার যে মর্মবেদনা ধ্বনিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। তাঁর অপর রচনা 'রঙ্গমতী' চট্টগ্রামের রাঙামাটি অবলম্বনে একটি কাল্পনিক কাহিনী। এখানে শিবাজীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি কাব্যটিতে স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ে আখ্যানকাব্য রচনা করে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ('উদাসিনী'—১৮৭৪) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বপ্নপ্রয়াণ'—১৮৭৫)। শেষোক্তটি স্পেন্সারের ফেয়ারি কুইনের আদর্শে রূপকধর্মী আখ্যানকাব্য। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮০) একটি উৎকৃষ্ট রোমান্সধর্মী আখ্যানকাব্য। আখ্যানকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে যে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও রোমান্টিক মনোভঙ্গি সক্রিয় ছিল সেটিকে মধুসূদনের কবিব্যক্তিত্ব ও শিল্পচেতনা একদিকে মহাকাব্য ও অপরদিকে গীতিকাব্যের ধারায় সঞ্চালিত করে। ফলে, আখ্যানকাব্যের স্রোত ক্রমশ মন্দীভূত হয় এবং গীতিকাব্যের ক্রম প্রতিষ্ঠা ঘটে।

12.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

রঙ্গলাল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তথাপি নূতন জীবনাদর্শের গভীরে যেতে পারেননি। ইংরেজ রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে অনুরক্তি থেকে বাংলায় পদ্মিনী, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী রাজস্থানের বীরগাথা অবলম্বনে লিখেছেন। কাঞ্চী-কাবেরী উড়িষ্যার প্রাচীন কাহিনীনির্ভর। এগুলিতে তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের গঠন, বর্ণনা—ভাষারীতিতে তিনি পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বীরবাহু এবং পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতী অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। পলাশির যুদ্ধে নানা হীন চক্রান্তের মধ্যে দেশপ্রেমিক মোহনলালের বীরত্ব স্বদেশপ্রেমী বাঙালির মনে আশার সঞ্চার করেছিল। অন্যান্য আখ্যানকাব্যের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী', ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-রূপক কাব্য উল্লেখযোগ্য।

12.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হলে ১৭৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচের দুই সারিতে কাব্য এবং প্রকাশকাল দেওয়া আছে। সঠিকটিকে চিহ্নিত করুন :

    (ক) পদ্মিনী উপাখ্যান : ১৮৬৮

    (খ) শূরসুন্দরী : ১৮৬৪

    (গ) 'বীরবাহু' কাব্য : ১৮৮০

    (ঘ) রঙ্গমতী : ১৮৫৮

    (ঙ) স্বপ্নপ্রয়াণ : ১৮৭৫

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

    (ক) 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রকাশ কাল : ১৮৭৫, ১৮৫৮, ১৮৬০

    (খ) 'কর্মদেবী' কাব্যটি লেখেন : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

    (গ) অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' : গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাটক।

3. (ক) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

    (খ) প্রথম অংশে বাংলা আখ্যানকাব্যের যে প্রধান বিষয়গুলি আপনার নজরে এসেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

12.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ঃ মহাকাব্য

পলাশির পর কোম্পানির ও পরে ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্য দিয়ে বাঙালির জনজীবনে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হচ্ছিল, তার সবটাই অনুকূল ছিল না। একশ্রেণীর মানুষ এ সময় বিদ্যা-বিত্তের মহার্ঘ সুযোগ পেয়ে যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল তেমনি দেশের অগণিত মানুষ ইংরেজের শোষণ ও শাসনে রীতিমত জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রয়াস শাসকসমাজকে বিব্রত রেখেছে। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়েও

যে বিষয়গুলি লক্ষণীয় হয়ে উঠছিল, তা হল মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভর ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে বাঙালি ক্রমশ মর্ত্যজীবন সম্পর্কে, সচেতন হয়ে উঠেছে। মাটি-মানুষ, জগৎ-জীবন সম্পর্কে এই সচেতনা থেকেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার প্রেরণা ক্রমশ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কর্মমহাযজ্ঞ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের তাগিদ এ বোধ থেকেই এসেছে। এই আধুনিক মন-মননের ফলেই স্বদেশ-স্বজনবোধ, পুরুষের মতই নারী-ব্যক্তিত্ব ও তার মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ক্রমশ ঘটেছে। দেশ ও সমাজের ধ্যান-ধারণার এই আমূল পরিবর্তন সমাজ-সংস্কৃতিতে যে যুগান্তর সৃষ্টি করে প্রধানত মহাকাব্যই তাকে ধরে রাখতে সক্ষম। কেননা মহাকাব্য জীবনকে সমগ্রত প্রকাশ করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তুলে" সেই শ্রেণীর কবিকে মহাকবি এবং তার কাব্যকে মহাকাব্য বলা যায় কিন্তু পূর্বে আলোচিত আখ্যান কাব্যের মধ্যে কিছু নূতন বিষয়ের, এমন কি কিঞ্চিৎ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ফুটে উঠলেও সমাজের জীবনের সমগ্র রূপ প্রতিভাত হয়নি।

মধুসূদন তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভায়, যুগজীবনের এই মহিমময় রূপকে মহাকাব্যের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য (১৮৬০) ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) রচনা করেন। 'তিলোত্তমা'য় তিনি বাংলা কবিতায় প্রচলিত কাব্যভাষা ও ছন্দের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। পয়ারের পদ্যবন্ধ থেকে মুক্ত করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম হল। কবিতায় এ হল নূতন অভিজ্ঞতা। তিলোত্তমার কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া। এ কাব্যের দেবতারা দুই ভাইয়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য থাকায়, সুন্দ-উপসুন্দের কাছে পরাজিত হলে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবতারা দেখা করে স্বর্গোদ্ধারের প্রার্থনা জানান। সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্য বিশ্বকর্মা সর্বজগৎ থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা সৃষ্টি করেন। পরিশেষে, তিলোত্তমার রূপ দর্শনে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব ও বিনাশ। শিল্প হিসেবে এটি দুর্বল রচনা হলেও মধুসূদন তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে যে সৌন্দর্য-চেতনা প্রকাশ করেছেন, তার সাহিত্যিক মূল্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের 'লঙ্কাকাণ্ডের লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের' যুদ্ধ এবং ইন্দ্রজিৎবধের কাহিনী অবলম্বনে মধুসূদন ন'টি সর্গে 'মেঘনাদবধকাব্য' সমাপ্ত করেন। মধুসূদনের তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। মধুসূদনের কবিমানস তাঁর রচনার দোষ-গুণ-ভাষার ভাল-মন্দ স্বদেশী-বিদেশী কাব্যঐতিহ্য গ্রহণের পরিমাণ ছন্দ-অলঙ্কারের শক্তি-দুর্বলতা সব নিয়েই এ কাব্যটি যে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল সে সমস্ত বিচার করে এটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়। তিলোত্তমায় সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর এখানে সার্থকতালাভ করেছে। মেঘনাদবধের কাহিনী বাল্মিকী ও কৃত্তিবাস অনুসরণে পরিকল্পিত হলেও চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তিনি পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্য স্বীকার করেননি। পাশ্চাত্য মহাকবিদের আদর্শ অনুসরণে তিনি ট্রাজিক লক্ষণাক্রান্ত মহাকাব্য রচনা করেছেন। গ্রিক সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত কবি রাবণ চরিত্রকে নিয়তিতাড়িত দেখিয়েছেন। তিনি সূচনায় 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বললেও কাব্যটি আদ্যন্ত করুণ রসাত্মক। আধুনিক জীবনবোধের প্রেক্ষিতে রাবণের শেষ পর্যন্ত এই মানসিক পরাভব যে মহাশূন্যের সৃষ্টি করেছে তা কাব্যটিকে একাধারে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির অনন্যসাধারণ রূপদান করেছে।

'মেঘনাদবধকাব্য' তার সমকালে প্রতিকূল অনুকূল সমালোচনা সত্ত্বেও মধুসূদনের এই অসামান্য সৃষ্টি সে যুগেই বহু কবিকে মহাকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের আখ্যানকাব্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের পরেই হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭) কাব্যের জন্য কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। মধুসূদন রামায়ণী কাহিনী আশ্রয় করলেও রাম-লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় সিদ্ধরসের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করায় হেমচন্দ্র পুরাণ ও ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় অধিকতর মনোযোগী হন। তিনি পৌরাণিক বৃত্রসংহারের কাহিনীর সঙ্গে সমকালের স্বদেশবোধের পরিমণ্ডল যুক্ত করে কাহিনীগত বিশালতা ও বর্ণনাগত সংহতি প্রদান করেছেন। এর ফলে 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যোচিত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কাব্যের চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদনের প্রভাব পূর্বাপর লক্ষণীয়। বৃত্র-রাবণ, ইন্দ্র-রামচন্দ্র, রুদ্রপীড়-মেঘনাদ, জয়ন্ত-লক্ষণ চরিত্রে মধুসূদনের প্রভাব থাকলেও, ঐন্দ্রিলা অনেকাংশেই মৌলিক সৃষ্টি। ভাষাছন্দ প্রয়োগেও হেমচন্দ্রের দুর্বলতা আছে। তাই বলা যায়, 'বৃত্রসংহারে'র আখ্যানভাগে মহাকাব্যিক মহিমা থাকলেও, সমগ্রতার বিচারে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকাব্য রচনার উপযুক্ত, তিনি কিছু বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করেছেন। গীতিকাব্য প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হবে।

নবীনচন্দ্র 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা বলে সমধিক খ্যাত। তাঁর 'রৈবতক' (১৮৮৭)—কৃষ্ণের আদিলীলা, 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩)—মধ্যলীলা এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) অন্তিমলীলা নিয়ে রচিত। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'রৈবতককাব্যে উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।' এই তিনটি কাব্যের উপাদান যেহেতু কৃষ্ণকে অবলম্বন করে এবং কাহিনীর মধ্যে একটি পরম্পরা আছে, তাই তিনটি কাব্যকে এখানে 'ত্রয়ী' কাব্য বলা হয়। কর্মসূত্রে পুরী ও রাজগীরে যাবার সময় তিনি কৃষ্ণজীবন অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার কথা ভাবেন। তারই ফলশ্রুতি 'ত্রয়ী' মহাকাব্য ১৯ শতকের দেশ, সমাজ, নীতি ও দর্শনের প্রভাব এখানে ব্যাপক। সম্ভবত এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ত্রয়ীকে "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" (The Mahabharat of the Nineteenth Century) বলে আখ্যাত করেছিলেন।

রৈবতকে সুভদ্রা-অর্জুনের বিবাহ—কুরুক্ষেত্রে এঁদের পুত্র অভিমন্যুর নিধন এবং প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিশাল-বিস্তৃত কাহিনীর মধ্যে পুরাণের ওপর রোমান্টিক কল্পনার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯ শতকের য়ুরোপীয় সমাজ-দর্শন, নীতিতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানবসত্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলে, বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করে গীতার নিষ্কামধর্ম প্রচার করেছেন। এর ফলে কাব্যত্রয়ীতে পৌরাণিক সত্যের অপলাপ ঘটায় কালানৌচিত্যদোষ-এর জন্য সঠিক সমাদর লাভ করেনি। তদুপরি তাঁর ভাষা ও ছন্দপ্রয়োগ বাচনভঙ্গি ও অসংযত উচ্ছ্বাসে মহাকাব্যের মহিমাচ্যুত হয়েছে। বস্তুত তাঁর প্রতিভা রোমান্টিক গীতিকবির প্রতিভা তাই মহাকাব্য রচনায় তেমন সার্থক হতে পারেননি।

মধুসূদনের থেকে (মেঘনাদবধ ১৮৬১), নবীনচন্দ্রের (প্রভাস ১৮৯৬) রচনাকালের পরিসীমা এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। তার পরেও অনেক কবি মহাকাব্য রচনা করেছেন। যেমন বলদেব পালিত (কর্ণার্জুন কাব্য ১৮৭৫), ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (পাণ্ডবচরিত কাব্য ১৮৭৭), মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ও শিবাজী ১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। কাব্যগুলিতে অলঙ্কার শাস্ত্র বা মধুসূদনের অনুসরণ প্রয়াস থাকলেও প্রতিভার অপ্রতুলতায় সার্থক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এ সময় কাব্য রচয়িতাদের গীতিপ্রাণতার ধারাটি রোমান্টিক ধারায় বর্ণনামূলক কাব্য রচনার পথ ধরেই ক্রমে গীতি কবিতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

12.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৬০) বাংলা সাহিত্যেও নূতনত্বের সূচনা হয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ ও সেখানে তাঁর নিজের ও তরুণতর কবিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগের মধ্য দিয়েই নতুন যুগের নতুন কবিভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাংলা সাহিত্য ক্রমশ নিজস্ব ঐতিহ্যের আবহাওয়াতেই নবযুগের মানসিকতার উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই ধারার সূচনা করেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল।

যুগসন্ধির সমস্ত লক্ষণ সত্ত্বেও রঙ্গলাল নবযুগের নতুন কবিতার সূচনায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাহিনী ও উপস্থাপনায় কতকগুলি নূতনত্ব এনেছে। মূর, বায়রন, শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের শিল্পিত রূপ বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম নিয়ে অসেন। পুরাণের পরিবর্তে ইতিহাস বিশেষত টডের 'রাজস্থান কাহিনী' তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগের প্রথম আশ্রয় হয়েছে। আখ্যানকাব্যের এই ধারায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরাও বিচরণ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাহিনী কাব্যে যে দুটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সফল মহাকাব্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে রঙ্গলালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বাঙালি পাঠকের রুচি পরিবর্তন এবং নূতন যুগের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে অনেকাংশে সফল।

যুগন্ধর মধুসূদন স্বকীয় প্রতিভায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের ধারাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেই পথেই বিচরণ করেছেন কিন্তু ততটা সফল হতে পারেননি। পরবর্তীকালে এদের যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি, যে, ব্যক্তি হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাসের মুক্তি গীতিকবিতায় এবং মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা এবং হেমচন্দ্রের কবিতাবলিতে তার সূচনা ঘটেছে।

12.8 অনুশীলনী 2 (আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য একত্রে)

নীচেব প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। পরে ১৮০ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন :

1. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক) 'শূরসুন্দরী' কাব্যের রচয়িতা : 1. মধুসূদন, 2. হেমচন্দ্র, 3. রঙ্গলাল

(খ) 'বীরবাহু' কাব্যের রচয়িতা : 1. হেমচন্দ্র, 2. মধুসূদন, 3. নবীনচন্দ্র

(গ) রঙ্গমতী' কাব্য রচনা করেছেন : 1. ১৮৭৫, 2. ১৮৫৮, 3. ১৮৮০

(ঙ) 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের রচনাকাল : 1. ১৮৫৮, 2. ১৮৬০, 3. ১৮৬২

2. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) ______বাংলার মাটিতে খ্রিস্ট এক ________দেবকল্পনা।

(খ) রঙ্গলালের কাব্য _______পরিবর্তন ঘটলেও _______আনতে সক্ষম হয়নি।

(গ) 'পলাশির যুদ্ধ' _______সন্ধিক্ষণের _______অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) অক্ষয় চৌধুরী কাব্যের নাম ________ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য _______।

(ঙ) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ———— একটি উৎকৃষ্ট ————আখ্যানকাব্য।

(চ) ——— রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্য ——— সর্গে সমাপ্ত। কাব্যটি আদ্যন্ত———।

3. (ক) অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্য বলতে কী বোঝানো হচ্ছে আলোচনা করুন।

(গ) 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য' মন্তব্যটি কার এবং কোনো কাব্য সম্পর্কে বলুন।

(ঘ) 'মেঘনাদবধ' কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঙ) হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

(চ) নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের খণ্ড ত্রয়ীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

12.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ঃ গীতিকবিতা

গীতিকবিতা বলতে সাধারণত কাহিনীবর্জিত গীতিমূলক চোট কবিতা বোঝায়। এখানে কবির মনের জমে থাকা বা গড়ে ওঠা ভাব অভিব্যক্তি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন করা গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র ভাবের সংহত প্রকাশের মধ্যে গীতিকাব্যের লক্ষণ দেখেছেন। সেখানে ভাষা, ছন্দস্পন্দ, উপমার স্বকীয়তা ও নুতনত্ব কবিঅনুভূত ভাবকে অভিনব রূপ দেয়। কিন্তু সেগুলি যদি আপেক্ষিক নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রকাশিত হয় তবেই তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। ইংরেজ রোমান্টিক ও ফরাসি সিম্বলিস্ট এমনকী মিস্টিক কবিরা স্বকীয় নিবিড় অনুভব ও আবেগের সঙ্গে ধ্বনিবিন্যাসের সৌষম্যের যে আদর্শ রূপায়িত করেছেন, তাই পরবর্তীকালে গীতিকবিতা রচয়িতাদের আদর্শ হিসেবে মান্য হয়ে আসছে।

ভারতীয় প্রাচীন গীতিকাব্য বিশেষত ঋক ও অথর্ববেদের সংগীতগুলি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হলেও, সেগুলি মহিমান্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই বর্ণনা। সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে লৌকিক ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা গীতিকাব্যের ঐশ্বর্য চর্যাগীতির যুগ থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনীকাব্যের বহুলাংশেই গীতি-উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত। এই দেশী-বিদেশী গীতিময়তাকে অঙ্গীকার করেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

12.9.1 মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালেই মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছেন, "I think I have a tendency in the lyrical way"—সম্ভবত সেই মর্মগত গীতিব্যাকুলতা থেকেই তাঁর 'রাধাবিরহ' (রচনা ১৮৬০) নামান্তরে 'ব্রজাঙ্গ না' (১৮৬১) কাব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়। হৃদয়পাশে বন্দিনী যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহ্য করে, তারাই এ কাব্যের নায়িকা। ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা আর বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা এখানে প্রেমময়ী নারীচিত্তের চির বঞ্চনার আর্তি প্রকাশে নিত্যকালের বাঙালি মনের পক্ষে নিরপেক্ষ আবেদনে সমৃদ্ধ। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' দেশকাল-নিরপেক্ষ চিরন্তন মানব হৃদয়ের আর্তিকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন এ কবিতাগুলিকে ode (কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা) আখ্যাত করেছেন। 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিতা মধুসূদনের এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম lyric বা গীতিকবিতা।

'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) ওভিদ (Ovid)-এর হেরোইডস্ (Heroides) অনুসরণে রচিত পত্রকাব্য। এখানে বিভিন্ন

নায়িকা তাদের স্বামী বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রেম উদ্বোধিত চিত্তে চিঠিগুলি রচনা করেছেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে এগারোটি নারীচরিত্র সংগ্রহ করে কবি তাদের দিয়ে কবিতা-পত্র রচনা করিয়েছেন। পত্র রচয়িতারা হলেন সোমের প্রতি তারা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নালধ্বজের প্রতি জনা প্রভৃতি। প্রত্যেক পত্রের রচয়িত্রী বীর পত্নী বা প্রণয়িনী। পত্রগুলি ভাবকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ, মুখ্য বিষয় আত্মমগ্ন রোমান্টিক প্রেম। এর ভাষা গীতিকবিতার অনুসারী। এখানে বীর, করুণ প্রভৃতি রসের সার্থক প্রয়োগ করেও কবি গীতিকবিতা সুলভ ললিতমধুর রসসৃষ্টিতেই অধিকতর সার্থকতা দেখিয়েছেন।

'বীরঙ্গনা' রচনার চার বছর পর বিলেত থেকে ফিরে মধুসূদন তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) প্রকাশ করেন। যুরোপীয় 'সনেটে'র অনুসরণে তিনি বাংলা কাব্যে 'চতুর্দশপদী কবিতা' প্রবর্তন করেন। বিদেশে বাসকালে বাল্য-কৈশোর-স্মৃতি, বাঙালির বারব্রত, পূজা-পার্বণ, দেশী-বিদেশী কবিদের স্মৃতি তাঁর কবিহৃদয়কে উদ্‌বোধিত করেছিল। তারই আন্তরিক তাড়নায় সনেটগুলির সৃষ্টি। এতদিন মহাকাব্য, নাটক ও পত্রাবলির মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের যে অন্তরঙ্গ অভিলাষ, আত্মরতির যে স্বচ্ছন্দ বিকাশ প্রকাশের সুযোগ পায় নি, সেগুলি সনেটের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

12.9.2 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' (১৮৬১) 'কবিতাবলী' (প্রথম ১৮৭০, দ্বিতীয় ১৮৮০) ও 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) গীতিকাব্যের সংকলনগ্রন্থ। সতীর্থ শ্রীশচন্দ্র সেনের উদ্বন্ধনে মৃত্যুতে শোকার্ত কবির বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি 'চিন্তা-তরঙ্গিনী'। এখানে চিন্তার চেয়ে আবেগ বেশি। রচনাভঙ্গিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আছে। গীতিকবিতা রচনায় হেমচন্দ্র প্রায় কোনো পর্যায়েই নিজ ভাবনাকে sentiment-এর গণ্ডি থেকে গাঢ়বদ্ধ emotion-এ পরিণত করতে পারেননি। কবিতাবলির কয়েকটি কবিতা যেমন—লজ্জাবতী, যমুনাতটে, পদ্মের মৃণাল, জীবন-মরীচিকা-য় অনুভূতির মন্ময়তা অনুভব করা যায়। 'ভারতবিলাপ' পরাধীন জাতির বেদনা বিধুরতায় আচ্ছন্ন। এই কবিতায় দেশপ্রেমের উত্তেজনাময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবিতাটি রচনার জন্য হেমচন্দ্র রাজরোষে দুর্ভোগ ভুগেছেন। পরে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রাজকুমারের ভারত আগমন উপলক্ষে "ভারতভিক্ষা" কবিতা লিখে পুরনো অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারতভিক্ষা' দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের কবিতা। হেমচন্দ্রের দুর্বল কবিচিত্ততার পরিচায়ক। 'চিত্তবিকাশ' কাব্যটিও উল্লেখ্য। এটি কতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি। শিল্প সৌকর্যের অভাব আছে। মর্মবেদনার উৎসজাত বলে এর গীতিধর্ম অন্তরকে স্পর্শ করে।

12.9.3 নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম ১৮৭১, দ্বিতীয় ১৮৭৮) দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এর কয়েকটি কবিতা কাহিনী সমাশ্রিত ও দীর্ঘ। নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ভাবালুতা বাঙালিসুলভ আতিশয্যকে অতিক্রম করেছিল। তাঁর মধ্যে একজন আত্মমুগ্ধ প্রচারপ্রয়াসী ব্যক্তিত্ব ছিল। প্রেম, প্রকৃতি, গৃহজীবন এবং স্বদেশচিন্তা তাঁর 'অবকাশ রঞ্জিনী'র কিছু কবিতাকে সার্থক গীতিকাব্যের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

12.9.4 বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)

মধুসূদন সৃষ্টিশীল মনীষায় গীতিকবিতার যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিষয়গৌরব ও বহুধা আঙ্গিকচর্চার সূচনা করেন তা বিহারীলাল চক্রবর্তী আবির্ভাব লগ্নটিকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ

সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিনী' (১৮৭০) এবং 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন' (১৮৮৯) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বিহারীলালের মধ্যে একটা অকারণ, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, একটা অপ্রকাশিত অভাবের অস্বস্তি নিয়ত ধূমায়িত হোত। তাঁর কবিতার প্রেরণায় এই অজ্ঞাতপূর্ব অনুভূতি সক্রিয় ছিল। তাঁর কবিতায় এ ছিল এক নূতন অনুভব, নূতনতর অভিজ্ঞতা। তিনি নিজের মনের রঙ দিয়ে বাইরের বস্তুকে রঞ্জিত করে দেখেছেন। এদিক থেকে তাঁকে প্রথম গীতিকবির মর্যাদা দিতে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রথমোক্ত তিনজন কবি থেকে বিহারীলাল আরও একদিক থেকে উল্লেখযোগ্য; তিনিই প্রথম কবি যিনি গীতিকবিতা ছাড়া কার্যত অন্য শিল্পকর্মে প্রবেশ করেননি। বিহারীলাল প্রকৃতির অতি কোমল অংশের উপাসক। তাঁর সঙ্গীতশতক, বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী— ব্যতিক্রমী রচনা। নূতন যুগের নূতন কবিতার আস্বাদ পাওয়া গেল তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' এবং 'নিসর্গ সন্দর্শনে'। প্রথমেই কবির ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টির সূত্রপাত। প্রথম কাব্যটিতে 'নারী সম্বন্ধে রোমান্টিক' ধারণার আর দ্বিতীয়টিতে সৌন্দর্য বর্ণনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীজাতি সম্পর্কে যে নূতন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল, 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিহারীলাল নারীকে প্রেমময়ী রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করে, পারিবারিক জীবনে তাকে 'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী/স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী' রূপে আবিষ্কার করেছেন।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'সাধের আসন' একই ভাবচেতনার অনুসরণমাত্র। সারদা বা সরস্বতী এখানে সাধারণ ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। এই দেবী কবিমনে সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমোপলব্ধির কল্পিত রূপ। তিনি কখনো জননী, প্রেয়সী বা কন্যা। মূর্তিমতি সৌন্দর্য এবং দয়া, স্নেহ ও প্রেমের প্রতীক। সারদা শেলির spirit of beauty-র সমগোত্রীয়—কখনো বালিকা, কখনো সুন্দরী ষোড়শী, কখনো কবির প্রণয়িনী। এই সারদাকেই তিনি আপন অন্তরে পেতে চেয়েছেন। সারদা তাঁর কাছে দেবী, প্রেম তাঁর পূজা। তাই লক্ষ্মীর ধনসম্পদে তাঁর কিছুমাত্র কামনা নেই। এই রোমান্টিক কবি-কল্পনা বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। এ থেকেই এসেছে এক অকারণ বেদনা। কবি যাকে বলেছেন, "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ।" এই ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তিনি 'সারদামঙ্গল' রচনা করেছেন। এভাবে তিনি বাংলা গীতিকাব্যে এক বিশুদ্ধ রোমান্টিক ধারার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার পথিকৃৎ মধুসূদন থেকে স্বতন্ত্র। কেননা, মধুসূদনের কবি প্রতিভায় ছিল ক্লাসিসিজম্-রোমান্টিসিজমের সংমিশ্রণ। বিহারীলাল নির্দ্বন্দ্ব মনের পরিচয় দিয়ে বাংলা কবিতায় পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন।

12.9.5 সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮)

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার আন্দোলন, বঙ্গসুন্দরী-সারদামঙ্গলে রোমান্টিক কবি কল্পনায় নারীত্বের যে মহিমান্বিত রূপ বিহারীলাল জননী-জায়া-ভগিনী-কন্যায় অঙ্কন করেছেন, সেই ধারাবাহিকতাকে সুরেন্দ্রনাথ আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি নারীর উক্ত চারটি সামাজিক অবস্থা অবলম্বনে মহিলা (প্রথম ১৮৮০, দ্বিতীয় ১৮৮৩) কাব্য রচনা করেন। জায়া, জননী এবং ভগিনীর কিয়দংশ রচনার পর কবির মৃত্যু হয়। যদিও এই কাব্যরচনায় বিহারীলালের প্রভাব প্রত্যক্ষ; তথাপি কবি 'নারী' সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আবেগসঞ্জাত একটি ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা' কাব্যে প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকে অবলম্বন করে, তাকে দার্শনিক যুক্তি দিয়ে শোভন ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর ভাষার উচ্ছ্বাস সংযত, বক্তব্য সংহত ও গাঢ়।

12.9.6 গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮)

ভাওয়াল পরগনার এই কবি স্বভাব-কবি পরিচয়ে খ্যাত। তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল না। তদুপরি দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে জীবনযাপন করতে হয়েছে। বাংলাদেশের জন-হাওয়ায় তাঁর কবিতা ও কবিত্ব অনেকটা সিদ্ধবস্তু ছিল। প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস নিঃসঙ্কোচ দেহ-কামনা, বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং সমকালীন জীবন থেকে আহৃত রোমান্টিক বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কল্পনায় ভোগবাদ ও নারীদেহ কামনার তীব্রতা লক্ষণীয়। তিনি বলেন, 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংসসহ/অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ'। গোবিন্দদাসে ইন্দ্রিয়ানুগত্যের, লৌকিক কাম-ভাবনার প্রাধান্য আছে। তাঁর মধ্যে বড় কবির কিছু সম্ভাবনা থাকলেও ভাষার অসংযম ও রূপনির্মিতির দুর্বলতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলির মধ্যে 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৭), 'কুঙ্কুম', (১৮৯১), 'কস্তুরি' (১৮৯৫), 'চন্দন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

12.9.7 দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও কবির ঘনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ওপর রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব আছে। তাঁর কাব্যের উপজীব্য প্রেম। গীতিকবি হিসেবে তাঁর কল্পনা বস্তুকে অতিক্রম করেছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে একই সঙ্গে ধ্রুপদী (classical) বন্ধন-দৃঢ়তা, সৌন্দর্য-রূপ-মুগ্ধতা এবং দাম্পত্য প্রেমের স্বভাবমাধুর্য সুন্দর রস ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলবালা' (১৮৮০)। অপরাপর কাব্য—'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'শেফালি গুচ্ছ' (১৯১২) ও 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২)। এই কাব্যগ্রন্থগুলি কবির মৌলিক ও বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর কবিতায় ভাবে, ভাষায় ও ছন্দের সৌকর্যে মৌলিকতার পরিচয় আছে।

12.9.8 অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)

"মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা" বলে যিনি নারী সম্পর্কে সমস্ত রোমান্টিকতার কুয়াশা ছিন্ন করে তাকে সমাজে ও সংসারের 'সেবা-মায়া, পাপ-পুণ্যের মধ্যে এনে মানবী সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই অক্ষয়কুমার বড়াল গীতিকাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি। এঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থে ('প্রদীপ' ১৮৮৫, 'কনকাঞ্জলি' ১৮৮৫ ও 'ভুল' ১৮৮৭) বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ এবং মধুসূদনের সীতা, প্রমীলার নারীচৈতন্যের সমন্বয়পুষ্টি লক্ষ করা যায়। কাব্যসাধনার এ পর্বে বাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতার বিষয় তাকে তাঁর প্রেম-পিপাসা নায়িকার রোমান্টিক সত্তাকে আবিষ্কার না করে কল্পনার স্বর্গলোকে অভিসার করেছে। কিন্তু 'শঙ্খ' কাব্যের শেষ পর্যায়ে কবির বাস্তবচেতনা, অনেকটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। তিনি পৃথিবীর রূপ-রঙ-রসের বিচিত্র সৌন্দর্যভাণ্ডারকে আবিষ্কার করেন। এমন সময় স্ত্রীবিয়োগ তাঁর প্রেম কল্পনায় আঘাত করে। প্রচণ্ড আন্তর্বেদনা ক্রমশ শোককাব্যরসে পরিণত হয়। এর থেকে 'এষা' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের সূচনা। বাংলা সাহিত্যে এটি শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। মৃত্যু, অশৌচ, শোক, সান্ত্বনা—এই চারটি সর্গে 'এষা' রচিত। কবিহৃদয়মথিত শোক যেন চারটি তরঙ্গের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির তটরেখায় এসে শেষ হয়েছে। কবির যে শোক সহসা করুণ রসের সৃষ্টি করেছিল, তা ক্রমে মহৎ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কাব্য-সুধায় পরিণত হয়েছে। 'এষা'র অনন্যতা এখানেই।

12.9.9 দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৫৮-১৯২০)

বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর কবিকৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়। অনেকে মনে করেন, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যখ্যাতি তাঁর কবিপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন করেছে। বাল্যেই তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল।

তাঁর প্রথম কাব্য মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মত ইংরেজি ভাষায় লেখা 'The Lyrics of Ind'-। প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১৮৮২, ১৮৯৩) গ্রন্থটির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কতকগুলি গান আছে যা কাব্য হিসেবে সম্পূর্ণ, পাঠকমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। তাঁর 'হাসির গান' (১৯০০) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে এমন একটি সুর ও ভঙ্গি আছে যা বাংলায় পূর্বে বা পরে আর দেখা যায়নি। এগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছাড়া কবির 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র' আলেখ্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সুমার্জিত ভাষা, ছন্দ ও প্রসাধনকলার নৈপুণ্য ধরা পড়ে। তিনি দেশবাসীর চরিত্রের উন্নতি, মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতি গৌরব জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

12.9.10 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বপ্নপ্রয়াণের কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদ ছাড়াও 'কাব্যমালা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য, সুমিষ্ট কবিত্ব, বিচিত্র ছন্দসৃষ্টি, কোমল-মধুর ভাষা এবং রুচিপূর্ণ হাস্যরস প্রভৃতির মিশ্রণে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'কাব্যমালা' রচনা করেছেন।

12.9.11 মহিলা কবিগোষ্ঠী

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটে। এক সময় দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা ঘরের চার দেওয়ালে তাদের অন্তরের ভাষাকে মূক করে রেখেছিল। এ সময়ে কয়েকজন উদারচেতা মানুষের চেষ্টায় গৃহ প্রাঙ্গণ ছেড়ে বাইরে এসে কিছু মহীয়সী নারী তাঁদের হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করলেন। বাংলা কাব্য-প্রাঙ্গণে শত পুষ্প বিকশিত হল। আলোচ্য অংশে পুষ্পের রস-সৌরভ যাঁরা বিতরণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হচ্ছে :

গিরীন্দ্রমোহিনী (দত্ত) দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) ঃ কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২), 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭)। নারী তার সাংসারিক জীবনেও কত সহজে সুখ-সম্পদকে উপভোগ করতে পারে, তার সার্থক পরিচয় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় পাওয়া যায়। স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। স্বামী বিয়োগের পর প্রকাশিত 'অশ্রুকণা'য় কবির প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যাথাতুর হৃদয়ের পরিচয় আছে। কবিতাগুলি পাঠকের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা আকর্ষক।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ঃ ১৯ শতকের শেষার্ধে যে ক'জন মহিলা কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'আলোছায়া'র (১৮৮৯) কবি কামিনী রায় শ্রেষ্ঠ। তাঁর 'মাল্য' ও 'নির্মাল্য' (১৯১৩), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। শেষোক্তটিতে কয়েকটি কবিতায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি কবির সহানুভূতির প্রকাশ আছে। কামিনী রায়ের কবিতায় আত্মভাবের প্রাধান্য আছে। সে যেন তাঁর প্রাণের কথা; কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের মিল নেই, তার জন্য তিনি দুঃখ পান, অর্থাৎ তাঁর কবিতার ভাব ব্যক্তিগত হলেও সমাজ ও জাতি সম্পর্কে তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তবে রচনারীতিতে তিনি বিশেষ কোনো নূতনত্ব দেখাতে পারেননি, বা নূতন কোনো পথের সন্ধানও করেননি।

মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী **মানকুমারী দত্ত (বসু)** (১৮৬৫-১৯৪৩) : অন্যতম বিখ্যাত কবি। পিতৃগৃহ-শ্বশুরালয়ে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ থাকায় তাঁর কবিত্বশক্তি স্ফুরণে বাধা হয়নি। সূক্ষ্ম অনুভূতি অন্তরের আবেগের স্পন্দন, ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাধারণ সামাজিক জীবনের উপযোগী ভাব-চিন্তার গুণে ইনি বাংলার মহিলা

কবিদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'কুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩) কাব্যে তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) তাঁর অপর কাব্য। নীতিবোধ ও সংযম মানকুমারীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইতোমধ্যে বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির প্রাচুর্য এক বিস্ময়। এ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা একটি স্বতন্ত্র এককে বিন্যস্ত হবে।

12.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যে অনুরাগী কবি মহাকাব্য রচনার পাশাপাশি নতুন নতুন আঙ্গিকে গীতিকাব্য রচনা করে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা'র বিষয় নির্বাচন ও ছন্দকারুকার্য লক্ষণীয়। 'বীরাঙ্গনা'র পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় সম্পূর্ণ আধুনিক নারীসত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কবির আত্মগত ভাবনার সংযত-সংহত প্রকাশ। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম সনেটের বই।

হেমচন্দ্র তাঁর সময়ে জনপ্রিয়তা পেলেও মধুসূদনের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর 'চিন্তা-তরঙ্গিনী', 'কবিতাবলী' ও 'চিত্তবিকাশ' গীতিকাব্য সংকলন। 'ভারত বিলাপ' কবির স্বদেশ প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ভাবালুতা ও আত্মপ্রচারের প্রয়াস আছে। 'অবকাশ রঞ্জিনী' তাঁর গীতিকাব্য সংগ্রহ।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক কবিমন থাকলেও তাঁরা আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হলেও, গীতিকবিতাতেও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিহারীলালের বহুমুখী কবিপ্রতিভা ছিল না। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ ধারাটির পুষ্টিবিধানে তাঁর অবদান আছে। 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন'-এ কবির ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি আরও পরিণতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 'সারদামঙ্গ ল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যে নারী বন্দনার নতুন রূপ ফুটেছে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় দেহ-কামনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ভাষায় অসংযম ও গঠন শিল্পের দুর্বলতায় স্থায়িত্ব পায়নি। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য সুন্দর রস-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। অক্ষয় বড়ালের স্ত্রীবিয়োগ তাঁর প্রেম-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, এরই পরিণতিতে তাঁর শোককাব্য 'এষা' রচনা করেছেন। অপরাপর কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহিলা কবিগোষ্ঠী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতি স্মরণীয়।

12.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। তারপর 180 পৃষ্ঠার দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

   (ক) ভারতীয় প্রাচীন গীতিকাব্য বিশেষত ——— ও ——— সংগীতগুলি ———ভাবাপন্ন হলেও, সেগুলি মহিমান্বিত ——— দৃশ্যেরই বর্ণনা।

   (খ) মধুসূদনের ——— নামান্তরে ———কাব্য হিসাবে প্রকাশিত হয়।

   (গ) হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র কয়েকটি কবিতা যেমন ——— ——— অনুভূতির ——— অনুভব করা যায়।

(ঘ) ——— ও ——— দুটি পরস্পরবিরুদ্ধে ভাবের কবিতা।

(ঙ) নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ———বাঙালিসুলভ ——— অতিক্রম করেছিল।

(চ) বিহারীলালই ——— কবি যে ——— ছাড়া কাব্যের অন্য ——— প্রবেশ করেননি।

(ছ) সারদা শেলির ———সমগোত্রীয়া।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক)	মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশ কাল	: ১৮৬১, ১৮৬২, ১৮৬০
(খ)	হেমচন্দ্রের 'চিত্তবিকাশ' প্রকাশিত হয়	: ১৮৭০, ১৮৮২, ১৮৯৮
(গ)	বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রকাশকাল	: ১৮৬২, ১৮৭৯, ১৮৮৯
(ঘ)	'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা	: সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়।
(ঙ)	ফুলের নামে কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন	: গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু।
(চ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা'	: শোককাব্য, পত্রকাব্য ode

3. (ক) বিহারীলাল বলেছেন, 'ত্রিবিধ' বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তিনি 'সারদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন।— কি সেই 'ত্রিবিধ' বিরহ, উল্লেখ করুন।

(খ) মধুসূদন দত্তের 'অঙ্গনা' কাব্য দুটির পুরো নাম লিখুন।

(গ) 'মন্দ্র' কাব্যটি কার রচনা? কবির আরও দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

(ঘ) 'এষা' কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঙ) 'সারদামঙ্গল' বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করা হয়।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

(চ) 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দুটি পত্রের নাম উল্লেখ করুন।

(ছ) কামিনী রায়ের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

(জ) 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটির সংক্ষেপে পরিচয় দিন।

(ঝ) আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।

(ঞ) দু'জন মহিলা কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

12.12 উত্তর সংকেত

12.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ১৮৫৮, (খ) ১৮৬৮, (গ) ১৮৬৪, (ঘ) ১৮৮০, (ঙ) ১৮৭৫।
2. (ক) ১৮৭৫, (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) আখ্যান কাব্য।
3. এই প্রশ্নের উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।

12.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) রঙ্গলাল, (খ) হেমচন্দ্র, (গ) নবীনচন্দ্র, (ঘ) ১৮৭৫, (ঙ) ১৮৬০।
2. (ক) মঙ্গলদেবতা, অভিনব, (খ) পাঠকের রুচি, যুগান্তর, (গ) ইতিহাসের, ঘটনাক্রমকে, (ঘ) উদাসিনী, স্বপ্নপ্রয়াণ, (ঙ) যোগেশ, রোমান্সধর্মী, (চ) মধুসূদন ন'টি, করুণ রসাত্মক।
3. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেতের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

12.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) ঋক, অথর্ববেদের, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, প্রাকৃতিক, (খ) রাধাবিরহ ব্রজাঙ্গনা, (গ) লজ্জাবতী, যমুনাতটে, মন্ময়তা, (ঘ) ভারত বিলাপ, ভারতভিক্ষা, (ঙ) ভাবালুতা, আতিশয্যকেও, (চ) প্রথম, গীতিকবিতা, শিল্পকর্মে, (ছ) 'স্পিরিট অফ বিউটি'র।
2. (ক) ১৮৬১, (খ) ১৮৯৮, (গ) ১৮৭৯, (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, (ঙ) গোবিন্দচন্দ্র দাস, (চ)শোককাব্য, (ছ) মানকুমারী বসু।
3. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি থেকে উত্তর সংগ্রহ করুন।

12.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
4. কবিতার বিচিত্র কথা : হরপ্রসাদ মিত্র।

একক 13 ☐ নাট্যমঞ্চ ও নাটক

গঠন

13.1 উদ্দেশ্য
13.3 প্রস্তাবনা
13.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মঞ্চ ঃ বিদেশী প্রেরণা
13.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
13.5 অনুশীলনী 1
13.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মঞ্চ ঃ সৌখীন নাট্যাভিনয় থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার
13.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
13.8 অনুশীলনী 2
13.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা
13.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
13.11 অনুশীলনী 3
13.12 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) নাট্যসাহিত্যের বিকাশ-প্রতিষ্ঠা
13.13 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)
13.14 অনুশীলনী 4
13.15 উত্তর সংকেত
13.16 গ্রন্থপঞ্জি

13.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করে আপনি বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জন্য মঞ্চপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পারিবারিক মঞ্চে সৌখীন নাটক অভিনয় থেকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানতে পারবেন। পরবর্তী অংশে পারিবারিক মঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচনা এবং শেষে যে সামাজিক ও সাহিত্যিক অন্তঃপ্রেরণায় রবীন্দ্রপূর্ববর্তী নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারবেন।

- এই একক থেকে আপনি কলকাতার বিদেশী ও দেশী নাট্যাভিনয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

13.2 প্রস্তাবনা

বাঙালির পাশ্চাত্য ধারার নাটক অভিনয়ে প্রেরণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানার প্রয়োজনে কয়েকটি ইংরেজি মঞ্চে অভিনীত নাটকের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেই হয়। এককের প্রথমাংশে এই বিদেশী প্রেরণার পরিচয় দেওয়া

হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্য দিয়ে যে নতুন বিত্তবান গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য ও সাংস্কৃতি প্রেরণায় তাঁরা নিজেদের বাড়িতে পারিবারিক মঞ্চে ব্যয়বহুল অভিনয়ের আয়োজন করেন, বাঙলায় নাটক রচনা ও জনসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের আগ্রহের তীব্রতা সেখান থেকে সৃষ্টি হয়। বর্তমান অংশে তার পরিচয় আছে। এভাবে মঞ্চের প্রয়োজনে কিছু নাটক লেখা হলেও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাটকের দর্শক-পাঠক ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ফলে মঞ্চের প্রয়োজন ও সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়াও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে হাতিয়ার হিসেবে নাটককে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসমাজে চাহিদার সৃষ্টি হয়। সেই তাগিদ থেকেই প্রথম যুগে অনেক নাটক লেখা হয়েছে। এর পরিচয় তৃতীয় অংশে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশে মধুসূদন থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত বিশিষ্ট নাট্যকার ও নটের নাট্যকৃতি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র এককে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অবদান আলোচিত হওয়ায় রবীন্দ্রপূর্ব নাট্য আলোচনাতেই এককটির সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে।

13.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মঞ্চঃ বিদেশী প্রেরণা

দিল্লীর বাদশাহের সনদ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসায় অধিকার পায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে সেক্সপিয়রের দেশের কিছু তরুণ কর্মচারী অবসর বিনোদনের জন্য নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে। এই তাগিদ থেকেই কলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোণে ১৭৫৩ সালে 'প্লে হাউস' নামে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনায় এই মঞ্চেই সিরাজ তার তোপ রেখে তখনকার ফোর্ট আক্রমণ করে। তখন থেকে বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত এই মঞ্চ। এখানে আর কোনো অভিনয় হয়নি। বর্তমান মহাকরণের পেছনে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' নামান্তরে 'নিউ প্লে হাউস'-এর প্রতিষ্ঠা। লন্ডন থিয়েটারের আদলে তৈরি অভিজাত এই মঞ্চে বহু ইংরেজ বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় করতেন। দৃশ্যপট ও অভিনেতাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, সাধারণ প্রহসন থেকে সেক্সপিয়রের হ্যামলেট, রিচার্ড থার্ড এখানে অভিনীত হয়েছে। হেস্টিংস ও ইম্পে এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮০৮ সাল পর্যন্ত মঞ্চটি স্থায়ী হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে এমা ব্রিস্টো চৌরঙ্গীতে তাঁর বাড়িতে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এমা নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এখানেই প্রথম স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীর অংশ গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সময় থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজি নাটক অভিনয়ের ছোট ছোট আয়োজন হতে থাকে। এ পর্বে উল্লেখযোগ্য মঞ্চ 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলসন প্রভৃতি বহু বিগদ্ধ ব্যক্তি চৌরঙ্গী থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের জন্য সমসাময়িক সংবাদপত্রে এর ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে। এখানে 'ম্যাকবেথ', 'কোরিওলেনাস' 'স্কুল ফর স্ক্যান্ডল' অভিনীত হয়। সৌখীন অভিনেতাদের সঙ্গে যে অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে তাঁরা পারিশ্রমিক পেতেন। এক সময় চৌরঙ্গী থিয়েটার ঋণজালে জড়িয়ে পড়লে নিলামে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে 'ক্লার্ক, কার ও পার্কারের' হাতে তুলে দেন। এঁরা মঞ্চটির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। ১৮৩৯-এর ৩১ শে মে রাতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে এটি ভস্মীভূত হয়। এখানে যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হোল, এই প্রথম একটি ইংরেজি মঞ্চে শুধু নাট্যমোদী দর্শক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয় বাঙালি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হোল। পরবর্তী মঞ্চ সাঁসুসি (Sans Souci) ডালহৌসী এলাকায় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থান সঙ্কুলানের অভাবে পরে পার্ক স্ট্রিটে যেখানে বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, নিজস্ব বাড়ি তৈরি করে চলে যায়।

এখানেই প্রথমে একজন বাঙালি অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে 'ওথেলো' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন।

চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটার কলকাতার ধনাঢ্য বাঙালিদের অভিনয় দেখাই শুধু নয়, সমগ্র নাট্যকলা সম্পর্কেই অত্যন্ত আগ্রহী করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের অনেক অভিনেতাও এই সমস্ত ইংরেজ থিয়েটার থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা, অভিনয়কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিয়ে পারিবারিক মঞ্চে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইংরেজ অভিনীত ও পরিচালিত থিয়েটারের পাশাপাশি আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় রুশ পর্যটক, জ্ঞানতাপস ও সঙ্গীতজ্ঞ গেরাসিম লেবেডেফ্-এর কথা। তিনি এম. জড্রেল-এর 'দি ডিসগাইস' (The Disguise) নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' ২৫ ডোমতলা লেনে, তাঁরই নিজস্ব মঞ্চে ১৭৯৫-এর ২৭শে নভেম্বর ও ২১শে মার্চ, ১৭৯৬ —দু'বার অভিনয় করিয়েছিলেন। তিনি মলিয়েরের নাটক Love is the Best Doctor-এর ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

এতদিন ইংরেজদের মঞ্চে ইংরেজি নাটক অভিনয় হোত। লেবেডেফ তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটারে বাংলা নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করান। দর্শক আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, বঙ্গীয় রীতিতে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতার সঙ্গে অভিনেত্রীর সমাবেশ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতীয় প্রেমগীতি, যে সমস্ত ইউরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীত বাঙালির প্রিয় সেগুলি এবং নাটকের মাঝে মাঝে আনন্দদায়ক ও কৌতুককর বিষয় পরিবেশিত হবে। টিকিটের দাম সে সময়ে গ্যালারি ৪ (চার) টাকা, বক্স ৮ (আট) টাকা ধার্য হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অভিনয়ের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের এই সাফল্য লেবেডেফকে উৎসাহী করেছিল। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে এই নাটকের অভিনয় করবেন। সে বাসনা পূরণ হয়নি। লেবেডেফের এই সাফল্য ইংরেজি থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন 'কাল্পনিক সংবদলের' প্রধান দর্শক ছিলেন সাহেবরাই। সম্ভবত এ জন্যই তাঁদেরই একজন টমাস রোওয়ার্থ-এর চক্রান্তে থিয়েটারের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরে যান।

বাংলা নাটকে লেবেডেফের অবদানগুলি হোল তিনিই প্রথম ইংরেজি ও রুশ থিয়েটারের অনুসরণে বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করে বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে প্রথম বাংলা অভিনয় করান। এদেশের সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী নাট্য বিষয়ক নির্বাচন ও উপস্থাপনায় সামাজিক ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক উপাদান এবং জনপ্রিয় বিদ্যাসুন্দরের গান সংযোজন করেছেন পরবর্তী দিনের বাংলা নাটকের সাফল্যের দিকগুলি এর থেকেই নির্দেশিত হয়েছে। বাংলা মঞ্চ এসব থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে নাট্য প্রযোজনায় আগ্রহী হয়েছে। পরবর্তী অংশে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

13.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাট্যপ্রেমী কিছু কর্মচারীর উৎসাহে ও আগ্রহে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি নাটক অভিনয়ের মঞ্চ 'প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জনপ্রিয় ক্যালকাটা থিয়েটার, নামান্তরে, 'নিউ প্লে হাউস'। ১৭৮৯ সালে এম. ব্রিস্টো তাঁর বাড়িতে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে, নিজেই অভিনয় করেছিলেন। ইংরেজি মঞ্চে এই প্রথম একজন মহিলার অভিনয়ে অংশগ্রহণ। চৌরঙ্গী থিয়েটারের

এবং সাঁসুসির প্রতিষ্ঠা যথাক্রমে ১৮১৩ এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। দুটি থিয়েটার সেযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রথম মঞ্চটি ঋণের দায়ে নিলাম হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেটি কিনে কয়েকজন ইংরেজের হাতে তুলে দেন পরিচালনার জন্য। সাঁসুসিতে প্রথম বাঙালি অভিনেতা বিষ্ণুচরণ আঢ্য 'ওথেলো' চরিত্রে অভিনয় করে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

রুশ পর্যটক লেবেডেফ ১৭৯৫ সালে বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্য-পরিচালক, অভিনয়শিক্ষক। ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করে 'কাল্পনিক সংবদল' নাম দিয়ে এদেশীয় নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করান। মহাসমারোহে ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ ও ২১শে মার্চ ১৭৯৬ মার্চ লেবেডেফ-এর নাটক অভিনয় হয়। ইংরেজি থিয়েটারের চক্রান্তে ও প্রতিকূলতায় তিনি যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে দেশে ফিরে যান।

ইংরেজি ও লেবেডেফের থিয়েটার কলকাতার ধনাঢ্য বাঙালিদের অভিনয়, নাট্যকলা ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে, তার ফলে কতকগুলি পারিবারিক মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হয়।

13.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হলে 204 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) কলকাতায় ———— উত্তর-পূর্ব কোণে ————সালে ———— স্থাপিত হয়।

(খ) ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ——— নামান্তর ——— এর প্রতিষ্ঠা।

(গ) ——— ও ——— এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(ঘ) এক সময়ে ——— ঋণজালে জড়িয়ে পড়লে নিলামে ——— কিনে ——— হাতে তুলে দেন।

(ঙ) ———অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ——— নামভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

(চ) ——— নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'।

(ছ) (বেঙ্গলী থিয়েটারের) টিকিটের দাম ——— ৪ (চার) টাকা বক্স ——— ধার্য হয়েছিল।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) দি ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা	:	১৭৫৩, ১৭৭৬, ১৮১৬
(খ) 'সাঁসুসি' প্রতিষ্ঠিত হয়	:	পার্কস্ট্রিট, ডালহৌসীতে, চৌরঙ্গীতে।
(গ) 'কাল্পনিক সংবদল' প্রথম অভিনীত হয়	:	২৭শে নভেম্বর, ১৮৯৫, ২৭শে নভেম্বর, ১৭৯৫, ২১শে মার্চ, ১৭৯৬।
(ঘ) চৌরঙ্গী থিয়েটারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন	:	হেস্টিংস, অধ্যাপক রিচার্ডসন, দ্বারকানাথ ঠাকুর।

3. (ক) গেরাসিম লেবেডেফ দুটি নাটক অনুবাদ করেন। নাটক দু'টির রচয়িতা ও নাটকের নাম উল্লেখ করুন।

(খ) চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনীত তিনটি নাটকের নাম লিখুন।

(গ) নিউ প্লে হাউসের পৃষ্ঠপোষক দু'জনের নাম লিখুন।

4. (ক) 'বেঙ্গলী থিয়েটার' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) বাঙালি জীবনে ইংরেজি নাটকের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

13.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মঞ্চঃ সৌখীন নাট্যাভিনয় থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার

ইংরেজ প্রযোজক ও পরিচালকদের থিয়েটার স্থাপন করে নাটক অভিনয়ের প্রচেষ্টা, হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের মনে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় আদর্শে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা একত্র হয়ে ইংরেজদের মত যৌথভাবে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তখনও উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটকের একান্ত অভাব। তাই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে সেক্সপিয়রের এবং সংস্কৃত থেকে কালিদাস—ভবভূতির নাটকের অনুবাদ নিয়ে বিত্তবান ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁদেরই বাড়িতে সখের নাট্যশালা গড়ে উঠল।

এরকম একটি নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। প্রসন্নকুমার পিতামহ দর্পনারায়ণের ধনসম্পত্তি পিতা গোপীমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর পেয়েছিলেন। সেকালের বাঙালি সমাজে প্রসন্নকুমার রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁর 'হিন্দু থিয়েটারের' উদ্বোধন হোল ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৩১। এটি বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। প্রথম রজনীতে উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র প্রথম এবং সেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজারের' পঞ্চম অঙ্ক ইংরেজিতে অভিনীত হয়। এখানে নাটক অভিনয় শিক্ষা দিতেন একজন ইংরেজ। দর্শক ছিলেন কিছু ইংরেজ শিক্ষিত বাঙালি। হিন্দু থিয়েটার একবছরের মধ্যে উঠে যায়।

এর পরে উল্লেখযোগ্য হোল নবীন বসুর বাড়ির পারিবারিক মঞ্চ। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো ছিল নবীন বসুর বাড়ি। সেখানে সুরম্য বাগান বাড়িতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জানা যায়—প্রতি বছর এখানে চার পাঁচটি নাটক ইংরেজি ধরনে হিন্দুদের দ্বারা দেশীয় ভাষায় অভিনয় হোত। নারী চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করতেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাকারে পূর্ণিমা রাত্রে অভিনীত হয়েছিল। নানা জাতীয় প্রায় একহাজার দর্শক অভিনয় দেখেছিলেন। আবার প্রশংসাও পেয়েছে। এই অভিনয়ে বিশেষ উল্লেখের বিষয় হোল কৃত্রিম দৃশ্যপট ছাড়াও নবীনবাবুর বাড়ির পুকুর ও বাগানের নানা দৃশ্য নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ পথে মালিনীর ঘর থেকে রাজপ্রাসাদের ভেতর প্রবেশের পথ দেখানো হয়েছে।

নবীনবাবু এই মঞ্চ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তিন-চার বছর চালাবার পর ভাল নাটক ও অর্থাভাবে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। নাট্যরসামোদী দর্শক এর ভেতর থেকে তৈরি হলেও বেশ কিছু দিন বাংলা নাটক তেমনভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়নি। তবে স্কুলে কলেজে পুরস্কার বিতরণী সভায় বা ইংরেজি মঞ্চে তখনও অভিনয় চলছে।

নবীন বসুর বাড়ির অভিনয়ের প্রায় কুড়ি বছর পর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসু চিৎপুর অঞ্চলে 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' (১৮৫৪) স্থাপন করেন। ৩রা মে এখানে সেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' অভিনীত হয়। ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও ঐ রাত্রিতে প্রায় চার'শ লোক অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সীজার, ব্রুটাস ও কেসিয়াস-এর ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণধন দত্ত এবং যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' নাটকের

প্রশংসা করলেও কর্তৃপক্ষকে বাংলা নাটক পরিবেশনের পরামর্শ দেন। এর পর আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)-র বাড়িতে 'জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা'র সদস্যরা একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন (১৮৫৭)। এখানে ঐ বছর সরস্বতী পূজার দিন (৩০শে জানুয়ারি) নন্দকুমার রায় প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চের উদ্বোধন ঘটে। সাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ শকুন্তলার অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়েও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আছে। শকুন্তলার দ্বিতীয় বারের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। এই মঞ্চেই বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বনে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়েছে। এর এক বছর পূর্বে (১৮৫৬, ১১ই এপ্রিল) ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বাংলা অনুবাদ 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এতই উৎসাহিত হল যে, তিনি নিজেই কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' বাংলায় অনুবাদ করে ২৪-শে নভেম্বর ১৮৫৭ স্বীয় মঞ্চে পুররবা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহু গণ্যমান্য দেশী বিদেশী ব্যক্তি দুটি অভিনয়েই দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সাতুবাবু ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মঞ্চে 'শকুন্তলা' ও 'বেণীসিংহার'-এর অভিনয় অভিজাত সমাজে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তার অপেক্ষাকৃত পরিণত রূপ 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' মধুসূদনের নাট্যকৃতিগুণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখানে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য রামনারায়ণের অপর একটি নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রামজয় বসাকের বাড়িতে (মার্চ, ১৮৫৭) অভিনীত হওয়ায় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কুলীনকুলসর্বস্বর জনপ্রিয়তা সমকালীন সমাজসমস্যাকে কাহিনীর বিষয় হিসাবে নির্বাচন করায়, নাটকটির বহু জায়গায় অভিনয় হয়েছে।

রামনারায়ণের মৌলিক নাটক রচনার এই জনপ্রিয়তার জন্যই সম্ভবত বেলগাছিয়া মঞ্চে রত্নাবলী ৩১শে জুলাই ১৮৫৮ সমারোহে অভিনয়ের আয়োজন হয়। দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদ্বয়—ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের ইচ্ছায় এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এর প্রতিষ্ঠা। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কলকাতার বিশিষ্ট ইংরেজরা থাকায় তাদের বোঝাবার জন্য নাটকের অনুবাদ ও তার সারাংশ ইংরেজিতে লিখবার জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করা হয়। রত্নাবলীর মান সম্পর্কে মধুসূদনের অসন্তোষ তাঁকে শর্মিষ্ঠা রচনায় আগ্রাহান্বিত করে। শর্মিষ্ঠার কাহিনী পৌরাণিক কিন্তু উপস্থাপনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রয়োগ বাংলা নাট্যাধারায় অভিনবত্ব নিয়ে আসে। মহাসমারোহে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এর অভিনয় হোল (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯)। এর কয়েকটি অভিনয়ের পরেই রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল প্রয়াণে (২৯শে মার্চ, ১৮৬১) নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী দুটি নাট্যশালা—পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় এবং 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' পারিবারিক উদ্যোগ ও আয়োজনে ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটক ও প্রহসন প্রায় দশ-বারবার অভিনয় হয়েছিল। রামনারায়ণের অনুবাদ নাটক 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ' এবং আরও দুটি প্রহসন 'চক্ষুদান' ও 'উভয়সঙ্কট' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শোভাবাজার মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮-৭-৬৫) দিয়ে যাত্রা শুরু। পরে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ও (৮-২-৬৭) উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

শোভাবাজারের মত জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় (১৮৬৭) প্রথম মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় হয়। দুটিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন। মঞ্চের ব্যবস্থাপকদের শিক্ষাপ্রদ নাটকের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে রামনারায়ণকে দিয়ে বহুবিবাহ সম্বন্ধে 'নবনাটক' (১৮৬৭) রচনা করিয়ে সেটি অভিনয়ের ব্যবস্থার করা হয়। জোড়াসাঁকোর মঞ্চ পরিকল্পনা দৃশ্যাঙ্কন বাস্তববীতির অনুসরণ এবং অভিনয়ের অসামান্য

নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৬৭-এর পর এখানে আর অভিনয় হয়নি। এর পরে উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা হোল বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়। এখানে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' (১৮৬৮), 'সতী' (১৮৭৪) ও 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) নাটক অভিনয় হয়। নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল।

উপরিউক্ত নাট্যশালার মত বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নামান্তরে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সখের রঙ্গালয়। তবে এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রাণের উৎস। ১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস শূর প্রভৃতি কয়েকজন মিলে নাট্যমঞ্চ স্থাপনের সঙ্গতির অভাবে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। থিয়েটার করার আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে উদ্যোগী হন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি সাতবার অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকার স্বয়ং অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এরাই পরে 'লীলাবতী' অভিনয় করেন। এক্ষেত্রে যেহেতু কোনো অর্থানুকূল্য ছিল না তাই সীমিত পরিসরে বহু দর্শনার্থী টিকিটের বিনিময়ে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ছাড়াও ১৮৫২-১৮৬৮ সালের মধ্যে বহু মৌলিক নাটকও লেখা হয়েছে। তাই অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনবোধ হচ্ছিল সর্বসাধারণের দর্শনোপযোগী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের। বাগবাজারের নাট্যমোদীরা 'লীলাবতী'র নীলদর্পণের প্রস্তুতিকালে ন্যাশনাল নবগোপালের পরামর্শে তাঁদের পরিকল্পিত নাট্যশালার নামকরণ করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধের ফলে গিরিশচন্দ্র সরে দাঁড়ান। তাঁর বক্তব্য ছিল দর্শনী দিয়ে যেখানে দর্শক নাটক দেখবেন সেই ন্যাশনাল বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চে সাধারণ সাজ-সজ্জা মঞ্চোপকরণ নিয়ে তাদের উপস্থিত হওয়া সেক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হবে না। এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। অপরাপর সদস্যরা সীমিত সামর্থ্য নিয়েই আরম্ভ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে শ্যামবাজারের থিয়েটারের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (The National Theatre) নামে মধুসুদন সান্যালের চিৎপুরের ঘড়িওয়ালা বাড়ির উঠান চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে মঞ্চ তৈরি করে অভিনয়ের আয়োজন করলেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে ধর্মদাস শূর মঞ্চ তৈরি ও দৃশ্য রচনা করলেন। নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয় শিক্ষক ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর এবং ব্যবস্থাপক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা প্রত্যেকে অভিনয়ও করেছিলেন। এখানে অর্ধেন্দুশেখর একাধারে মিঃ উড, সাবিত্রী, গোলক বসু এবং রায়তের; মতিলাল শূর, তোরাপ, রাইচরণ; অমৃতলাল ক্ষেত্রমনি, মহেন্দ্রলাল পদী ময়রাণী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। প্রথম অভিনয় হোল—শনিবার ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২। অভিনয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ অভিনয়ের জন্য ব্যয়িত হবে জেনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রশংসা করে। নাটকটি যশোহর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুরে অভিনয় করবার প্রস্তাব দেয়। রোগ, উড চরিত্রের কথা স্মরণ করে ইংলিশম্যান নাটকটি মানহানিকর ও বন্ধ করার পরামর্শ দেয়। নীলদর্পণ অভিনয়ের পরবর্তী শনিবারগুলিতে ১৪, ২১, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৭২ এবং ১১ই জানুয়ারি ১৮৭৩ ক্রমান্বয়ে জামাইবারিক, সধবার একাদশী, লীলাবতীর অভিনয় হয়। এভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারে—(১) প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে অভিনয়কলাকে সর্বজনের সামগ্রী, অভিজাত ও ইংরেজের মনোরঞ্জন থেকে জনসাধারণের সংস্কৃতি স্পৃহাকে তৃপ্ত ও গড়ে তুলতে সাহায্য করে। (২) বাঙালি পরিচালিত, অভিনীত একমাত্র বাংলা নাটকই এখানে প্রযোজিত হয়েছে। (৩) ভাড়া নেওয়া জায়গায় স্থাপিত মঞ্চ ধনীর আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। (৪) অভিনেতারা কিছু অর্থ পেতেন। এ থেকেই কালক্রমে পেশাদারী অভিনেতার সৃষ্টি হয়। (৫) মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়সূত্রে নাট্যগোষ্ঠীর সূত্রপাত ঘটে। 'ন্যাশনাল পেপার'ই প্রথম এই নাট্যশালার 'জাতীয় গুরুত্বের কথা স্বীকার করে'। এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শেষ অভিনয় হয় ৮ই মার্চ, ১৮৭৩।

জানা যায় এই পরিণতির জন্য আর্থিক বিষয় নিয়ে আভ্যন্তরীণ কলহ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দায়ী। এর পর

ন্যাশনাল থিয়েটার দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়—গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার', অপর দলটি অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে লিন্ডসে স্ট্রিটে 'অপেরা হাউস' ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করে। সে প্রসঙ্গ আপাতত আলোচ্য নয়।

13.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

ইংরেজি ও রুশ নাট্যপ্রযোজক-পরিচালকদের থিয়েটার বাঙালি বিত্তবান ও নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের আকৃষ্ট করে। ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিদের উদ্যোগে মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অথবা বিদ্যাসুন্দর, কালক্রমে কতগুলি মৌলিক নাটক লিখিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করাতেন। প্রসন্ন ঠাকুর, নবীন বসু,—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহদের পারিবারিক মঞ্চের অভিনয় নানাদিক থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেলগাছিয়ায় সিংহ ভ্রাতৃদ্বয় একসময় তো আলোড়ন তুলেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো এবং বহুবাজার রঙ্গনাট্যালয় এই মঞ্চ চতুষ্টয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। বিশেষত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা মঞ্চ পরিকল্পনা, দৃশ্যাঙ্কন ও চরিত্রাভিনয়ে বাস্তবরীতির অনুসরণ করে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'বাগবাজার' পরে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' সখের রঙ্গালয় হলেও এর তরুণ অভিনেতারা তাঁদের উদ্যোগ ও নিষ্ঠায় নাট্যাভিনয়ের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। এঁরাই ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠানে মঞ্চ স্থাপন করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' উদ্বোধন করেন। প্রথম অভিনীত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। থিয়েটার ধনীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে জনসাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছুল।

13.8 অনুশীলনী 2

নীচেব প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ২০৫ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন :

1. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন :
   - (ক) সখের নাট্যশালা বলতে আপনি কী বোঝেন?
   - (খ) দর্পনারায়ণ কে?
   - (গ) 'বিদ্যাসাগর' কাব্য কার রচনা? কাব্যটির সংক্ষেপে পরিচয় দিন।
   - (ঘ) মধুসূদন সান্যাল কে? মঞ্চের ইতিহাস তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
   - (ঙ) মনোমোহন বসুর দুটি নাটকের নাম লিখুন।
2. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক) নবীন বসুর বাড়ি ছিল বর্তমান	: (1) শ্যামবাজার ট্রামডিপো
	: (2) শোভাবাজার
	: (3) বাগবাজার
(খ) রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত নাটকের নাম	: (1) রত্নাবলী
	: (2) কুলীনকুল সর্বস্ব
	: (3) একেই কি বলে সভ্যতা

(গ) বহুবাজার রঙ্গনাট্যালয়ে 'রামাভিষেক' নাটক : (1) মধুসূদন দত্ত
: (2) রামনারায়ণ তর্করত্ন
: (3) মনোমোহন বসু

(ঘ) 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনটির রচয়িতা : (1) মধুসূদন দত্ত
: (2) কালীপ্রসন্ন সিংহ
: (3) রামনারায়ণ তর্করত্ন

3. নীচের বক্তব্যটি ঠিক না ভুল নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

	ঠিক	ভুল
(ক) রত্নাবলীর সম্পর্কে মধুসূদন প্রশংসা করেছিলেন।	☐	☐
(খ) শোভাবাজারে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।	☐	☐
(গ) নবগোপালের পরামর্শে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ হয়। ☐	☐	
(ঘ) ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।	☐	☐
(ঙ) সাতুবাবুর বাড়িতে 'বেণী সংহার' নাটক অভিনয় হয়।	☐	☐

4. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) সাতুবাবুর দৌহিত্র ——— অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) প্রসন্নকুমার পিতামহ ——— ধনসম্পত্তি পিতা ——— ঠাকুরের ——— পেয়েছিলেন।

(গ) হিন্দু থিয়েটারে প্রথম রজনীতে ——— অনূদিত ভবভূতির ——— প্রথম এবং সেক্সপিয়রের ——— পঞ্চম অঙ্ক ——— অভিনীত হয়।

(ঘ) জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রথম ——— ও পরে ——— অভিনয় হবে।

13.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা

আমরা যাকে Drama বা নাটক বলি তা বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিবর্তন সূত্রে পাওয়া নয়। বাঙালির সংস্কৃতিতে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইংরেজি নাটকের প্রতি আনুগত্য থেকে বাংলা নাটকের জন্ম, এবং একান্তভাবেই ইউরোপীয় নাট্যশালা বা থিয়েটারের প্রচার প্রচলন থেকে এর মানস সংস্কার গড়ে উঠেছে। থিয়েটারের প্রয়োজনেই নাটকের উদ্ভব। একে যাত্রার বিবর্তিত রূপ বলে ধরলে ভুল হবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস থাকলেও বাঙালি জীবনে তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। প্রাগাধুনিক বাঙালি জনসাধারণ লোকায়ত যাত্রা বা নাট্যগীতের রসাস্বাদনেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। ইউরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত উনিশ শতকের নাটকে তাই সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা যাত্রার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ দুটি শিল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু মিল থেকেই কালক্রমে পারস্পরিক কিছু প্রভাব এসেছে মাত্র। ফলে এ সময়ের বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা এবং বিকাশের প্রেক্ষিতে দেশীয় যাত্রা সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাট্যাদর্শের সম্মিলিত প্রয়াস ও সমন্বয় হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। নাটকের প্রথম যুগে তাই পুরোপুরি পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ একেবারে সম্ভব ছিল না। ফলে যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকে রূপরীতির দিকে প্রথম যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন নতুন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটছে, গ্রামীণ মূল্যবোধে ভাঙন ধরছে, গ্রামীণ সমাজও ভাঙছে, গড়ে উঠছে নাগরিক গোষ্ঠী তখন স্মৃতিমেদুর বাংলার গ্রামে কতগুলি লোক-সঙ্গীত যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সময় যাত্রাগান তার উৎকর্ষ হারিয়ে ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর পালার আদিরসের মধ্যে মজে অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। কলিরাজার যাত্রা বা নলদময়ন্তীর যাত্রা অভিনয়ের সমাচার দর্পণে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও উনিশ শতকের নাগরিক জীবনের নতুনতর জীবনবোধ ও আকাঙ্ক্ষার তুষ্টিবিধান করতে পারেনি।

এদিকে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের প্রয়োজনে ইংরেজি নাট্যশালার প্রবর্তন পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই শুরু হয়েছিল, ক্রমে তার প্রসারও ঘটেছে। সেকালের নাগরিক বাঙালির যোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের নাটক-অভিনয়ের সম্পর্কে কৌতূহলও সৃষ্টি করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মঞ্চ, কিন্তু সেখানেও ইংরেজি নাটকের অভিনয়।

আধুনিক নাটকের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর। হিন্দু কলেজ রিচার্ডসনের সেক্সপিয়র পঠন-পাঠন সে সময়ে একটি ইতিহাস। সেক্সপিয়রের নাট্যসাহিত্যের রস ও নাটকের কাব্যোৎকর্ষের দেশকালাতীত মহিমায় ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গসমাজ আলোড়িত হয়েছিল। ইংরেজি আঙ্গিকের নাটক তখন শিক্ষিত বাঙালির রীতিমত শ্রদ্ধা ও আগ্রহের বিষয়। ইংরেজি মঞ্চ ও সেখানে অভিনীত নাটক বাঙালি নাট্য-সংস্কারকে আরও উদ্দীপিত করে।

এদিকে বাংলায় তখন যে সমস্ত নাটক প্রকাশিত হচ্ছে তা প্রধানত সংস্কৃত নাটক প্রহসনের অনুবাদ—হাস্যার্ণব (১৮২২), ধূর্তনর্তক, ধূর্তসমাগম কৃষ্ণ মিশ্রের ছয় অঙ্কে 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুকসর্বস্ব' (১৮২৮), রামতারক ভট্টাচার্যের 'শকুন্তলা' (১৮৪৮), নীলমনি পালের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৪৯) প্রভৃতি। এঁদের ভাষা ছিল আড়ষ্ট ও প্রাণহীন, অভিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই পরিস্থিতিতে বাংলা মঞ্চে নাটকের অভাববোধ যথার্থই পীড়িত করেছেন। নবীন বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর প্রায় ২৫ বছর কোনো সখের মঞ্চও এদিকে উদ্যোগ নেয়নি। সাতুবাবুর বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের শকুন্তলা অভিনয় (৩০-৬-১৮৫৭) হয়। পেট্রিয়টের ভাষায় "The play was a genuine Bengali one." ইতোমধ্যে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫২ থেকে বাংলা নাটক লেখার জোয়ার এলো।

এ সময় সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ এবং মৌলিক নাটক রচনা করতে বহু নাট্যকার এগিয়ে এলেন। ইংরেজি রীতিতে নাটক লিখলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ। প্রথম দু'জন একটি করে নাটক লিখেছেন দেশীয় ঐতিহ্য থেকে কাহিনী নিয়ে কিন্তু তাদের আঙ্গিক পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। জি.সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস এ তারাচরণের ভদ্রার্জুন নাটক দুটিই ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ট্রাজেডি। সংস্কৃত নাটক কখনই বিয়োগান্তক হয় না, সে হয়তো এ দেশের জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ থেকেই। তাই এই ব্যতিক্রম সৃষ্টির জন্য ভূমিকাতে তিনি 'আরিস্টল নামক গ্রিস দেশীয় পণ্ডিত' এবং 'সেক্সপীয়র' নামক ইংলন্ডীয় মহাকবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যুক্তিবিন্যাস করেছেন। 'কীর্তিবিলাস'-এর কাহিনী দেশী রূপকথা থেকে নেওয়া হলেও পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বিষদান্তক পরিণতি দান ছাড়াও কীর্তিবিলাস চরিত্র পরিকল্পনায় হ্যামলেটের ছায়া আরোপ করেছেন। নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের নান্দী, সূত্রধার এবং দৃশ্য বোঝাতে 'অভিনয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্লট বিন্যাসে শৈথিল্য ভাষায় আড়ষ্টতা, গদ্য সংলাপ কৃত্রিম, পদ্য সংলাপ ঈশ্বর গুপ্তের ছাঁদে ঢালা, চরিত্র গঠনে দুর্বলতার পরিচয়

আছে তথাপি প্রথম বাংলা নাটক রচনায়, বিশেষ ট্রাজেডি রচনায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করতে হবে।

তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন 'কমেডি' বা 'শুভান্তক' নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে নেওয়া অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনী নিয়ে লেখা। পাঁচ অঙ্কে এবং প্রতিটি অঙ্ক 'সংযোগস্থল' বা দৃশ্যে বিভক্ত। নাটকে একটি আভাস বা প্রস্তাবনা আছে। সংলাপ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। আলোচ্য দু'জন নাট্যকারই প্লট গঠনে, চরিত্র সৃষ্টিতে কিংবা সংলাপ রচনায় কোথাও দক্ষতা দেখাতে পারেননি। বাংলা নাটকের সূচনাপর্বে ইংরেজি নাটকের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আঙ্গিক নিয়ে যে কিছু দ্বিধা ছিল তা তাঁদের রচনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

বাইশ বছরের ব্যবধানে চারটি নাটক লিখেছেন হরচন্দ্র ঘোষ। ইনি সেক্সপিয়রের নাটকের প্রথম অনুবাদক। তাঁর প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) The Merchant of Venice-এর "আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক...সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্মগ্রহণ" করে রচিত। নাটকটি "ভদ্রসমাজে মনোনীত" হয়নি। সেক্সপিয়রের অপর নাটক Romeo and Juliet-এর অনুসরণে 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬০) অনুবাদ করলেও নাটকের সূচনায় সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী ও প্রস্তাবনা আছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮) এবং রজতগিরি নন্দিনী (১৮৭৪) "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে" রচনা করেন। মধুসুদন, দীনবন্ধুর সমকালে বাস করেও প্রতিটি ক্ষেত্রে "হরচন্দ্রের উদ্যমের ব্যর্থতা" প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি জীবনের সে যুগের বাস্তব সমস্যা নিয়ে মৌলিক নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নের। ইনিই প্রথম মঞ্চসফল নাটকের নাট্যকার। জনপ্রিয়তার উপহার স্বরূপ 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে সে যুগে পরিচিতি ছিলেন। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামনারায়ণ লঘু ভঙ্গীতে তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৩) রচনা করেন। এটি প্রহসন শ্রেণীর রচনা হলেও বিষয়বস্তু, নাটকীয়তা, নাট্যভাষা এবং সার্থক নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুণে যথার্থই সার্থকতার অধিকারী। নাটকের কুলপালকের তিন কন্যার চরিত্র সৃষ্টি ও তাদের সংলাপ রচনায় তিনি বিস্ময়করভাবে জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় না থাকায় ইংরেজি প্রহসন সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাই নাটকটি সংস্কৃত প্রহসনের মত বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রহসনে সমাজের কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সমাজের অপর সমস্যা 'বহুবিবাহ'কে ধিক্কার দিয়ে লেখা 'নবনাটক' (১৮৬৬) একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় অতিনাটকীয় ও তেমন সার্থক প্রতিপন্ন হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উপরিউক্ত দুটি নাটকই 'ফরমায়েসী' নাটক। কৌলীন্য প্রথার মত জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতাকে পুরস্কার দেবেন এই ঘোষণা রংপুরের জমিদার সংবাদপত্র মারফত জানিয়েছিলেন। এজন্য ৫০/- টাকা পারিতোষিকও ঘোষিত হয়েছিল। বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পুরস্কার ঘোষণা উপলক্ষ্য করে লেখা।

রামনারায়ণের অপরাপর নাটকের মধ্যে 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), মালতী মাধব (১৮৬৭) অনুবাদ এবং রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) এবং ধর্মবিজয় (১৮৭৫) পুরাণাশ্রিত মৌলিক নাটক। অনুবাদ নাটকের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। ভাষায় জড়তা আছে। অনুশীলনের জন্যই রচিত। কিন্তু পৌরাণিক নাটকগুলি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত। কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো বিশেষত্ব নেই। বর্ণনামূলক সংলাপ নাটকে প্রাণসঞ্চার করতে পারেনি। এছাড়াও তিনি 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫), চক্ষুদান (১৮৬৯) প্রভৃতি লঘু নাটকও রচনা করেন।

যতদূর জানা যায় রামনারায়ণের নাটকগুলি সে সময় সৌখিন নাট্যশালায় বহুবার প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত* হয়ে দর্শককে আনন্দ দিয়েছিল। বাঙালির সামাজিক পারিবারিক জীবনকে নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চে সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়, এই আত্মবিশ্বাস নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর উচ্চাঙ্গের নাট্যপ্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও রচনায় বৈচিত্র্য ও কৌতুকরসের জোগান দিয়ে জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতির যে চিত্র এঁকেছেন, তা পরবর্তী নাট্যকারদের প্রেরণাস্থল হয়েছে। সম্ভবত কৌলীন্য ও বহুবিবাহের মত সমকালীন সমাজের অপর সমস্যা, বিদ্যাসাগর যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই বিধবা বিবাহ নিয়ে এসময় বহু নাটক লেখবার প্রেরণা, রামনারায়ণের কাছ থেকেই এসেছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬) যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য নাট্যকার রচিত 'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৬), বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬), বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭), বিধবা বিবাহ (১৮৬০) প্রভৃতিও উল্লেখ করবার মত।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, নাট্যসাহিত্যের সূচনায় যোগেশচন্দ্র থেকে রামনারায়ণ পর্যন্ত নাট্যকারেরা থিয়েটারি নাটকের অনভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে অনেক দ্বিধা সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান করেছেন এ পর্বে। সখের থিয়েটারের প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে ইংরেজি-সংস্কৃত থেকে অনুবাদ যেমন করা হয়েছে, আঙ্গিকের দিক থেকে অসংশয়িত পদক্ষেপ নেবার শক্তি বা প্রতিভা না থাকায় বাংলা নাটককে মধুসূদনের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে একথা ঠিক সূচনাকালেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে ট্রাজেডি, কমেডি এবং প্রহসন রচনা যেমন হয়েছে, তেমনি পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটকও নতুন যুগের নতুন দৃষ্টি দিয়ে নাট্যকারেরা সৃষ্টি করেছেন।

13.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

ইংরেজি নাটকের অনুসরণেই বাংলা নাটকের জন্ম। দেশীয় ঐতিহ্য সূচনাপর্বে কখনো কখনো নাট্যকারদের দ্বিধান্বিত করেছে। প্রধানত মঞ্চের প্রয়োজনেই নাটক। সংস্কৃত বা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ সেদিক থেকে রসপরিতৃপ্তি ঘটাচ্ছিল না। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রিচার্ডসনের সেক্সপিয়র পঠন-পাঠন নব্যশিক্ষিত বাঙালি সমাজে নূতন পথের দিশা দিয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে জি. সি. গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস' ট্রাজেডি ও তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' কমেডি নাটক লেখেন। প্রথমোক্ত জন সেক্সপিয়রকে স্মরণ করেও নাটকে 'নান্দী', 'সূত্রধর' এনেছেন। হরচন্দ্র সেক্সপিয়রের নাটকের অনুবাদ দিয়ে শুরু করেন। রামনারায়ণের আবির্ভাব সমাজচেতনা সম্পন্ন নাটক নিয়ে। 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'নবনাটক' দুটিই ফরমায়েসি নাটক, পুরস্কারও পেয়েছিল। তাঁর ইংরেজি বিদ্যাচর্চা তেমন কিছু ছিল না, তথাপি নাটকে রূপায়িত সমাজের সে সময়ের জীবন্ত সমস্যা নাট্যকারের গভীর সহানুভূতিতে দর্শক-পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছে।

---

* **পাদটীকা ঃ** কুলীনকুল সর্বস্ব (চার বার), রত্নাবলী (সাত বার), যেমন কর্ম তেমনি ফল (নয় বার), মালতীমাধব (এগার বার), রুক্মিণী হরণ (এগার বার), বেণী সংহার ও নবনাট্য (একবার) অভিনীত হয়েছিল।

13.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে 205 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :
   (ক) ইউরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ———নাটকে ——বা ——কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।
   (খ) হিন্দু কলেজে —— পঠন-পাঠন একটি ইতিহাস।
   (গ) জি. সি. গুপ্তের —— ও তারাচরণ শিকদারের ——নাটক দুটিই ——খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।
   (ঘ) বাঙালি জীবনের সে যুগের ——নিয়ে ——নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব——।
   (ঙ) বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক —— জোড়াসাঁকো নাট্যশালার ——ঘোষণাকে উপলক্ষ্য করে লেখা।
   (চ) বাঙালি সামাজিক ——জীবনকে —— দিয়ে তা মঞ্চে যথার্থভাবে ——যায়, এই —— মধ্যে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

	ঠিক	ভুল
(ক) থিয়েটারের প্রয়োজনেই নাটকের উদ্ভব।	☐	☐
(খ) 'কুলিরাজার পালা' বা 'নলদময়ন্তীর যাত্রা' অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল।	☐	☐
(গ) 'ধূর্ত নর্তক', 'ধূর্তসমাগম' দুটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক।	☐	☐
(ঘ) 'ভানুমতী চিত্তবলাস' একটি পৌরাণিক নাটক।	☐	☐
(ঙ) রামনারায়ণ তর্করত্নের 'ধর্মবিজয়' নাটক সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।	☐	☐

3. সংক্ষেপে উত্তর দিন :
   (ক) সেক্সপিয়রের দুটি অনুবাদ নাটকের নাম করুন।
   (খ) 'কীর্তিবিলাস নাটকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
   (গ) রামনারায়ণ তর্করত্নের দুটি করে সামাজিক, পুরাণমিশ্রিত মৌলিক এবং পুরাণাশ্রিত অনুবাদ নাটকের নাম উল্লেখ করুন।
   (ঘ) 'রজতগিরি নন্দিনী' নাটকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

13.12 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) ঃ নাট্যসাহিত্যের বিকাশ—প্রতিষ্ঠা

কলকাতার সমাজের অনেকটাই যখন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে' আছেন সেই সময় আকস্মিক একটি ঘটনার সূত্র ধরে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসস্নাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)-র নাট্যজগতে আবির্ভাব। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী কাহিনী অবলম্বনে তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) প্রকাশ পায়।

তাঁর এই আবির্ভাব এমন একটি সময়ে যখন নাটকে চলছিল ইতস্তত পথ খোঁজার পর্ব। যাত্রার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাট্যকলার মধ্যে নাটকের অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর পরিচয় শর্মিষ্ঠাতেও আছে।

এখানে তিনি সংস্কৃতের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। প্রথম সংস্করণে প্রস্তাবনা সঙ্গীত ও উপসংহারগীতি ছিল, পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। নাটকের প্লটে গতির অভাব—ঘটনায় দ্বন্দ্বের তুলনায় বিবৃতি ও বর্ণনার প্রাধান্য। চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু অভিনবত্ব আছে। তিনি মহাভারত কাহিনীর নায়িকা দেবযানীর পরিবর্তে শর্মিষ্ঠাকে তাঁর নাটকে নায়িকা করেছেন। মহাভারতে দেবযানী মহিমময়ী ব্যক্তিত্বসম্পন্না, শর্মিষ্ঠা ঈর্ষাপরায়ণ, কলহপ্রিয়;মধুসূদনে দেবযানী ক্রোধ ও ঈর্ষাপরায়ণ, শর্মিষ্ঠা অনকটা নমনীয়।

পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'তে (১৮৬০) গ্রিক কাহিনী 'অ্যাপল অফ ডিসকর্ড' (Apple of discord)-এর আখ্যান ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ এক নূতন পরীক্ষা বলা যায়। মধুসূদন প্রতিভার সার্থক স্ফূরণ এখানে ঘটেনি। দৃশ্যসংস্থান, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতিতে অনেকটা দুর্বলতা থেকে গেছে। নারদ চরিত্রের কৌতুককর রূপ এবং যুরোপীয় 'ভিলেন' হিসেবে কালপুরুষ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত চরিত্র সৃষ্টিতে খ্রিস্টিয় আদি অকল্যাণ ও পাপকে যেন নাট্যকার ধরতে চেয়েছেন। চমকপ্রদ আখ্যান-সন্নিবেশ ও বহিরাগত বিপদজালের মধ্যে যতটুকু নাটকীয় রস পরিস্ফুট করা সম্ভব তার বেশি যেন তিনি এখানে আর কিছু চাননি। দেবনির্ভর, অলৌকিকতা-পিয়াসী বাঙালি রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর নাট্যকলাকে এখানে নিয়মিত করেছেন মাত্র। এই নাটকের দু'একটি সংলাপে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন। ছন্দের ইতিহাসে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

'পদ্মাবতী' রচনার বছরেই— ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করেন। ইতিপূর্বে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' (১৮৫৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন হলেও রচনাটি হুতোমের দুর্বলতার সংস্করণ। প্রহসন দুটি সমকালে তো বটেই অদ্যাবধি উৎকৃষ্টতর রচনা হিসেবে মান্য। রচনা দুটিতে বিষয়-ভাবনা, বিশ্বাস; নাটকীয় রস ও সংলাপে কোথাও সংস্কৃত প্রহসনের আদর্শের অনুকরণ নেই। ইংরেজি 'কমেডি অফ ম্যানারস'-ই এদের আদর্শ। এদিক থেকে প্রহসন দুটির ঐতিহাসিক মূল্য অছে। বাংলা নাটকে এই প্রথম ইংরেজি নাট্যশৈলীর আদর্শ রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রহসন দুটি রচিত হলেও অভ্রান্ত জীবনবোধ তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গের আঘাত এবং নাটকীয় একমুখীনতা রচনা দু'টির সাহিত্যিক আবেদন ও রস-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ইংরেজি শিক্ষিত যুব সমাজের যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও পরানুকারিতা এবং প্রবীণ সমাজপতিদের লাম্পট্য ও ভণ্ডামি ব্যাপক হয়ে পড়েছিল, মধুসূদন তার মর্মমুলে নাড়া দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত ব্যভিচার বা সমষ্টিগত উচ্ছৃঙ্খলতা কোনটিকেই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেননি, তাই প্রহসন দুটির প্রথমটিতে মেকি নীতিবাদ ও রুচিবোধের এবং দ্বিতীয়টিতে ব্যঙ্গের মাধ্যমে ধর্মধ্বজ দুশ্চরিত্রদের মুখোশ খোলবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। প্রহসনের চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন সফল। প্রথমটিতে ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বুড় সালিকের দরিদ্র কৃষক হানিফের বলিষ্ঠতা ও ক্রোধ তার কৃষক স্বভাবের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। প্রহসন দুটির ভাষা সহজ, সরস বিশুদ্ধ কথ্যভাষা। সংলাপ চরিত্রানুযায়ী। প্রথমোক্তটিতে কলকাতার কথ্যভাষা, তার উচ্চারণভঙ্গি এবং ইংরেজি বুলি, শেষোক্তটিতে ফারসি মেশানো গ্রাম্য কথ্যবুলি মানুষগুলিকে চিনতে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রহসন দুটিতে সেকালের নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীন-পন্থীদের সমালোচনা থাকায়, মধুসূদন তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তথাপি আজও এ দুটি রচনাকে পরবর্তীকালের কোনো প্রহসনই অতিক্রম করতে পারেনি।

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। টডের রাজস্থান কাহিনীর এক ভাগ্যহত রাজকুমারীকে অবলম্বন করে এর দ্বন্দ্বময় নাট্যক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। মধুসূদনের এই নাটকটি নানা

কারণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগান্তকারী সৃষ্টি। প্রথমত এটিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকে নাট্যকারকে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ আছে;দ্বিতীয়ত সংস্কৃত নাট্যরীতির আদর্শমুক্ত। প্লট নাট্যোপযোগী, গতিশীল, পরিণতি স্বাভাবিক। রচনাটিতে গ্রিক ট্রাজেডির ছায়াপাত ঘটেছে;তৃতীয়ত চরিত্রসৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ গতানুগতিকতা মুক্ত ও মৌলিক। এ সব বৈশিষ্ট্যের জন্য 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মন্তব্য করেছিল, 'কৃষ্ণকুমারী বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।...নাট্যমঞ্চে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলির অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা এই নাটকের সংলাপ রচনায় মধুসূদন গদ্যশিল্পের নূতন পরীক্ষা করেছেন। তখনও নাট্য সংলাপ রচনার কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মধুসূদন দুর্বল ও জড়তাগ্রস্থ এক ভাষা নিয়ে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন, তা থেকেই ভবিষ্যতে নাট্যকারগণ নূতন পথের সন্ধান পেয়েছেন। তাই সংলাপ রচনার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক 'মায়াকানন'। তখন তাঁর প্রতিভার সামান্যই অবশেষ রয়েছে। নেহাতই অর্থের প্রয়োজনে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রোগশয্যায় একটি কাল্পনিক অতীতাশ্রয়ী কাহিনী নিয়ে এটি লেখা। রচনাটি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। প্রতিকূল দৈবের কাছে মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কেমন করে ধ্বংস হয়, গভীর ভালবাসা কেমন করে বিপর্যস্ত হয়, তারই মর্মান্তিক রূপ ফুটে উঠেছে এই নাটকে। এতে মধুসূদনের শেষ জীবনের আত্মগ্লানির দহনজ্বালা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। মায়াকাননের ট্রাজেডি 'নিষ্করুণ ও শোকাবহ'। পরিশেষে 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক লেখবার আয়োজন করেও শেষ করতে পারেননি।

মধুসূদনের নাট্যকার জীবন ১৮৫৯-১৮৬১ তিন বৎসরের। এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে নাটক ও প্রহসন পাঁচটি ('মায়াকানন' মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। কৃষ্ণকুমারী রচনার পর অন্তরের তাগিদে তিনি আরো নাটক রচনায় হাত দেননি। পেছনে মনে হয় একটি অভিমান সক্রিয় ছিল। বেলগাছিয়া 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের পর তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর প্রহসন দুটির সেখানে অভিনয় হবে, অন্তত 'কৃষ্ণকুমারী' সেখানে স্থান পাবে, তাও হয়নি। মধুসূদন "সমস্ত আশা নষ্ট" হওয়ায় মর্মাহত হন। নাটক লেখাও একরকম শেষ হয়। কিন্তু তাঁর বিবিধ ভাষা-সাহিত্য রস-রসিক প্রতিভার আবির্ভাব বাংলা নাটক অনিশ্চিত পরীক্ষার উদ্দেশ্যহীন গতি থেকে সুনির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান পেয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)-র প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) সেকালের কৃষক সমাজের দুষ্টগ্রহ নীলকরদের অত্যাচারের ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। দীনবন্ধু সরকারি চাকরি করতেন—ডাক বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি রাজরোষের আশঙ্কায় একটি সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। যার অর্থ বিষধর নীলকরদের দংশন-কাতর প্রজাদের উদ্ধারের জন্য জনৈক পথিক কর্তৃক রচিত। নাটকটির নানা কারণে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ পাদরি লঙ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। নাটকে দরিদ্র অসহায় কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণের যে বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে, তা দেখে দেশে-বিদেশে নীলকর বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ নাটক সমস্ত দেশের বিবেকবান মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তেমনি নাট্যকারদেরও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তথাপি নাটকটি দুর্বল—ভদ্র চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যর্থতা, তাদের সংলাপের ভাষা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম, নাটকের শেষে মৃত্যুর ঘনঘটা এই দুর্বলতার জন্য দায়ী। ভদ্রেতর চরিত্রগুলি জীবন্ত। এক্ষেত্রে দীনবন্ধুর 'সহানুভূতি প্রবল ছিল'। তাই দেখি গ্রাম্য মেয়ে-পুরুষের আচার-আচরণ কথাবার্তা বাস্তবসম্মত।

নীলদর্পণের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কাহিনী-গঠনে সংহতির অভাব। বসু পরিবারের সঙ্গে সাধুচরণ রাইচরণের

অর্থাৎ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষি পরিবারের মধ্যে অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়নি। বৃহৎ কৃষকগোষ্ঠীর সর্বব্যাপী সর্বনাশের ট্রাজেডি আঁকতে গিয়ে বসু পরিবারের করুণ পরিণতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ সচেতন বাঙালি মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই সূত্র ধরে যে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তার অনুষঙ্গ হিসেবে মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' রচিত হয়। এছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), জেল দর্পণ, পল্লীগ্রাম দর্পণ প্রভৃতি অন্যান্য দর্পণ-নাটক প্রকাশিত হয়।

এর পর দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) এবং 'কমলেকামিনি' (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। কোনোটিই যথার্থ ট্রাজেডি হয়নি। এমন কি নীলদর্পণের সমকক্ষ নয়। এই সব নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সচল রেখেছেন, তা সত্ত্বেও কোনোটি উজ্জ্বল রচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তি, প্রাচীন উপন্যাস ইংরেজি বই এবং প্রচলিত খোসগল্প থেকে সংক্ষিপ্তসার নিয়ে তিনি নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন। 'নবীন তপস্বিনীতে'—এ রকমটি দেখা গেলেও, 'লীলাবতী'-তে দেখা যায়নি। অপরিমিত আয়াস সহকারে 'লীলাবতী' রচনা করলেও সুদীর্ঘ সংলাপ ও আড়ষ্ট ভাষা নাটকটির ব্যর্থতার জন্য দায়ী। বীররস প্রতিপাদন লক্ষ্য হলেও 'কমলে কামিনী' নাট্যকারের কোনো গৌরব বৃদ্ধি করেনি।

দীনবন্ধু তিনটি প্রহসন রচনা করেছিলেন—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) এবং 'জামাই বারিক' (১৮৭২)। এদের মধ্যে 'সধবার একাদশী' মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বর্ণিত অবক্ষয়ের আরও বিস্তৃত ও সার্থক রূপায়ণ। এই নাটকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্যরস দীনবন্ধুকে উচ্চশ্রেণীর কমেডি লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রহসনের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ। নিমচাঁদ প্রহসনের সর্বস্ব। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর অপূর্ব সৃষ্টি—শুধু এই প্রহসনই নয় সমস্ত বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রটি "ক্ষুরধার মনীষা ও অভাবনীয় নৈতিক অধঃপতন, আকাশস্পর্শী কল্পনা ও তার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নির্লজ্জ মোসাহেবী ও মর্মভেদী অনুশোচনার সমন্বয়ে" উনিশ শতকের যোগ্য প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করছে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো ও জামাই বারিক-এ সামাজিক ব্যঙ্গের পরিবর্তে ব্যক্তিচরিত্রের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে স্থূলহাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। বাড়িতে বিধবা মেয়ে ও নাতনি আছে। বৃদ্ধ পুনর্বিবাহের আয়োজন করলে ছেলেদের হাতে কীভাবে অপদস্থ হল তার কাহিনী। এতে 'বুড় সালিকে'র প্রভাব থাকলেও বুড় সালিকের মত তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনার পরিচয় নেই। জামাইবারিক ঘরজামাই এবং বহুবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লেখা। কাহিনী সুগঠিত। ভাষায় কৌতুকরসের সহজ প্রকাশ আছে।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আত্মপ্রকাশ (১৮৬৬)। এটি তাঁর নাট্যকৃতির অন্যতম স্বাক্ষর। নীলদর্পণ শহর-গ্রামে বহুবার অভিনীত হয়েছে। এই অভিনয় জাতীয় জীবনে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল বোঝা যায় বিদ্যাসাগরের মত স্থিতধী মানুষের আবেগ-চঞ্চল হওয়ার ঘটনা থেকে। জাতীয়-নাট্যশালার সাফল্য পেশাদার নট-নাট্যশালার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছে যেমন, তেমনি এই সাফল্য নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও বহু প্রতিভাধর ব্যক্তিকে নাটক লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বাংলা নাটক দর্শকের রুচি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এই পরিবেশে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) আবির্ভাব। ইনি হিন্দু মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়ায় স্বাদেশিকতা তাঁর অন্তরের বস্তু ছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সেই স্বাদেশিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। ফলে পুরানো দেশজরীতির দিকে বাংলা মঞ্চ ও নাটকের চোখ ফেরাতে চেয়েছিলেন। তিনি একদিকে কবি এবং জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছেন, তেমনি যে যাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই যাত্রার অনুপ্রবেশও তিনি নাটকে ঘটালেন। তাঁর নাটকে বেশি বেশি করে গান যুক্ত

করে নাটককে গীতাভিনয়ের পর্যায়ে নিয়ে যান। এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে নাটকের সাধারণ ধারা থেকে একটি স্বতন্ত্র পথে নিয়ে গিয়েছিল। মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক বা রামের অধিবাস বা বনবাস' (১৮৬৭)। অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য। এগুলি পৌরাণিক নাটক। এতে ভক্তিরসের প্রাচুর্য আছে। হরিশ্চন্দ্রে ভক্তির সঙ্গে হিন্দুমেলার বাণীটিও অত্যন্ত স্পষ্ট। মনোমোহনের নাটক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমত ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ ছিল না;দ্বিতীয়ত তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর নাটকে যুক্ত করেছিলেন;তৃতীয়ত যাত্রার আবেগময় অতিনাটকীয় ভিত্তিকে তিনি নাটকে বহুল ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত আদর্শ নাটক (Drama) রচনার পরিপন্থী হলেও বাঙালির সে সময়ের জীবনভাবনা ও রুচির অনুগামী হওয়ায়, দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাংলা নাটক, নাট্যমঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য স্থাপন করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করেছিল।

জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার বছরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) নাটক নিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেত্রিশটি নাটক ও প্রহসনের লেখক। এর বাইশটি অনুবাদ, না হয় ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ নাটকগুলি তাঁর স্বাধীন, মৌলিক নাটকগুলিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইনি সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), মালতীমাধব (১৯০০) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। প্রহসন 'অলীকবাবু' (১৯০০)—ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের কৌতুক নাটকের অনুবাদ;হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) 'দায়েপড়ে দারগ্রহ' (১৯০২) ইত্যাদি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কৌতুক রসাশ্রিত নাটকগুলি সুরুচিসম্মত স্মিতহাস্যের জন্য সবিশেষ উপভোগ্য হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে ইংরেজি নাটকের গঠনরীতির অনুসরণ আছে। দেশাত্মবোধ ও রোমান্টিক প্রেম কাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নাটকের ঘটনাকে শিথিলবন্ধ করেছে। সরোজিনী আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে রচতি। অশ্রুমতী (প্রতাপ সিংহের কন্যা) বাই শক্তসিংহ, মোগল সম্রাট সেলিমকে নিয়ে রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম প্রণয়-সংঘাত প্রভৃতির সমবায়ে তীব্র জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস পুরাণ ফরাসি নাটকের অনুবাদ ইত্যাদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিশীলিত নাট্যবোধ ও চর্চার বিষয় হলেও, সাধারণ পাঠক ও দর্শক-এর মধ্যে প্রাণের আরাম মনের তৃপ্তি পায়নি। জাতির প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনকে অবলম্বন না করার ফলে কালান্তরে তাঁর নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের গবেষকদের বিষয়মাত্র হয়েছে।

একজন প্রতিভাবান নাট্যাভিনেতা হিসাবে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে যিনি বাংলা থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)।

বাগবাজার থেকে জাতীয় নাট্যশালা এবং পেশাদার মঞ্চের অভিনেতা হিসেবে গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন দেশের নাট্যমোদি জনসাধারণের কী চাহিদা। দেশের চলিত গীতাভিনয় গ্রামীণ মানুষের বা পাশ্চাত্যরীতির নাটক বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনের সমর্থ হলেও শহর-কলকাতার মধ্যবিত্ত জনসমষ্টি এতে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। তাই তিনি এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, বাংলা নাটককে সার্থকতার পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি বাংলার নাট্যদর্শকদের সঙ্গে নাট্যশালা ও নাটকের একটি সেতুবন্ধন করে দেশের প্রবাদপ্রতিম বরণীয় নাট্যকার ও নাট্যশালার জনপ্রিয় সংগঠক-পরিচালক-অভিনয় শিক্ষক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রায় একশ'টি নাটক লিখেছেন। বিষয়বস্তু হিসেবে— পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক চরিত ও রোমান্টিক প্রভৃতি শ্রেণীতে নাটকগুলিকে বিন্যস্ত করা যায়। তিনি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কয়েকটি

প্রহসনও রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু ও নাটক পরিবেশনে নানা ধরনের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালি দর্শকের মনোরঞ্জনে প্রয়াসী হয়েছেন। যে বিষয় ও আঙ্গিক পরিকল্পনা জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছে, তার অভিনয় পুনরাভিনয়ের মাধ্যমে সেদিনের নাট্যশালাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন। বহু অকিঞ্চিৎকর নাটক রচনার জন্য গিরিশচন্দ্র আধুনিক সমালোচকদের কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। মনে রাখা দরকার সে সময়ে সমাজ-জীবনে নানা উত্থান-পতনের পর্ব চলছে। এর ওপর অন্ধ বিদেশী অনুসরণ ও খ্রিস্টধর্মের প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি, ব্রাহ্মধর্মের কলহ বিভ্রম নাগরিক জীবনকে বিপন্ন ও সংশয়াকুল করে তুলেছে। সেই সময় বাঙালির পারিবারিক জীবনের ভাঙনের ছবি তুলে ধরে এবং ভক্তিরসের সহজ পথে আকর্ষণ করে তিনি সাহিত্যিক দায়িত্ব পান করেছিলেন। ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু যেমন নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত নাটক লিখে আত্মবিমুখ বাঙালিকে আত্মস্থ করার মহান কর্তব্য পালন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায়, তাদের সামাজিক-পারিবারিক জীবনের সমস্যা সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে সমাজের প্রকৃত সমস্যার দুর্বলতম স্থানটিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদ্যপান ও তার অপরিণামদর্শিতা, কন্যাদায়, বিধবা বিবাহ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালি সেন্টিমেন্ট যুক্ত হয়ে রচিত হওয়ায় তাঁর সামাজিক নাটকগুলি পাঠক এবং দর্শকদের অনুভূতি স্পর্শ করতে পেরেছিল।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে যে অহৈতুকী ভক্তি-বৈভব লক্ষ্য করা যায় তা বহুলাংশে রামকৃষ্ণের প্রভাবজাত। এই ভক্তিরস তাঁর প্রথম জীবনের যাত্রা-সংস্কারের পোষকতা করেছিল বলে, নাটকগুলির মধ্যে একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির সাহায্যে বাংলার একান্ত আপন যে ধর্মবোধ তাকেই প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর পৌরাণিক নাটকে পুরাণ তাঁর নিজস্ব মননজাত। তিনি আপন অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার যে কল্যাণদীপটি অনির্বাণ রেখেছিলেন, সমগ্র নাট্য রচনার ভিতর দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয়ে তারই উত্তাপস্পর্শ দান করতে চেষ্টা করেছিলেন—যাতে তাদের শুভ হয়, মঙ্গল হয়।

প্রসঙ্গক্রমে গিরিশচন্দ্রের মহাপুরুষ-চরিত নাটকের উল্লেখ করতে হয়। তিনি এখানেও তাঁর হৃদয়ে নিয়তধ্বনিত রামকৃষ্ণ ভক্তির সুরকে বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে তাঁর নির্বাচিত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক জনশ্রুতি সমাজে সহজেই জন্মলাভ করে, তার ওপর ভিত্তি করে সেগুলি লিখেছেন। অলৌকিকতা ও ভক্তির অতিরঞ্জিত চিত্রে সেগুলি ভারাক্রান্ত।

ঐতিহাসিক নাটকে বিশেষ দেশ-কালের পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছভাবে কালোপযোগী স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছেন। সেখানেও দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসকে তিনি, সংযত করতে পারেননি। এ সময় পর পর কয়েকটি স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা করতে দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে যে সহজাত ভক্তিপ্রাণতার সঞ্চার হয়েছিল, তা এ শ্রেণীর নাটকে ভগবদভক্তির পরিবর্তে অতি উৎসাহে স্বদেশ-ভক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গিরিশচন্দ্র গীতি-প্রধান রোমান্টিক নাটকগুলিতে তাঁর যাত্রাদলের পুরানো সংস্কারকে কোনো মতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নক্শা বা 'পঞ্চরং' এবং লঘু ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশ্রিত প্রহসনগুলিতে তাঁর কোনো রকম সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। এগুলি রচনার পেছনে কতকগুলি ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নাট্যকার প্রকাশ করেছেন মাত্র। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সংখ্যা প্রায় একশ। শ্রেণী বিন্যস্ত করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের পরিচয় দেওয়া হল।

'নট' হিসেবে খ্যাতির ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের জন্য কিছু নাটক লেখার প্রয়োজন দেখা দেয়। মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীকে তিনি নাট্যরূপ দেন। পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য', পলাশির যুদ্ধেরও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এগুলি অভিনয় শেষে পালার যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি গীতিনাট্য আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), দোললীলা (১৮৭৮) লেখেন। প্রথম দুটি ছদ্মনামে লেখা। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনার প্রথম পর্বের নাট্যরূপ—গীতিনাট্যের মধ্যে বেশিদিন আবদ্ধ থাকেনি। তিনি মৌলিক নাটক রচনায় আগ্রহী হন। প্রথম মৌলিক নাটক 'আনন্দ রহো' (১৮৮১)—ইতিহাসের ছায়া থাকলেও নাটক হিসেবে দুর্বল। দুটি অসফল প্রচেষ্টার পর তিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হন। 'রাবণবধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস' (১৮৮২), 'জনা' (১৮৯৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রাবণবধ' তাঁর পৌরাণিক নাটক। সামগ্রিক বিচারে 'জনা' পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এটি হরিভক্তি, গঙ্গাভক্তি ও মাতৃভক্তি প্রচার করেছে সত্য, তথাপি চরিত্র সৃষ্টি, নাটকীয় সংঘাত রচনায় এটি সমগ্র গিরিশ সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জনাচরিত্র পরিকল্পনায়, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্র, মহাভারতের গান্ধারী, বৃত্রসংহারের ঐন্দ্রিলার অংশত প্রভাব আছে।

গিরিশচন্দ্র কয়েকজন ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মব্যাখাতা মনীষীর জীবন নিয়ে ভক্তিভাবমূলক নাটক লিখেছেন। এদের মানুষ হিসেবে চেনা যায় না, অধিকাংশই কল্পনাশ্রিত ও অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন। চৈতন্যলীলা (১৮৮৫), নিমাই সন্ন্যাস (১৮৮৫), বুদ্ধদেবচরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল (১৮৮৬) উল্লেখযোগ্য রচনা। চৈতন্যলীলা নাটকটির অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণ নাট্যকার অভিনেতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভাঙা অমিত্রাক্ষরে লেখা বুদ্ধদেব চরিত এডুইন আর্নল্ডের লাইট অব এশিয়া কাব্য অবলম্বনে রচিত। বিল্বমঙ্গল অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভক্তমাল অনুসরণে বিল্বমঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের জীবনী মিশিয়ে নাটকটি রচিত। ফলে নাটকে ভক্তিরসের প্লাবন বয়ে গেছে।

বাঙালির নৈমিত্তিক ও সমাজ জীবনের নানা স্তরে যে নাট্যবস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা নিয়ে নাটক লেখার অনুরোধ থেকেই তিনি কয়েকটি সামাজিক নাটক লিখেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও আন্তরিক আবেগ যুক্ত ছিল না, তাই বিষয়গুণে কয়েকটি জনপ্রিয় হলেও শিল্পবিচারে নাট্যরসিকের প্রিয় হতে পারেনি। এ নাটকগুলিতে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আছে। তাই নাটকগুলিকে সমাজচিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। এ পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হোল—প্রফুল্ল (১৮৮৯), হারানিধি (১৮৯০), বলিদান (১৯০৫)। শতাব্দীশেষের সমাজব্যবস্থার চাপে যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে সে সময় ভাঙন ধরেছে, তারই ভয়ঙ্কর অনিবার্য পরিণতির চিত্র তুলে ধরা এ নাটকের প্রতিপাদ্য হলেও, জাল-জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি পরম্পরা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডির পরিবর্তে নাটকটি হয়েছে মেলোড্রামা। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র যোগেশের করুণ আর্তনাদ আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—বাঙালির কাছে এখন প্রবাদ বাক্যের মত। 'বলিদানে'র বিষয় মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের কন্যাদায়, পণপ্রথা। সমসাময়িক একটি ঘটনাসূত্রে নাটকের পরিকল্পনা। সময় ও বিষয় গৌরবে নাটকটি একাধিকবার অভিনয় হয়েছে। প্রফুল্লর মত এ নাটকের সীমাহীন দুর্যোগ ও পরিণতিতে সমষ্টিগত মৃত্যুদৃশ্যের সমাবেশ, অতিনাটকীয়তার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশিল্প হিসাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও বিষয় গৌরবে জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী'র (১৯০৭) নাম করা যায়। নাটকগুলিতে ইতিহাসের কিছুটা অনুসৃতি আছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এগুলির রচনা।

স্বদেশচেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথম দুটি নাটক অক্ষয়কুমার মৈত্রের ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। করিমচাচা সিরাজদ্দৌলার স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। ঘটনার ঘনঘটা প্রতিটি নাটককেই আচ্ছন্ন করেছে।

গিরিশচন্দ্র আগে নট পরে মঞ্চাধ্যক্ষ-পরিচালক-প্রযোজক-নাট্যশিক্ষক-শেষে নাট্যকার। তাঁর নাটক রচনার পেছনে মঞ্চের তাগিদ—দর্শক রুচি সেখানে প্রধান নির্দেশক শক্তি। তিনি আধুনিক পাঠ্য নাটক (Reading Drama) লেখেননি। দেশ-কাল সমাজ সচেতন কবি মনীষী তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর শতাধিক নাটক আদর্শমানে না পৌঁছুলেও, অগণিত দর্শকমণ্ডলিতে অভিনয়ের গৌরবে মনোরঞ্জন যেমন করেছে, তাদের সুস্থ রুচি নির্মাণে ও নাট্যরসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছে। এখানেই তাঁর সিদ্ধি, তাঁর স্থায়িত্ব।

গিরিশচন্দ্রের সমসময়ে যাঁরা নাটক নিয়ে মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম। এঁরা মোটামুটি ভক্তিরস রঙ্গ-ব্যঙ্গ নিয়ে নাটক রচনায় অনুরক্ত ছিলেন। রচনায় আধুনিক যুগ-লক্ষণের কোনো পরিচয় নেই। এঁদের মধ্যে অভিনেতা নাট্যকার অমৃতলাল-সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন। এখানে অমৃতলালের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হোল।

অমৃতলালের (১৮৫৩-১৯২৯) একটি সরস মন ছিল। তিনি রচয়িতার প্রতিভা নিয়ে নাট্য জগতে এসেছিলেন। জীবনবোধে রক্ষণশীল হওয়ায় তাঁর রচনায় প্রগতি বিরোধী মনোভঙ্গির পরিচয় আছে। তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। লঘুনাট্যে তাই তিনি স্বচ্ছন্দ। লঘু হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও নক্‌শা জাতীয় রচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' রূপে আখ্যাত হয়েছেন। তিনি কোথাও কোথাও হাসির সঙ্গে করুণ রস বা ব্যঙ্গের ঝাঁজ মিশিয়েও হৃদয় বা বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারেননি। বরঞ্চ কোথাও বা তিনি হাসাতে গিয়ে শিক্ষিত নারী বা স্ত্রী-শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন, ব্রাহ্মণ মাত্রকেই ভিক্ষাজীবী বা পণ্ডিতমূর্খ বলেছেন, কলু, নাপিত ইত্যাদি জাত ব্যবসার কথা তুলে বিদ্রূপ করেছেন। এ-সব ত্রুটি সত্ত্বেও অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের সহযোগী বা এককভাবে সাধারণ মঞ্চের সমৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নাটক লেখা ছাড়াও অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি নাট্য জগৎকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, সেজন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অমৃতলালের জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক ও কৌতুকনাট্যের মধ্যে তিলতর্পণ (১৮৮১), চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে (১৮৮৪), বাবু (১৮৯৩) এবং ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য। 'তিলতর্পণে' গিরিশচন্দ্রের উপর কটাক্ষ আছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চের অভিনয় পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের প্রতি ব্যঙ্গ আছে। চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে ইংরেজি প্রহসন (Cox and Box) অনুসরণে রচিত। 'বাবু' রাজনৈতিক ও ধর্মঘটিত আন্দোলনে সাধারণত যে ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা থাকে, তাকে আক্রমণ করে লেখা। 'ব্যাপিকা বিদায়' অপেরার ঢঙে লেখা একটি ভালো প্রহসন। গাঢ়বদ্ধ গল্প ও মধুর রোমান্টিকতা, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহারে রচনাটি সার্থক। পরিশেষে বলা যায় লঘু নাট্যে অমৃতলাল যতখানি সফল গভীর গম্ভীর জীবনরসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ততটাই ব্যর্থ। এক্ষেত্রে 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫) তাঁর প্রথম নাটক। পূর্ণাঙ্গ কমেডি 'খাস দখল' (১৯১২)। এখানে ডাক্তার ও বিধবা বিবাহের সমর্থকদের প্রতি কটাক্ষ আছে। চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায় কৃত্রিমতা আছে। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান সামান্যই। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে তাঁর কোনো কোনো রচনাকে 'পঞ্চরং' বলেছেন। এর অর্থ যদি পাঁচ রকম বিষয় নিয়ে তামাশা করা হয় তবে পঞ্চরং সংজ্ঞাটি অমৃতলালের সকল রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৩-১৯২৭) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) দু'জন নাট্যকারই রবীন্দ্র সমসময়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁর পরিমণ্ডলে বাস করে নাটক রচনা করেছেন। এদিক থেকে তাঁদের রবীন্দ্রযুগের লেখক বলা যায়। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে নাট্যধারার বিকাশ ঘটেছে, সে সময়েই এঁদের আবির্ভাব। এঁদের

মধ্যে তাই গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের পৌরাণিক ভক্তিরসের মলয়স্পর্শ লাভ করা গেলেও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মনোবিশ্লেষণ প্রবণতাও দেখা যায়। ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন দেশপ্রেমের যে জোয়ার এনেছিল, এঁদের ঐতিহাসিক নাটকেও তার পরিচয় আছে। এছাড়া সমাজ সমস্যা ও ব্যঙ্গমূলক নাট্যধারায় প্রহসন রচনা, পুরাতন অপেরাধর্মী গীতিনাট্য তো আছেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উনিশ শতকের শেষে (প্রথম নাটক ফুলশয্যা, ১৮৯৪) নাটক রচনা শুরু করে দেশের নাট্যরসিক সমাজকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁর নাটক প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত— পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক। বাংলা নাটকের উদ্ভব থেকে যে পৌরাণিক নাট্যধারা সূচনায় দেশের ভক্তিরস-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ সেই সংস্কারের স্রোতেই গা ভাসিয়েছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ভীষ্ম (১৯১৩) নরনারায়ণ (১৯২৫) উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার চরমোৎকর্ষ্য ঘটেছে। অহৈতুকী ভক্তিকে যুক্তি ও বিচারের বন্ধনে বেঁধে নাটকটিকে যথার্থ নাট্য গুণান্বিত করেছেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাবকে স্বীকার করেও তিনি তাঁর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা সংযোজন করেছেন।

দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় ও কল্পনাপ্রধান দেশপ্রেমের বাষ্পোচ্ছ্বাসের প্রভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩), আলমগীর (১৯২১) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। নাটকগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অবাস্তব কাল্পনিকতা ও ভাবালুতার জন্য নাটকীয়তা যুক্ত হলেও সামগ্রিক অবদান ব্যর্থ হয়নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্টিক নাট্যকাব্য 'কিন্নরী' (১৯১৮) রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা' (১৮৯৭) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। শেষোক্ত রচনাটি আজও চির নতুন, চির আনন্দদায়ক নাটকের আসনে সমাসীন। এটি তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। তাঁর গানগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবি স্বভাবের জন্য তাঁর নাটকের সংলাপের সঙ্গে অতি আবেগের সুর মিশে থাকে। ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস তাঁর নাটকগুলিতে অতিনাটকীয়তার সঞ্চার করলেও তাদের অনুভববেদ্য আবেদনকে অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে— ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রহসন ও পৌরাণিক নাট্যকাব্য শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক, সেটি অনেকটা যুগ বৈশিষ্ট্যের কারণেই। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শ তাঁর নাটকের মধ্যে তীব্র ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হওয়ায় নাটকগুলি ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেক্সপিয়রের রস-প্রভাব ও বাঙালির জাতীয় ভাবাবেগকে কাব্যময় রূপ দেওয়ায় তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) হলেও 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'শাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) অত্যন্ত পরিচিত। এই সমস্ত নাট্য-কল্পনার মধ্যে বাস্তবাতিশায়ী মহনীয় উন্মাদনা, বাঙালির স্বাধীনতার অদম্য আকাঙক্ষাকে রূপ দিয়েছে। এর প্রভাবকে সেদিন কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। 'মেবার পতন' রাজপুত ও মোগল সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। ইতিহাস অনুসরণের সঙ্গে কল্পনার ও আদর্শবাদের প্রশ্রয় আছে। ফলে মানবিক কাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত। এ নাটকে তিনি জাতীয় ভাবাদর্শ ও মানবমৈত্রীর আদর্শকে তুলে ধরেছেন। 'শাজাহান' মোগলজীবন নিয়ে লেখা। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সিংহাসন অধিকারের লোভ, কামনা-বাসনা-ঈর্ষা রূপতৃষ্ণা নাটকের বিষয়। শাজাহানের ট্র্যাজেডি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মক্ষয়ে। ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠুর, শঠ এবং অত্যন্ত জটিল চরিত্র। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য অমর সৃষ্টি। ইতিহাসেরও অনুসরণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিগতভাবে দেশের, সমাজের কাছ থেকে অনেক অন্যায় ও অবিচার পেয়েছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়া তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। জাতিভেদ, বিলাত যাওয়ায় একঘরে হওয়া

অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের জাতক্রোধ ছিল। কোনো মেকিকে দ্বিজেন্দ্রলাল সহ্য করতে পারতেন না। রচনায় তারই প্রতিবাদ ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে-প্রহসনে হাসির গানে ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যাদর্শ বিচারে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) উল্লেখযোগ্য। প্রহসনের বিষয় 'সমাজব্যঙ্গ'—সামাজিক কুসংস্কারকে তিনি আক্রমণ করেছেন। 'বিরহ', 'পুনর্জন্ম', 'রুচিপূর্ণ' কৌতুকে পরিচ্ছন্ন রচনা। চরিত্র ও হাসিতে ভাঁড়ামি নেই। হাসির গানগুলি উপভোগ্য। নাট্যকার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দবিদায়' প্যারডি প্রহসনে সামান্য মতবিরোধকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। তিক্ত বেদনার স্মৃতি বিজড়িত রচনাটি সে যুগে যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৫) কোথাও যাত্রা বা ভক্তিরসের স্পর্শ নেই। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। যেমন সীতার চরিত্রে রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচন্দ্রের কর্তব্যনিষ্ঠা, বশিষ্ঠ্যে ব্রাহ্মণ সংস্কার ফুটিয়ে তুলেছেন। অনুরূপ পরিচয় পাষাণী ও ভীষ্মতেও পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যে বিবর্তন রেখাটি স্পষ্ট তা থেকে ধারণা করা যায় নাটক ক্রমশ সমাজ বাস্তবতার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

13.13 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা বাংলা নাট্য সাহিত্যে নূতন মাত্রা যোগ করেছে। পুরাণের বিষয়কে পরিবেশন করলেও, উপস্থাপনায় আধুনিকতার ছাপ আছে। পদ্মাবতীর গল্প বিদেশী, উপস্থাপনায় পূর্ববৎ। প্রহসন দুটি ও কৃষ্ণকুমারী ইংরেজি আদর্শে রচিত। প্রহসন দেশী ভাঁড়ামি বর্জিত। বিষয়বস্তু ও চরিত্রসৃষ্টি অনন্য। কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজেডি স্বতন্ত্রতর। দীনবন্ধুর স্মরণীয় নাটক 'নীলদর্পণ' শিল্প হিসেবে দুর্বল হলেও সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নাটকটি জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। তিনি সধবার একাদশীর মত প্রহসন রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধনী মধ্যবিত্তের চেয়ে ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতে সাফল্যের স্বাক্ষর আছে। মনোমোহন বসুর পুরাণাশ্রিত নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্যের সঙ্গে যাত্রা-আঙ্গিকের ব্যবহার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ফরাসি ইংরেজি নাটকের অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ইতিহাসাশ্রিত দেশপ্রেম ও রোমান্টিক প্রণয়ের নাটকও লিখেছেন। ইনি প্রধানত ইংরেজি রীতির অনুসরণ করেছেন। প্রহসনগুলি মার্জিতরুচি ও কৌতুকরসে পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র নট, অভিনয় শিক্ষক, পরিচালক ও নাট্যকার। নাট্য জগৎকে দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আধুনিক সমাজ মধ্যযুগীয় ভক্তিরস প্রচার তাঁর লক্ষ। পুরাণ এবং মহাপুরুষ চরিত্র অবলম্বনে ভক্তিরসসিক্ত নাটক রচনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত ইতিহাসাশ্রিত নাটকে স্বাদেশিকতার প্রচার করেছেন। জনরুচি ও অভিনেতাদের দক্ষতার দিকে লক্ষ রেখে নাটক রচনা করতেন। নিচুতলার চরিত্রসৃষ্টিতে অনেকটা সার্থক।

প্রধানত প্রহসন রচয়িতা হিসেবে অমৃতলাল বসু খ্যাত। তিনি প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারার বিরোধী ছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ সঙ্গীতবহুল রঙ্গনাট্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'নরনারায়ণ' স্মরণীয় রচনা। এ ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রবল। ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রধান। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কোনো সামাজিক নাটক লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রধান। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কোনো সামাজিক নাটক লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন। এ পর্বের নাটকীয় চরিত্র 'শাজাহান' অন্তর্দ্বন্দ্বে পূর্ণ ও সার্থক। পৌরাণিক নাটকে নূতনতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। সংলাপে কাব্যগুণ আছে। সামাজিক নাটক গতানুগতিক। প্রহসনের গান উল্লেখযোগ্য। আনন্দ-বিদায় বহু সমালোচিত।

13.14 অনুশীলনী 4

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে 206 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(ক) তিনি (মধুসূদন) মহাভারত কাহিনীর —— —— পরিবর্তে —— তাঁর নাটকে —— করেছেন।

(খ) কৃষ্ণকুমারী ——বাংলা সাহিত্যের প্রথম ——নাটক। — — কাহিনীর এক ভাগ্যহত — অবলম্বন করে এর —নাট্যক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে।

(গ) নিমচাঁদ দীনবন্ধুর অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটি ক্ষুরধার —— ও অভাবনীয় —— —— আকাশস্পর্শী —— ও তার ——বাস্তব পরিণতি প্রভৃতির সমন্বয়ে যোগ্য প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করছে।

(ঘ) অমৃতলালের জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক ও —— নাট্যের মধ্যে ——'চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে', 'বাবু' এবং —— উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) ক্ষীরোদপ্রসাদের —— নাট্যকাব্য ——রঙ্গনাট্য —— খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'সধবার একাদশী'র রচনা : (১) ১৮৭২
(২) ১৮৬৬
(৩) ১৮৬৭

(খ) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয় : (১) ১৮৭৩
(২) ১৮৭২
(৩) ১৮৬২

(গ) 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর রচনাকাল : (১) ১৮৭২
(২) ১৮৬৬
(৩) ১৮৮০

(ঘ) 'শাজাহান' নাটকের রচনাকাল : (১) ১৯০৬
(২) ১৯০৮
(৩) ১৯০৯

(ঙ) 'অ্যাপল অফ ডিসকর্ড'-এর আখ্যান সূত্রকে ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোন্ নাটকে? : (1) হীরক চূর্ণ (2) পদ্মাবতী (3) হঠাৎ নবাব

3. নীচের নাটকগুলির রচয়িতা কে লিখুন।

(ক) মায়াকানন (খ) লীলাবতী

(গ) হরিশ্চন্দ্র (ঘ) দায়ে পড়ে দারগ্রহ

(ঙ) আনন্দ বিদায়

4. নীচের নাটক/প্রহসনগুলির প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

(ক) 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (খ) 'রামাভিষেক'

(গ) 'হঠাৎ নবাব' (ঘ) 'খাস দখল'

(ঙ) 'নরনারায়ণ'

5. সংক্ষেপে উত্তর দিন।

(ক) 'নীলদর্পণ' নাটকটির নানা কারণে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) কয়েকটি 'দর্পণ' নাটকের নাম উল্লেখ করুন।

(গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিনটি সামাজিক নাটকের নাম উল্লেখ করুন।

(ঘ) 'বলিদান' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন।

(ঙ) 'অশ্রুমতী' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

6. (ক) বাংলা নাটকে মধুসূদনের অবদান আলোচনা করুন।

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।

(গ) "মনোমোহন বসু অপ্রধান নাট্যকার হলেও বাংলা নাটকে তাঁর অবদান আছে।" মন্তব্যটি সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

(ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ নাটকের পরিচয় দিন।

13.15 উত্তর সংকেত

13.5 অনুশীলনী **1**

1. (ক) লালবাজারের, ১৭৫৩, প্লে-হাউস।

(খ) দি ক্যালকাটা থিয়েটার, নিউ প্লে-হাউস।

(গ) হেস্টিংস, ইম্পে।

(ঘ) চৌরঙ্গী থিয়েটার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ক্লার্ক, বার ও পার্কারের।

(ঙ) বৈষ্ণবচরণ ওথেলো নাটকের।

(চ) এম. জড্রেল-এর দ্য ডিসগাইস।

(ছ) গ্যালারি, আট টাকা।

2. (ক) ১৭৭৬, (খ) ডালহৌসীতে, (গ) ২৭শে নভেম্বর, ১৭৯৫
   (ঘ) অধ্যাপক রিচার্ডসন/দ্বারকানাথ ঠাকুর।
3. (ক) এম. জড়্‌রেল মলিয়ের, দ্য ডিসগাইস, লভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর
   (খ) ম্যাকবেথ/ কোরিওলেনাস/স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল
   (গ) হেস্টিংস, ইম্পে।
4. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

13.8 অনুশীলনী 2

1. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।
2. (ক) শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, (খ) কুলীনকুল সর্বস্ব, (গ) মনোমোহন বসু, (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন।
3. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল।
4. (ক) শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শকুন্তলা।
   (খ) দর্পনারায়ণের, গোপীমোহন মৃত্যুর পর।
   (গ) উইলসন, উত্তর রামচরিত, জুলিয়াস সিজার, ইংরেজিতে।
   (ঘ) মধুসূদনের, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা।

13.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) উনিশ শতকের, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, যাত্রার।
   (খ) সেক্সপিয়র, পঠন-পাঠন
   (গ) কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন, ১৮৫২।
   (ঘ) বাস্তব সমস্যা, মৌলিক, রামনারায়ণ তর্করত্নের।
   (ঙ) নব নাটক, পুরস্কার।
   (চ) পারিবারিক, নাট্যরূপ, রূপায়িত করা, আত্মবিশ্বাস, নাট্যকারদের।
2. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল।
3. উত্তর সংকেত এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

13.14 অনুশীলনী 4

1. (ক) নায়িকা, দেবযানী, শর্মিষ্ঠাকে, নায়িকা।
   (খ) ১৮৬১, ঐতিহাসিক, টডের, রাজস্থান, রাজকুমারীকে, দ্বন্দ্বময়।
   (গ) মনীষা, নৈতিক, অধঃপতন, কল্পনা, শোচনীয়, উনিশ শতকের।
   (ঘ) কৌতুক, তিলতর্পণ, ব্যাপিকা-বিদায়।
   (ঙ) রোমান্টিক, 'কিন্নরী', আলিবাবা।
2. (ক) ১৮৬৫, (খ) ১৮৭২, (গ) ১৮৭২, (ঘ) ১৯০৯, (ঙ) পদ্মাবতী।

3. (ক) মধুসূদন দত্ত, (খ) দীনবন্ধু মিত্র, (গ) মনোমোহন বসু, (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। (ঙ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

4. (ক) ১৮৬০, (খ) ১৮৬৭, (গ) ১৮৮৪, (ঘ) ১৯১২, (ঙ) ১৯২৫

5. এবং 6 নম্বর প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত পাঠ্যবস্তু অনুসরণে তৈরি করুন।

13.16 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
4. সাহিত্য টীকা : ড. সনৎ মিত্র
5. কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয় : অমল মিত্র
6. বাংলা নাটকের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ
7. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একক 14 ❑ উপন্যাস—সূচনা-প্রতিষ্ঠা

গঠন

14.0 উদ্দেশ্য
14.1 প্রস্তাবনা
14.2 উপন্যাসের সূচনা
    14.2.1 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
    14.2.2 প্যারীচাঁদ মিত্র
    14.2.3 হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স
    14.2.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ
    14.2.5 ভূদেব মুখোপাধ্যায়
14.3 উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা
    14.2.1 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
    14.2.2 রমেশচন্দ্র দত্ত
    14.2.3 তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
    14.2.4 যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
    14.2.5 ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
    14.2.6 স্বর্ণকুমারী দেবী
14.4 সারাংশ
14.5 অনুশীলনী
14.6 গ্রন্থপঞ্জি

14.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল :

- কোন্ পটভূমিকা এবং আদর্শে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হল।
- বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গ-নক্শার গোড়াপত্তন।
- বঙ্কিমচন্দ্র-সহ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রোমান্স ও উপন্যাস রচয়িতাদের রচনার পরিচয়।

14.1 প্রস্তাবনা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্শাধর্মী রচনা থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেই পর্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের রচনার বিবরণ এর মধ্যে রয়েছে।

নির্বাচিত লেখকদের মধ্যে আছেন ভবানীচরণ, ম্যুলেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হুতোম

(কালীপ্রসন্ন সিংহ), বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী।

14.2 উপন্যাসের সূচনা

গল্প শুনবার আকাঙক্ষা মানুষের চিরকালের। প্রাগৈতিহাসিক বর্বর মানুষের পর্ব থেকে বিচিত্র বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের যে অগ্রগতির ইতিহাস তার সঙ্গে ওতপ্রোত রয়েছে এই অবিচ্ছেদ্য স্বভাবধর্ম। অনুন্নত সভ্যতা এবং মানসিকতা একই সঙ্গে তাকে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। প্রাচীনকালের গল্প-কাহিনীতে তাই এত ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের আসা-যাওয়া। কিন্তু এ কথাও একই সঙ্গে বলবার যে সভ্যতার বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ এই জগতের রস তথা আকর্ষণ বিস্মৃত হতে পারেনি। রাজপুত্র-রাজকন্যা আমাদের চেতনার নিত্য সহচরের মতো। আজকের গল্প-কাহিনীতেও অনায়াসেই তার পরোক্ষ ছায়া চলে আসে।

পারিভাষিক পরিচিতিকে সরল করে বললে দাঁড়ায়—আধুনিক উপন্যাসের মূল নিহিত রয়েছে রোমান্স'-এর মধ্যে। 'রোমান্স' বলতে বোঝায়, যেখানে কল্পনার প্রাধান্য অবারিত এবং বাস্তবের স্থান রীতিমত সংকুচিত। প্রাচীনকালে প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহসিকতা ইত্যাদির আতিশয্যপূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে অনেক 'রোমান্স' রচিত হয়েছিল। তবে তা পদ্যে। পরবর্তীকালে গদ্যেও এধরনের প্রচুর লেখা হয়েছে। অবশ্য সময় যত অগ্রসর হয়েছে, 'কল্পনাকে' তত সংযত হতে হয়েছে, সেই জায়গায় এসেছে মানুষের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতারই ছবি।

ইউরোপে আজ থেকে আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় আগে জন্ম নিয়েছে আধুনিক উপন্যাস। ইতিহাসের পরম্পরা বা ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে দেখা যায়, এরও দু'শো বছর আগে থেকে (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী) নবজাগরণের (রেনেসাঁস) প্রভাবে ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি লোকভাষাগুলি রীতিমত সমাদর ও প্রতিষ্ঠা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে অনেক কম দামে বই গিয়ে পৌঁছেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। এই সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করার জন্যই ইউরোপের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার গদ্যরীতিতেও গল্প-কাহিনী লেখা শুরু হল। এই পর্বের মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি বাস্তববাদী। সেই বাস্তবজীবন খুব স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রবিন্‌সন ক্রুশো, ডন্ কুইক্‌জোট, গালিভার্‌স ট্রাভেল্‌স বা ক্যান্‌ডিড্-এর মতো রোমান্স, উদ্ভট বা রোমান্সের ব্যঙ্গধর্মী রচনা পাঠকমনকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু পরে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ বা গ্যেটের মতো সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনা বা মূল্যবোধে পাঠককে প্রাণিত করে। এই মূল্যবোধ সেদিন অনিবার্য ছিল। একদিকে শিল্পযুগ অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিস্তার—অন্য কোনও পিছন ফেরা মানসিকতাকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দিত না।

উপন্যাসের পূর্বসূত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসের পরম্পরা অনুসরণ করে, আরো পিছনে গেলে দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রিক বা রোমান সাহিত্যের মতো রোমান্টিক আখ্যান রচিত হয়েছিল। গুণাঢ্য-এর 'বৃহৎকথা' অবশ্য পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে সোমদেব-এর 'কথাসরিৎসাগর', ক্ষেমেন্দ্র-র 'বৃহৎকথামঞ্জরী', শিবদাস-এর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', দণ্ডী-র 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধু-র 'বাসবদত্তা', বাণভট্ট-এর 'কাদম্বরী', বিষ্ণুশর্মা-র 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'হিতোপদেশ'-এর মতো রচনা। প্রাচীন

বাংলা সাহিত্য দেবকাহিনী-নির্ভর হলেও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় বাস্তবজীবনরসের রীতিমত প্রতিফলন রয়েছে। আমাদের আখ্যান বা রোমান্টিক গল্প-গাথায় এ ঐতিহ্য তাই কোনো না কোনো আকারে থেকেই গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙালিকে প্রভাবিত করেছে। ভগীরথের মতো একে আহ্বান জানিয়েছেন ভারতপথিক রামমোহন। পশ্চিমের যুক্তিবাদকে তিনি আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। সব্যসাচীর মতো তিনি একদিকে খ্রিস্টান মিশনারী, অন্যদিকে রক্ষণশীলদের অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অস্ত্র ছিল মুক্ত চিন্তা, জোরালো যুক্তিবাদ এবং গভীর বাস্তববোধ। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতির ঐতিহ্য একে স্বীকার করেই অগ্রসর হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা এইরকম এক কোলাহল সংক্ষুব্ধ পরিবেশেই। নতুন কাল পুরনো কালের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার-বিচার সমস্ত কিছুকেই প্রশ্ন করছে। আলোচনায় তখন শুধু যুক্তি যথেষ্ট নয়, হৃদয়াবেগও সেক্ষেত্রে অবধারিতভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে আসে ব্যঙ্গবিদ্রুপের তীক্ষ্নতা। সেটাই হয়ে দাঁড়ায় একটা সামাজিক মূল্যবোধের মতো ব্যাপার। এই মূল্যবোধই দেখতে শেখায় সমাজের অসুখ কোথায়, বিকৃতি কিসে, আতিশয্য-অসঙ্গতিইবা কোন্‌খানে কেন প্রকাশ পাচ্ছে। উপন্যাস রচনার ঠিক পূর্ববর্তী স্তর বা অঙ্কুরোদ্‌গমের পর্বে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-নক্‌শাই সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম অবলম্বন হয়ে থাকে। আমাদের সাহিত্যেও তার অন্যথা কিছু ঘটেনি।

সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠায় এই ব্যাপারটিই আত্মপ্রকাশের জোরালো মাধ্যম খুঁজে পেল। সংবাদপত্রের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক এমনিতেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জীবনের বিচিত্র সংবাদ আর ছবি তো এখানেই এসে ছাপার হরফে সকলের কাছে পৌঁছে যায়। সে সংবাদ আর ছবির বিচিত্র বিবরণ বা রূপ জীবনেরই প্রতিরূপ। মানুষ এরই মধ্যে খুঁজে পায় নিজেকে—নিজের কালকে। উপন্যাস সৃষ্টির সূচনা এখানেই। যদিও, বলাই বাহুল্য যে সংবাদপত্রের সংবাদ, তা যত তথ্যনিষ্ঠই হোক না কেন, কোনোভাবেই উপন্যাস বা ছোটগল্প নয়। না হলেও আমরা দেখি যে, সমাজের বিশেষ কোনো শ্রেণীর জীবনের টুকরো টুকরো দিকগুলিই কেমনভাবে একটা পুরো চরিত্রের আদল পেয়ে যায়। এরকমই একটি দৃষ্টান্ত হল 'তিলকচন্দ্র'। ধনী মানুষের আদুরে, দাম্ভিক সন্তান। মোসাহেব পরিবেষ্টিত এবং 'বাবু' সংস্কৃতির আদিপুরুষ। 'সমাচারদর্শন'-এর দুটি সংখ্যায় (২৪ ফেব্রুয়ারি, ৯ জুন—১৮২১) এর বর্ণনা ছিল। ভবানীচরণ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ—তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। এমনকী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যে নতুনদা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তা কোনো না কোনো অর্থে সেই তিলকচন্দ্রেরই প্রেতাত্মা।

14.2.1 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)

সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা বলেছেন যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্ভবত এই ধরনের নক্‌শাধর্মী রচনার সূচনা করেন।

বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি পর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সি, রামমোহন এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রের ভূমিকাই সাধারণত সবিস্তারে আলোচিত হয়ে থাকে। তুলনায় এই পর্বেরই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ

কিছুটা উপেক্ষিত থেকে যায়। এ কথা বিশেষভাবে বলবার যে সাময়িকপত্র সম্পাদনা এবং সাময়িকপত্রের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যসাধনায় তিনি তাঁর সময়ের মাপে ও ধারায় যথেষ্টই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গের নক্‌শা রচনায় পথিকৃৎ হিসেবেই যে সিদ্ধি তিনি অর্জন করেছিলেন তাও বলবার মত।

সম্ভবত মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' মাসিক পত্রিকাতে নানারকম ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নক্‌শা লিখেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ' বা 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত'-এর মত নক্‌শার রচয়িতা ছিলেন ভবানীচরণ।

এই সব প্রচেষ্টারই পরিণতি হল 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা হয় যে, 'প্রমথনাথ শর্মন'—ছদ্মনামে অনেক আগেই বইটি তিনি লিখেছিলেন। অর্থের অহঙ্কারে স্ফীত হঠাৎ বাবুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানারকম স্খলন-পতন-ত্রুটিই এর বিষয়বস্তু তথা অবলম্বন। 'আলালের ঘরে দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র অঙ্কুর এই বইতেই আমরা প্রথম দেখি। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের কালে তিনি আমাদের ভাষায় এইভাবেই লালিত্য এবং রসসঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই পথিকৃৎ।

ভবানীচরণের প্রথম প্রকাশিত বই কিন্তু 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রিঃ)। কলকাতায় যে সব মানুষ থাকেন না বা যাঁরা গ্রামের মানুষ, তাদের কলকাতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করার জন্যই এই বইটি তিনি রচনা করেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ এতে ছিল না, ছিল সমকালীন 'কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত'। তাঁর 'দূতীবিলাস' প্রকাশিত হয়েছিল এই বইয়ের দু'বছর পরে (১৮২৫ খ্রিঃ)।

'নববাবুবিলাস'-এরই পরিপূরক রচনা হ'ল 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ খ্রিঃ)। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে এটি লেখা হয়েছিল। স্বয়ং লেখক মন্তব্য করেছিলেন, 'অদ্যাপি নববাবু বিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে। কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি। সেই বিবিরূপ প্রধান মুলের অঙ্কুরাবধি শেষ তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। এ নিমিত্তে তৎ-প্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।'

মোট কথা 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', 'দূতীবিলাস' এবং 'নববিবিবিলাস'—এই সমস্ত নক্‌শা শ্রেণীর রচনার জন্যই ভবানীচরণের প্রতিষ্ঠা। সে সময়ের কলকাতার নাগরিক সমাজের কদাচারগুলিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেই এই আখ্যানগুলি তিনি রচনা করেন। এই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শাগুলি থেকেই বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে রুচির স্থূলতার দিকটি বিবেচনার মধ্যে না রাখলে লেখক ভবানীচরণের শক্তিকে স্বীকার করতেই হবে।

14.2.2 প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

ইংরেজি ১৮০০ সাল থেকে ১৯১৪ অর্থাৎ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধুরীতির অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা থাকলেও চলিতরীতিতে গদ্যরচনার চেষ্টা অল্প হলেও পাশাপাশি চলেছে। সেই সঙ্গে এ সংক্রান্ত বিবাদ-বিতর্কও। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। এঁদের মধ্যে রামরাম বসু এবং উইলিয়ম কেরি মুখের ভাষাকে গদ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। প্রথম জনের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং দ্বিতীয় জনের 'কথোপকথন' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য রচনা। এ অবশ্য ব্যতিক্রমই। কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকরা সাধারণভাবে সাধু গদ্যরীতির ওপরেই নির্ভর

করেছিলেন। রামমোহনের গদ্যরচনার সমকালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নক্‌শাগুলিতে কথ্যভঙ্গি ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিতর্কমূলক বা আক্রমণাত্মক রচনার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে গিয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগরমশাই পর্যন্ত কয়েকটি রচনায় ব্যঙ্গাত্মক কথ্যভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। যদিও একই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকদের চেষ্টায় সাধুভাষার আদর্শ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার তুলনায় কথ্য বা শিষ্ট চলিত গদ্যরীতির কোনো স্থির আদর্শ গড়ে ওঠেনি। চলিত গদ্যের গুরুত্ব বা শক্তি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের আগে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি।

এই পটভূমিকাতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য রচনার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা বিষয়ে সচেতনতা এবং মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা—প্যারীচাঁদের এই দুটি বিশেষত্ব সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল যে—সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের হাতে যে ভাষা গড়ে উঠেছিল তা সুন্দর হলেও সর্বজনের বোধগম্য হয়ে উঠতে পারেনি। সেই সঙ্গে ছিল ইংরেজি অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। বাঙালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাইরে যাবার সাহস করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই দুটি গুরুতর বিপদ থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা প্রত্যেক বাঙালি বুঝতে পারে, ব্যবহার করে, তিনিই প্রথম তা তাঁর বইয়ে প্রয়োগ করেন। ইংরেজি এবং সংস্কৃতের দ্বারস্থ না হয়ে ‘স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার’ থেকেই নিজের রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ লিখে প্যারীচাঁদ দুটি প্রয়োজনই সিদ্ধ করেন।

১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ‘মাসিক পত্রিকা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে এই পত্রিকায় যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাতেই সমস্ত প্রস্তাব রচনা করা হবে। আরও সরলভাষায়, কথ্যরীতির গদ্যই হবে এই পত্রিকার সবরকম রচনার ভাষা। মোট কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখার সঙ্গে সাধারণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। এই পত্রিকাতেই তিনি ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন—‘আলালের ঘরের দুলাল’। এই বই বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (যদিও সফল পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের জন্য আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে)। প্রকাশকাল ১৮৫৪ সাল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের কথাতেই বললেন যে, প্যারীচাঁদই প্রথম সার্থকভাবে প্রমাণ করলেন যে— বাঙালির প্রতিদিনকার ব্যবহারের ভাষায় বই লেখা যায়। এই ভাষা সুন্দর, সকলের কাছেই পৌঁছে যায়। ভাষার এই সামর্থ্যের কথা জানবার পর থেকে বাংলা সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এর ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। কিন্তু এই বইয়ের দ্বারা প্রথম প্রমাণিত হল যে, কথ্যচলিতভাষা সংস্কৃতনির্ভর সাধুভাষার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। পরবর্তীকালের গদ্যলেখকেরা এরই প্রভাবে সংস্কৃতরীতি এবং কথ্যরীতির গদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করেই গদ্য লিখবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এর যে গুরুত্ব তা এই জন্যই। মুখের ভাষাভঙ্গিকে আশ্রয় করে প্যারীচাঁদ সত্যিই সেদিন আশ্চর্য বাস্তবতায় কলকাতার নাগরিক জীবনকে ধরতে পেরেছিলেন। যেমন : ‘রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা ধপাস ধপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া

আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন— মেয়েরা ঘাটে সারি হইয়া পরস্পর মনের কথা কহিতেছে।'

বা, 'বাবুরামবাবু চৌগোঁপপা...ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে। শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুই-চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পান্‌সি ভাড়া কর তো। বড়মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেআদব হয়, হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি।...চল্‌তি পান্‌সি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা?'

প্যারীচাঁদ আরও কিছু আখ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা ঠিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)। এখানে দশটি আখ্যান আছে। আখ্যানগুলিতে আমারে হিন্দুসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা না-বাচক দিকগুলিই উপস্থাপিত করা হয়েছে। গল্পগুলি ঠিক জমে ওঠেনি। কিন্তু লেখকের সরসকৌতুক বলবার মত।

'রামরঞ্জিকা' (১৮৬০) মেয়েদের জন্য সংলাপের ঢঙে লেখা। গল্পের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে অত্যন্ত সামান্য। তাছাড়া রয়েছে নীতি উপদেশের আধিক্য। 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) আখ্যানে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন লেখক গল্পের আকারে। 'অভেদী' (১৮৭১) এবং 'আধ্যাত্মিকা' দুটি রচনাই রূপকধর্মী উপন্যাস। সাহিত্যের ঐতিহাসিক-সমালোচকদের বিবেচনায় অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিক প্যারীচাঁদ বড় হয়ে উঠেছেন। গল্পরস আড়ালে চলে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় সরস রসিকতা থাকলেও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাছাকাছি এসব রচনা আসে না। বিজ্ঞান বা কৃষি বা অন্যান্য কিছু বিষয়ে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে লিখেছিলেন, এমনকী ব্রহ্মসংগীত। কিন্তু এসব উল্লেখ করার মত রচনা নয়। সাহিত্যগুণেরও সে অর্থে অবকাশ নেই। মোটকথা প্যারীচাঁদ প্রতিদিনের চেনা জীবন আর ঘরের কথাকেই সরস নৈপুণ্যে পরিবেশন করেছেন। আর সেইজন্যেই তার এত আদর। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।' প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে প্রযোজ্য।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে ঃ 'বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের দান যেরকম, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের দান প্রায় সেইরকমই।' প্যারীচাঁদের রচনায় ব্যাকরণগত দৌর্বল্য ও আভিধানিক শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় মৌলিকত্ব ছিল। প্যারীচাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের আগে বাংলা উপন্যাস বলতে সংস্কৃত ফারসি উর্দু ও ইংরেজি থেকে নেওয়া গল্প-কথা ও রোমাঞ্চ কাহিনীই বোঝাত। প্যারীচাঁদের সম্বন্ধে সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে, নীরস ছাঁদে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যে রচিত প্রচলিত রোমাঞ্চ কাহিনীর ঊষর অন্ধকার থেকে প্যারীচাঁদ বাংলা উপন্যাসের বীজ আলোকে এনেছেন। (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৮৭ সংস্করণ)

14.2.3 হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স

প্যারীচাঁদের উপন্যাসের আগে প্রকাশিত একটি রচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার। যদি উপন্যাস হিসেবে বিচার করতে হয় তাহলে একেও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এই রচনাটির নাম 'ফুলমণি ও

করুণার বিবরণ'। ১৮৫২ সালে কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স নামে এই মিশনেরই এক ফরাসি মহিলা এটি রচনা করেন। অবশ্যই এটি মৌলিক কোনো রচনা নয়। ইংরেজি থেকে বাংলা রূপান্তর। দেশীয় খ্রিস্টান পরিবারের বর্ণনাই এতে স্থান পেয়েছে। মিশনারি খ্রিস্টানদের মতই ম্যুলেন্স বিশ্বাস করতেন যে, যিশুই পরম পরিত্রাণের একমাত্র অবলম্বন। এই সব কথা প্রচারের জন্যই তিনি মূল ইংরেজি আখ্যান "The Week"-এর গল্পাংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে বলতে হয় যে, ম্যুলেন্স-এর জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু এ দেশেই। সাধু বাংলা ভাষার সঙ্গে কথ্য বাংলাও তিনি রীতিমত আয়ত্ত করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে প্যারীচাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের আগেই ম্যুলেন্স-এর এই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আখ্যান অংশ, চরিত্র বা ভাষা কোনোদিক দিয়েই একে সে সময়ের তুলনায় পিছিয়ে-পড়া রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এর ভাষা এত সহজ এবং সরল, যে আখ্যানটি কোন বিদেশিনী লিখেছেন বলে মনেই হয় না। (*দ্রষ্টব্য* : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত) তবে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচারের জন্যই বইটি লেখা হয়েছিল বলে সে যুগে এবং পরবর্তীকালের বাঙালিসমাজে এর প্রচার হয়নি।

14.2.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

নক্শাধর্মী রচনায় পরম সিদ্ধি কালীপ্রসন্ন সিংহের। খুব অল্প বয়স থেকেই ধনীর দুলাল কালীপ্রসন্ন নানারকম সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। একটিমাত্র বই লিখেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন। সেই বইটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬৪)। একটু আগেই যে 'বাবু' সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-য় তাদেরই বিকৃত জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে কলকাতার সে সময়কার নাগরিক জীবনের ছবি বিদ্রূপাত্মক ঢঙে আঁকা হযেছে। শুধু মুখের ভাষার ভঙ্গি নয়, তাঁর ব্যবহৃত শব্দের উৎসও লোকায়ত বাক্-রীতি। এই বইয়ের কোথাও সাধুরীতির অনুসরণ নেই। যাকে কলকাতার 'কক্নি' বলে, হুতোম তাই ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা কলকাতার বিচিত্র পাল-পার্বণ, উৎসব, বারোয়ারি পুজো, নানারকম হাস্যকর হুজুগ, কপটতা, হঠাৎ পয়সায় ফেঁপে ওঠা, 'বাবু'-দের বিচিত্রলীলা, মাহেশের রথযাত্রা থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিটবাবু—সব কিছুরই তির্যক বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতই অভিনব। কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একালে যতই প্রশ্ন তোলা হোক না কেন তিনি যে আন্তরিকভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থব্যয়ে তাঁর কোনো কার্পণ্য ছিল না। আমাদের নাগরিক জীবনের বিচিত্র ব্যভিচার বা ইতরতা কালীপ্রসন্ন বা হুতোমের একেবারেই পছন্দ হয়নি আর সেইজন্যই দুই খণ্ডের এই নক্শা। এতে তিনি প্রকৃতই সাহস এবং বাক্-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। বাঙালির নীচতাকে সে সময়ে এভাবে কেউ আক্রমণ করতে পারেননি। তাঁর ভাষা অবশ্য এইজন্য যে কোনো কোনো সময় অমার্জিত এবং রুচিবিরোধী হয়েছে এতেও সন্দেহ নেই। সেই সময়কার ভিক্টোরিও নীতিবোধে পুষ্ট আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এ ভাষা পছন্দ করেননি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যরথীর বক্তব্য ছিল যে হুতোমের ভাষা দরিদ্র, এতে শব্দসম্পদ নেই, তেজ বা বাঁধনেরও খুব অভাব। সব মিলিয়ে এ ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতার

কোনও স্পর্শ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল 'হুতোমি ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্যে নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'হুতোমি ভাষার মত শক্তিশালী তীক্ষ্ণভাষা পরবর্তীকালে চলিতভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।'

হুতোমি ভাষার উদাহরণ :

"এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেছে, 'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের খোল বাজে, গোলাপিখিলির দোনা বিক্রি হচ্ছে।"

একালের প্রায় সমস্ত বিদগ্ধ বাঙালি সাহিত্যরসিকই 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-কে বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কীর্তি বলে স্বীকার করেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার সঙ্গে হুতোমের ভাষার একটি তুলনামুলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম জন প্রধানত সাধুভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। সেই সঙ্গে কলকাতার 'কক্‌নি' ভাষা এমনকী গ্রাম্যভাষাও তিনি পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় সাধু-চলিতের মিশ্রণও ঘটেছে যথেচ্ছভাবে। অবশ্য এ ত্রুটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। কালীপ্রসন্ন কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখলে পুরো কলকাতার চলিতভাষাই ব্যবহার করেছেন, কোথাও তাকে সাধুভাষার সঙ্গে মিশিয়ে বা গুলিয়ে ফেলেননি। মুখের ভাষাকে লেখায় আনবার ব্যাপারে ব্যক্তিগত উচ্চারণের রীতি, মুদ্রাদোষ—সমস্ত বানানই তিনি এনেছেন ধ্বনি অনুসারে। শুদ্ধ বানান সেসব ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ ভাষার প্রতিস্পর্ধী কোনো লেখার পরিচয় কিন্তু নেই। বিংশ শতাব্দীতে প্রমথ চৌধুরীও এই ধরনের কথ্য গদ্য লিখতে পারেননি। তাঁর চলিত গদ্য এতই মার্জিত এবং শিষ্ট যে তাকে সাধুভাষার মতোই অনেক সময় কৃত্রিম এবং গুরুভার মনে হয়।

যাই হোক, প্যারীচাঁদের সঙ্গে হুতোমের সাদৃশ্যের দিকটিও বিশেষভাবে বলবার। সেটি হ'ল, দুজনেই বাঙালিসমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন। দুজনেই আমাদের সে সময়কার সামাজিক জীবনের কদর্যতার নিন্দা করেছেন। প্যারীচাঁদ হাসির রসে মিশিয়ে তাঁর নিন্দা-কটাক্ষকে উপস্থাপিত করেছেন। হুতোম এরকম কোনো তির্যক পথ অবলম্বন করেননি। সেদিনকার কলকাতার নাগরিক জীবন ও সমাজের না-বাচক দিকগুলিকে তিনি নির্মমভাবেই আঘাত করেছিলেন। তাঁর ভাষাও যে অনেক সময় অমার্জিত এবং অশিষ্ট হয়েছে তা এইজন্যই।

14.2.5 ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমণিকা হিসেবে তাঁর চরিত্রের মৌলিক দিকটির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় পূর্ণ অভিনিবেশ সত্ত্বেও আত্মবিস্মৃত হয়ে সে পথের পথিক হননি। স্বদেশের প্রায় সব কিছুতেই ছিল তাঁর অখণ্ড আস্থা। যদিও অন্ধবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পাশ্চাত্য বা স্বদেশী—ভূদেব কোনো দিকেই চরমপন্থী ছিলেন না। বিচারবুদ্ধি দিয়ে যার যেটুকু গ্রহণ করবার, যেটুকু অবলম্বন করলে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং গতিশীল সময়ের সঙ্গে সর্ব অর্থে যুক্ত থাকা যায়—

গ্রহণবর্জনের সেই কঠিন সামঞ্জস্যসাধন নিজের জীবনচর্চায় তিনি সম্ভব করে তুলতে পেরেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি পড়াশুনো করেছিলেন হিন্দু কলেজে; কিন্তু নতুন কালের শিক্ষা বা সভ্যতায় আলোকিত মন নিয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারেই তাঁর অভিনিবেশ ছিল বেশি। এককথায় আধুনিক হয়েও আধুনিকতার নামে নির্বিচারে তার সবকিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না ভূদেব। সেজন্য তাঁকে বাইরের দিক দিয়ে অবশ্যই কিছুটা রক্ষণশীল মনে হয়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে ভূদেবের রচনা পর্যালোচনা করলে এ কথা মানতে হবে যে, যুক্তিনিষ্ঠ এবং অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছু তিনি করেননি। বিচার-বিশ্লেষণাত্মক রচনায় ভূদেব যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক প্রবন্ধকারই ভূদেবের এই সার্বিক যুক্তিমনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সাহিত্যের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'যুবশক্তিকে সমন্বয়ধর্মী জীবনপথে পরিচালিত করা—সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখার নৈতিক আদর্শ স্থাপন তাঁহার জীবনাদর্শ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব জ্ঞান বিসর্জন দিয়া একটা রক্তমাংসহীন পাণ্ডুর নীতি ও আদর্শ তাঁহাকে কোন দিন প্রলুব্ধ করে নাই। বাঙালিকে বৃহৎ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তাহাকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় জীবনাদর্শে দীক্ষিত হইতে হইবে, কিন্তু পায়ের তলার মাটি ভুলিলে চলিবে না। সে মাটির অর্থ বাঙালি যে বৃহৎ ভারত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। এ বিষয়ে তিনি আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন'। (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ভূদেব প্রধানত শিক্ষাব্রতী। তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি হল : ১. 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), ২. 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' প্রথম ও দ্বিতীয় (১৮৫৮-৫৯),। ৩. 'পুরাবৃত্তসার' (১৮৫৮), ৪. 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), ৫. 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), ৬. 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), ৭. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪)। ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রের এই গ্রন্থগুলি একসময় স্কুল-কলেজের অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ইতিহাস ভূদেবের প্রিয় প্রসঙ্গ। কেবল ছাত্র নয়, সাধারণ পাঠকের দিকেও তাঁর অভিনিবেশ ছিল অতন্দ্র। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর দুটি খণ্ডে সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরচরিত, রত্নাবলী. মৃচ্ছকটিক এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও এব্যাপারে তাঁর সাফল্যকে কখনোই বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করা যায় না। বিশ্লেষণের সামর্থ্যে তিনি এব্যাপারে কিছুটা পিছনেই ছিলেন। এছাড়া রয়েছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ'-এর মত রচনা। সামাজিক আদর্শ তথা নৈতিকতা, ব্যক্তিমানুষের অধিকার বা কর্তব্যপালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে ধরনের চিন্তামূলক আলোচনা তিনি এইসব রচনায় করেছিলেন তার গুরুত্ব ঊনবিংশ শতাব্দী তো বটেই আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। অবশ্য কালের পরিবর্তনের কথা মনে রেখেই এ কথা বলা হচ্ছে। এখানেও তিনি উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং সময়ের তুলনামূলক বিবেচনায় অবশ্যই আধুনিক।

এ হল ভূদেবের গদ্যরচনায় প্রবন্ধের দিক। কিন্তু তিনি তো রসস্রষ্টাও বটে। প্রথম যৌবনে ইতিহাসকে অবলম্বন করে চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাস-নির্ভর রোমান্স রচনার। তাঁর দুটি ঐতিহাসিক রোমান্স অবশ্যই উল্লেখ করার মত। ১. 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) এবং ২. 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ—এডুকেশন গেজেট, ১৮৭৫; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৯৫)। ইংরেজি 'রোমান্স অফ হিস্ট্রি' নামের কাল্পনিক

কাহিনীর আদর্শে প্রথম গ্রন্থটির পরিকল্পনা করা হয়। 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামের দুটি বড় গল্প নিয়ে এটি রচিত। পটভূমি ভারত-ইতিহাসের মুসলমান যুগ। অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর প্রভাব অনুমান করেন। তবে এরকম তুলনার একটা অসুবিধে এই যে, বঙ্কিমের সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক প্রতিভার সামর্থ্য ভূদেবের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। দুটি উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে কিছুটা মিল আছে, এইমাত্র। তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক রোমান্স 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর পরিকল্পনা-কৌশল উল্লেখের দাবি রাখে। লেখক স্বপ্ন দেখেছেন তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বালাজী বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি পরাজিত করেছে মুসলমানশক্তির নেতা আহমদ শাহ্ আবদালিকে। এর ফলে ভারতবর্ষের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে তারই এক কাল্পনিক এবং সরস বিবরণ এই রোমান্সের মূল আখ্যান অংশ। ভূদেবের ইতিহাসবোধ, দেশপ্রেম এবং কল্পনাশক্তি সমস্ত এক সঙ্গে মিশে গিয়ে রচনাটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

জীবন এবং ভাষা ব্যবহার—ভূদেব উভয়ক্ষেত্রেই সংযত। অনেকে তাঁর ভাষায় সরসতা খুঁজে পান না। এ কথা সত্য নয়। যেখানে তিনি প্রবন্ধকার সেখানে তাঁর কাছ থেকে রম্য বা রস রচনার স্বাদ ও মেজাজ প্রত্যাশা করা অনুচিত। মননশীল রচনায় তাঁর ভাষা বিষয় অনুসারেই বিন্যস্ত—তা যুক্তিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। আড়ম্বর ও অহেতুক আবেগবর্জিত। অন্যদিকে যেখানে তিনি রোমান্স রচয়িতা, 'উপন্যাস' রচনায় যত্নবান, সেখানে তাঁর ভাষা অবশ্যই আখ্যানোপযোগী এবং সাহিত্য রসাশ্রয়ী।

14.3 উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা

14.3.1 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাংলা উপন্যাস যথার্থ পরিণতি লাভ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। প্যারীচাঁদ মিত্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকেরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন আন্তরিকভাবেই। কিন্তু আধুনিক বাস্তবধর্মী মানসিক বিচিত্র টানাপোড়েননির্ভর যে কাহিনী তা রচনা করা তাঁদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। ঠিকই যে, প্রথম জন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত রচনায় উপন্যাসের একটা পটভূমি তৈরি করতে চেয়েছেন, কিন্তু চরিত্রে যে ব্যক্তিধর্ম বা অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি কাহিনী-নির্ভর রচনাকে উপন্যাস করে তোলে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আমাদের কোনো সাহিত্যপ্রতিভাই তার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে পারেননি।

সাহিত্যের ঐতিহাসিক-সমালোচকদের কাছে তাই এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত যে, বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের সামর্থ্য এবং সৌন্দর্য অর্জন করেছে। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যেই সতেজ ও সমৃদ্ধভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ। গভীর জীবনরস ও রহস্য অনন্য সাহিত্যিক শক্তিতে বঙ্কিম উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সৃষ্টির জগতে। এ বস্তুর স্বাদ বাঙালিকে প্রথম তিনিই দিয়েছেন। তাঁর মর্যাদা শুধু পথিকৃতের নয়, অসাধারণ সিদ্ধিতেও।

ইংরেজি ভাষায় গদ্যকাহিনী 'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ' (রাজমোহনের স্ত্রী) বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস। দ্রুত তিনি ফিরে আসেন বাংলাভাষা ও সাহিত্য রচনায়। সব মিলিয়ে উপন্যাস লিখেছেন চোদ্দোটি। গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলির বিভাজন এইরকম :

১. ইতিহাস ও রোমান্স : 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

২. সামাজিক উপন্যাস, বড় গল্প : 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'রাধারাণী' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

৩. তত্ত্ব এবং দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস : 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), সীতারাম।

এই বিভাজন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি অনুমান করা যায়। পরবর্তী বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা এই গোত্রীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সফলকাম হননি, সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'স্কটের অর্ধ ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যান এবং ডিকেন্সের দৈনন্দিন জীবনের গল্পরসের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যাইবে। তাই তাঁহার উপন্যাসে যেমন রোমান্সের বিচিত্র ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি বাস্তব জীবনও পুরাপুরি উপেক্ষিত হয় নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)।

1. ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস ঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্তই হল ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানুষের বিচিত্র জীবনকথা ঔপন্যাসিককে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু ইতিহাসের নীরস তথ্যের পুনরাবৃত্তি নয়। সময়কে রূপ দিতে হবে ইতিহাস-রস সৃষ্টি করে। তা যদি না হয় তাহলে তাঁর সাহিত্যে শিল্পগত কোনো মূল্য থাকে না। ইতিহাস এবং কল্পনাকে মিশিয়ে ঘটল বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক রোমান্সের সৃষ্টি। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তার সূত্রপাত। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে পাঠানদুহিতা আয়েষা এবং গড়মান্দারণ দুর্গের অধীশ্বর বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমার প্রেমের বর্ণময় চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। এর আগে প্রকাশিত ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'ও ঐতিহাসিক রোমান্স। কিন্তু তার সাফল্য এই মাত্রায় একেবারেই নয়। স্কটের 'আইভ্যান্হো' উপন্যাসের সঙ্গেও এর কিছু মিল আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর নিজের মতই, অন্য কারোর দীপ্তিতে উজ্জ্বল নন, এই উপন্যাস থেকেই সে কথা স্থির হয়ে গেল। এও ঠিক, যেসব চরিত্র লেখক এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন, সেখানে উপন্যাসের মত স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্টতা বা পরিণামকে সংবদ্ধ করার অবকাশ তিনি পাননি— রোমান্সে তা ঠিক করাও যায় না। তবে বিমলা চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবের স্পর্শ আছে। গজপতি-আশমানীর ছবি অবশ্য এই উপন্যাসে মানানসই হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি নয়, সংস্কৃত আদর্শ প্রভাবিত।

'দুর্গেশনন্দিনী'-র পরবর্তী রচনা 'কপালকুণ্ডলা'। উপন্যাস এবং রোমান্সের এ এক তুলনাহীন দ্বিবেণীসংগম। অরণ্যনিবিড় সমুদ্রের জনহীন পরিবেশে সঙ্গী-পরিত্যক্ত নবকুমারের সঙ্গে কাপালিক প্রতিপালিতা তরুণী কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ, নবকুমারের জীবন রক্ষা এবং বিবাহ—এই উপন্যাসের প্রথম পর্ব। স্বগ্রামে ফিরবার পরে এক বিচিত্র জটিল দাম্পত্যজীবনের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই দুজন। অরণ্যদুহিতা কপালকুণ্ডলা প্রতিদিনের পারিবারিক জীবন তথা দিনযাপনের মধ্যে দায়িত্ব বা মাধুর্য কোনোটাই খুঁজে পায়নি। ঘটনা জটিলতর হয় যখন নবকুমারের সঙ্গে তারই পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হয়। এসময় মুসলমান হয়ে যায় মতিবিবি। নবকুমারকে আবার পাবার আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা তার তখন প্রবল। অন্যদিকে কপালকুণ্ডলা তার নিজের মধ্যে শুনতে পায় অরণ্য-সমুদ্রের আহ্বান। একই সঙ্গে অদৃষ্ট-নিয়তির হাতছানি। সব মিলিয়ে শোকাবহ পরিণামের এক অসামান্য শিল্পিত রূপায়ণ। ঘটনার বুনন, চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা, বর্ণনারীতি— সব মিলিয়ে এ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের এক তুলনাহীন সৃষ্টি।

পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'-তে লেখকের শিল্পসিদ্ধির কিছুটা অবনতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান শক্তির হাতে বাঙালির পরাজয়ের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কথা উপস্থাপিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস, রোমান্স বা জীবন কোনোটিই এতে সুগ্রথিত হতে পারেনি। তবে পশুপতির কাহিনী— যেখানে মুসলমানশক্তির বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসবোধ তথ্যসম্মত।

'যুগলাঙ্গুরীয়' আসলে একটি বড় গল্প। গল্পের গ্রন্থন নৈপুণ্যে লেখক একেবারেই সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চরিত্রকে মর্যাদা দেয়, এখানে তার একান্ত অভাব।

'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' এবং 'সীতারাম' উপন্যাসে এই বিফলতা একেবারেই আড়ালে পড়ে গেছে। এই ত্রয়ী উপন্যাস শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—সাহিত্য নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই চিরকালের সম্পদ। বিশেষ করে প্রথম দুটি উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাশিম এবং ইংরেজবণিকের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিন্তু চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং শৈবলিনীর মত অনৈতিহাসিক সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তান্ত। শৈবলিনীর প্রাক্-বিবাহপর্বের ভালবাসা তার বিবাহিত জীবনের উপর কীভাবে দীর্ঘ ছায়া ফেলে তাকে প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন থেকে ভ্রষ্ট করেছে, চন্দ্রশেখরের ক্ষমা এবং প্রতাপের আত্মবিসর্জন কীভাবে তাকে দৃশ্যত আগের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এল— এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথাই বলেছেন। তাঁর নীতিশাসিত মন বাইরের দিক দিয়ে যে কথাই বলুক না কেন, তিনি যে শিল্পীও, শৈবলিনীর যন্ত্রণা এবং প্রতাপের আত্মত্যাগে সে কথাও প্রতিষ্ঠা পায়।

'রাজসিংহ'-কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একমাত্র যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'রাজসিংহ' ইতিহাস থেকেই গৃহীত। ঘটনাও ঐতিহাসিক। চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ এবং ঔরঙ্গজেবের বিরোধই এই উপন্যাসের কাহিনীর অবলম্বন। জেবউন্নিসা-মবারক এবং দরিয়াবিবির কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত না হলেও ইতিহাসের পটভূমিকা বা পরিবেশের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। এ কথা নির্মলকুমারী-ঔরঙ্গজেবের অনৈতিহাসিক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এতেও ইতিহাসের সামান্য প্রসঙ্গ এসেছে। তবে জোর পড়েছে বেশি লোকশ্রুতি বা কিংবদন্তীর ওপরেই। প্রবৃত্তিধর্ম একজন শক্তি, চরিত্র ও সম্ভাবনাময় পুরুষের কতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে, সীতারাম রায়ের জীবনকাহিনী সে কথাই উপস্থাপিত করেছে। শিল্পের থেকে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে—প্রচারধর্ম।

২. সামাজিক উপন্যাস, বড় গল্প ঃ ইতিহাস ও রোমান্স নির্ভর উপন্যাসের মত সামাজিক, পারিবারিক উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধি অবিসংবাদিত। এগুলির মধ্যে 'ইন্দিরা' এবং 'রাধারাণী' বড় গল্প (Novelette)। 'ইন্দিরা'-র গল্প বা গল্প বলার ভঙ্গিটি নতুন। 'রাধারাণী' প্রেমের গল্প কিন্তু শিল্পসিদ্ধির বিচারে তেমন উঁচু মাপের কিছু নয়। দুটি গল্পের নায়িকাই নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে প্রেমের সার্থকতায় পৌঁছেছে। একসময় এই গল্প দুটি পাঠকসমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের বাস্তব ছবি রয়েছে 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। বঙ্কিম প্রতিভার অসামান্যতা কোথায়, সে পরিচয়ও এখানে উপস্থাপিত। এ উপন্যাস ত্রয়ীতে রয়েছে বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু পারিবারিক সমস্যার তির্যক রূপায়ণ। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই উপন্যাস দুটি বক্তব্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে কিছুটা এক। প্রথম উপন্যাসে

নগেন্দ্রনাথ এবং সূর্যমুখীর যে দাম্পত্যজীবন, সেখানে অশান্তি বা অতৃপ্তির কোনো অবকাশ ছিল না। তা সত্ত্বেও কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকাঙক্ষা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে—যার ফল কুন্দের সঙ্গে বিবাহ, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং কুন্দনন্দিনীর মর্মান্তিক জীবনপরিণতি। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর আবার মিলন হয়েছে; কিন্তু মাঝখানে থেকে গিয়েছে এক অকালে ঝরে যাওয়া বালিকার দীর্ঘ ছায়া।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও দেখি গোবিন্দলাল ভ্রমরের তৃপ্ত দাম্পত্য জীবনবৃত্তের মধ্যে বিধবা রোহিণীর অতৃপ্ত জীবন আকাঙক্ষার গাঢ় ছাড়া কীভাবে তিনজনকেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপ-যৌবনের প্রতি তীব্র আকাঙক্ষাতেই ত্যাগ করেছেন প্রণয়িনী-পত্নী ভ্রমরকে। রূপতৃষ্ণা নিবৃত্ত হবার পর রোহিণীর কাছ থেকে অতিরিক্ত আর কিছু পাবার ছিল না। তার করুণ পরিণামে সেই কথাই আভাসিত। তবে বঙ্কিম যে একধরনের নৈতিক শুচিবাগীশের দৃষ্টিতেই এই পরিণতির দিকে তাঁর লেখনীকে প্ররোচিত করেছেন—একথাও শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতমকালের অনেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেন। 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনী বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী কারোর মৃত্যুই উপন্যাসের পক্ষে অনিবার্য ছিল না। সবটাই যেন আকস্মিকতাক্রান্ত। এমনকী গোবিন্দলালের সন্ন্যাস গ্রহণও। কিন্তু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিল্পসিদ্ধির দিক দিয়ে দেখলে 'রজনী'ও অত্যন্ত সফল উপন্যাস। একদিকে শচীন-রজনী, অন্যদিকে লবঙ্গ লতা এবং অমরনাথ উভয়ক্ষেত্রেই প্রেমের বিচিত্ররূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছে। এর কাহিনী অংশে লিটন-এর 'দি লাস্ট ডেজ্ অফ পম্পেয়াই'-এর ছায়াপাত ঘটলেও 'রজনী'র গঠন, লিখনশৈলীর নতুনত্ব এবং অমরনাথ-লবঙ্গলতার চরিত্রসৃষ্টি—এই উপন্যাসকে দিয়েছে এক অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা। সেই স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ইতিবাচক।

৩. তত্ত্ব ও দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস ঃ 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস দুটি এই বিভাজনের মধ্যে পড়ে। দুটি উপন্যাসই ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে রচিত এবং প্রকাশিত। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেশাত্মবোধ জাগরণের ক্ষেত্রে এই উপন্যাস অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। 'বন্দেমাতরম্' গান এই গ্রন্থেই সংযোজিত হয়েছিল। তবে গল্পের বুনন ত্রুটিপূর্ণ। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সব ত্রুটিকেই আড়াল করেছে এই উপন্যাসের দেশাত্মবোধ—যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙক্ষা ও আবেগকে দীর্ঘকাল প্রাণিত করেছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছেন গীতার নিষ্কাম ধর্মসাধনার ওপর। প্রফুল্লর মত একটি অতি সাধারণ স্বামীপরিত্যক্তা গৃহবধূ কেমনভাবে দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হ'ল—এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাই। এ কাহিনীতে সে সময়ের বাস্তব ছবিও গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে গল্পরসের আবেদন। তবে এ কথাও সমানভাবে সত্যি যে, প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত মানবী থাকেনি, পরিণত হয়েছে অবতারে। "বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যচেতনায় ঈশ্বরানুকূল আত্মসংযমই মানুষের পরমধর্ম, 'দেবী চৌধুরাণী'-তে তার পরিচয় প্রফুল্ল জীবনের পরিণামে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কথা—ড. ভূদেব চৌধুরী)। মোট কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রয়েছে এক বিপুল পরিসর ও বৈচিত্র্য সমন্বিত জীবন। ঘটনার বুনন এবং চরিত্রসৃষ্টি দুয়েতেই তিনি সিদ্ধকাম। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, পারিবারিক

সমস্যামূলক—প্রায় সমস্ত বিষয়ই এসেছে তাঁর উপন্যাসরচনার পরিধিতে। এই বিশালতা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত স্রষ্টার ক্ষেত্রেও অনারব্ধ ছিল। প্রচলিত সমাজনৈতিকতাকে মান্যতা দেওয়ায় তাঁর উপন্যাস নিয়ে কিছু বিতর্ক থেকেই গেছে। কিন্তু এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখবার মত, যে নাগরিক বা মফঃস্বল সমাজের মধ্যে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার উচ্চবিত্ত জীবনের নৈতিক মান খুব সমুন্নত কিছু ছিল না। বহু না হোক একাধিক বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যজীবনের বিচিত্রগ্লানি, কৌলীন্যপ্রথা সে সমাজের নিত্যচিত্র। কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির নাগরালি তো আছেই এইরকম এক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ঔপন্যাসিকই নয়, বাংলার নবজাগরণেরও উল্লেখ্য অগ্রণী নায়ক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র এক আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। সেই আদর্শের সঙ্গে মিশেছিল রোমান্টিকতার ধারণা। এ ব্যাপারে সমকালীন ফরাসি উপন্যাস নয়, ইংরেজি উপন্যাস, বিশেষ করে স্কট এবং ডিকেন্সই তাঁকে প্রাণিত করেছে সমধিক। যাই হোক, কিছু আদর্শগত এবং কালোচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যে বাংলা উপন্যাসের সীমানা এবং সম্ভাবনা বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে এতে সন্দেহ নেই।

14.3.2 রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত ঔপন্যাসিকদেরই একজন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য এই কৃতী বঙ্গ সন্তান নানা বিদ্যায় বিদ্বান হলেও বাংলা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রেরণায়। তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও সে কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা মোট ছয়। 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'—কমবেশি ইতিহাস বা ঐতিহাসিক পটভূমিকা-নির্ভর। শেষের দুটি তো বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সমকালীন বাঙালি জীবন নিয়ে দুটি কাহিনীও রচনা করেছিলেন তিনি। গ্রন্থ দুটির নাম—'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪)। প্রথম চারটি উপন্যাসে মুঘলযুগের একশো বছরের ইতিহাস পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এদের একত্রে শতবর্ষ বলা হয়।

'বঙ্গবিজেতা'-র কাহিনী আকবরের সময়কার বঙ্গদেশের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। প্রধান ভূমিকা টোডরমল্লের। রমেশচন্দ্র তাঁর সাধ্যমত ইতিহাসকে এখানে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে অনৈতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক প্রেম-প্রণয়ের অবকাশ। যদিও ইতিহাসের ভারই এখানে বেশি।

'মাধবীকঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র কিছুটা ভিন্ন পথের পথিক। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং জীবন অনৈতিহাসিক। নরেন্দ্র, হেমলতা এবং প্রতিনায়ক শ্রীশচন্দ্রের ত্রিভুজ প্রণয়ের বিচিত্র আবর্তই এ উপন্যাসের অবলম্বন। মুঘলসম্রাট শাজাহানের শেষ জীবনে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিচিত্র রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা, আবর্তের সৃষ্টি হয়, নায়ক নরেন্দ্র ঘর ছেড়ে বার হয়ে সেই আবর্তেই জড়িয়ে যায়। সমকালীন ইতিহাস তার জীবনের বেদনাদায়ক পরিণামের সঙ্গে যেন অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে। কিন্তু এও বিশেষ করে দেখবার যে 'বঙ্গবিজেতা' এবং 'মাধবীকঙ্কণ'—দুটি উপন্যাসের একটিতেও রমেশচন্দ্র ইতিহাস, জীবন এবং সৃজনী কল্পনাশক্তিকে ঠিকভাবে সমন্বিত করতে পারেননি, যেমনটা বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্যভাবে পেরেছিলেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে।

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এর মূল কাহিনী ইতিহাস থেকেই নেওয়া। কল্পিত কাহিনী এখানে ইতিহাসের বিশুদ্ধতাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে ইতিহাসের ঘটনাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাট কাল্পনিক চরিত্রকে অবলম্বন করে যেভাবে প্রেম-প্রণয়ের জটিলতার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে জীবন এবং ইতিহাস খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে বলে মনে হয়। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' শিবাজীর জীবনের বিচিত্র ঘটনা এবং সেই সঙ্গে মধ্যযুগের পরিমণ্ডলে জাতীয় ভাব উদ্দীপনে এক অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল প্রয়াস। ইতিহাসের নিজস্ব তথ্য বা সত্যধর্মিতার পাশে মানুষ শিবাজীর প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেই মানুষের ছবি তেমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। এসেছে শিবাজীর অন্তরঙ্গ পরিকর রঘুনাথ এবং তার প্রণয়িনী সরযূর রোমান্টিক জীবনকথাও। কিন্তু ইতিহাসকে বলার তাগিদে সে প্রসঙ্গও তেমনভাবে বিকশিত হতে পারেনি।

অতঃপর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'। এখানে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত-শক্তির অবসানের কথা। এখানে লেখকের সব ঝোঁকটুকু ইতিহাসের ওপরেই। প্রতিদিনের চেনা মানবজীবনের কথা তেমন নেই। আছে ইতিহাসের বীর চরিত্রদের প্রসঙ্গই। সেই সঙ্গে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর রোমান্টিক প্রণয়কথা। তেজসিংহ কিন্তু কাল্পনিক চরিত্র নয়। সেও ইতিহাসের অংশ। তবুও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তার ব্যক্তিজীবন তেমন স্পষ্ট হয়নি।

ইতিহাসকে তার বিচিত্ররূপ বা ঘটনাতেই ধরবার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন রমেশচন্দ্র। পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের সীমানাও তার ফলে যে প্রসারিত হয়েছে এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অসম্পূর্ণ, অসফল থেকে গেছেন মানবজীবন রহস্যের উদ্ঘাটনে, ইতিহাসের শরীরে জীবনের স্পন্দন সঞ্চারে। সংক্ষেপে, ইতিহাস এবং জীবনকে তিনি একরেখায় মিলিয়ে দিতে পারেননি। রমেশচন্দ্র এব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না। আর সেইজন্যই তাঁর উপন্যাসের শিল্পকলাও হয়েছে দুর্বল।

রমেশচন্দ্রের দুটি রচনা 'সমাজ' ও 'সংসার' সামাজিক উপন্যাস নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, এ হ'ল সমাজচিত্র। সেকালের সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের পরিচয় এই আখ্যান দুটিতে রয়েছে। 'সংসার'-এ প্রাধান্য পেয়েছে সেকালের কৃষক জীবন। তাদের আবেদন ছবি হিসেবেই। জীবন ও ব্যক্তিচরিত্রের সজীবতার জন্য নয়।

'সমাজ'-এ পটভূমিকা হিসেবে গ্রাম এবং শহর দুই-ই রয়েছে। এ হ'ল অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনকথা। বিধবাবিবাহকে দ্বিধাহীন অন্তরে সমর্থন করেছেন রমেশচন্দ্র। কিন্তু একথাও বিশেষভাবে বলবার যে, চরিত্রগুলি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যাই হোক, আলোচ্য আখ্যান দুটিতে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশেষ সিদ্ধি অর্জন না করলেও গ্রামবাংলার জীবনকে রমেশচন্দ্র যেভাবে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকবে।

14.3.3 তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অসাধারণ শিল্পসিদ্ধি সত্ত্বেও বাঙালি পাঠকের একটা ব্যাপারে অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনায় আমাদের প্রতিদিনকার জীবন সাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সেই আকাঙক্ষার কিছুটা পূরণ হয়েছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে।

'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশিষ্ট। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় রচনাটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে লেখক তারকনাথের নাম ছিল না, ছিল শুধু এইটুকু উল্লেখ—

'শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত'। তিনভাবে এর আকর্ষণ-সূত্র শিথিল গ্রন্থনে পরস্পরযুক্ত হয়েছে। যেমন, পারিবারিক জীবনে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, পথিকজীবনের নানান আকস্মিকতা এবং উদ্ভট অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, অনুকূল দৈব-সংঘটনের সাহায্যে পাপের শাস্তি এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখলে একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে নীতিবোধ ও রোমান্স—দুয়েরই মিশ্রণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তারকনাথের বিরূপতা ছিল, এবং সে বিরূপতা তিনি গোপন করতে পারেননি। অথচ রোমান্স-সুলভ আকস্মিক যোগাযোগ বা নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশের যে অভিযোগ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তুলেছিলেন, তাঁর নিজের রচনাতে প্রয়োজনমত তা অনায়াসেই স্থান করে নিয়েছে। গোপাল এবং স্বর্ণলতার যে পরিচয়, তা নিতান্তই আকস্মিক। এরপর তাদের অনুরাগ, শশাঙ্কের স্বর্ণলতাকে একরকম জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা এবং তার ঘরে হঠাৎ আগুন লোগ যাওয়ায় তার নিষ্কৃতি, শশিভূষণের অবস্থা বিপর্যয়—সবই কার্যত রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। সবচেয়ে বড় কথা, উপন্যাসের নামকরণ স্বর্ণলতার নামে, অথচ কাহিনী বা ঘটনাপ্রবাহে তার ভূমিকা নামমাত্র। উপন্যাসে সরলারই প্রাধান্য, কাহিনীর নাট্যরূপ 'সরলা'য় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সে যাই হোক, যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এ উপন্যাস দীর্ঘকাল পরেও ঐতিহাসিক মর্যাদায় সম্মানিত হয়েছে, তা হ'ল প্রতিদিনকার জীবনের উপস্থাপন। বঙ্কিমসাহিত্যে পাঠক লক্ষ্য করেছিল শিল্পের ঐশ্বর্য, আর 'স্বর্ণলতা'য় চেনা জীবনের ছবি।

সত্যরক্ষার খাতিরে একথাও বলতে হবে যে, জনপ্রিয়তা পেলেও তারকনাথের উপন্যাস শিল্পগুণের বিচারে সার্থক নয়, তা প্রতিদিনের পাঁচালি মাত্র। চরিত্রগুলি একরঙা, টাইপ ধরনের। একই চরিত্রের মধ্যে বিচিত্রের বর্ণালী এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এগুলি হয় শুধু ভাল অথবা কেবল মন্দ। সবশেষে রয়েছে পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়। যা নেই তা হ'ল—জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধের অভাব। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাশে তাঁর রচনা অত্যন্ত ম্লান বলেই মনে হবে। 'স্বর্ণলতা'র নীলকমল চরিত্রটিই একমাত্র তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টি ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

14.3.4 যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)

বঙ্কিমযুগের আরও একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। প্রধানত সমাজসংস্কারকের মন নিয়েই তিনি ব্যঙ্গরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই মনেরই প্রতিফলন রয়েছে তাঁর 'মডেল ভগিনী' 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'কালাচাঁদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নামাঙ্কিত রচনাগুলিতে। মতামতের দিক দিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র পুরোপুরি রক্ষণশীল এবং অবশ্যই অনুদার, পরমতঅসহিষ্ণু। শিক্ষিত নারীসমাজকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। অশোভনভাবে আক্রমণ করেছেন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মপরিবার এবং ব্রাহ্মমেয়েদের। 'মডেল ভগিনী' বা 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর মত উপন্যাসে কাহিনী এবং চরিত্র আছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতায় উপন্যাসের লক্ষণ বহুক্ষেত্রেই নষ্ট হয়েছে। "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী"র আয়তন বিপুল। পাঠক-পাঠিকার পক্ষে এই বিপুলায়তন উপন্যাসে মনোযোগ রক্ষা করা প্রকৃতই কঠিন।

14.3.5 ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব নানাদিক দিয়েই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাহিত্যে তিনি যে গোত্রীয় রসের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আগে বা পরে তা ঠিক অনুসৃত হয়নি। ব্যঙ্গের সঙ্গে অদ্ভুত রসের জোগান মিলে গিয়ে

যে উদ্ভটরসের সৃষ্টি হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে, তার সমজাতীয় রচনার নিদর্শন কিছু নেই। আংশিকভাবে এর কিছু পরিচয় বাঙালি পাঠক পেয়েছেন পরবর্তীকালের পরশুরাম এবং সুকুমার রায়ের রচনায়।

উপন্যাসের আকারে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'কঙ্কাবতী', 'সেকালের কথা', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ময়না কোথায়' এবং 'পাপের পরিণাম'। এই উপন্যাসগুলি ঘটনাধর্মী অর্থাৎ রোমান্স নির্ভর এবং উদ্দেশ্যমূলক। উপন্যাস হিসেবে এগুলি খুব সার্থকও কিছু নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম 'ফোকলা দিগম্বর', যেহেতু এটি প্রণয়মূলক। 'ময়না কোথায়' এবং 'পাপের পরিণাম' উপন্যাস দুটিতে লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা এবং তীব্র নীতিবোধ এর শিল্পগুণ নষ্টের কারণ হয়েছে। তবে একথাও বিশেষভাবে বলবার যে, বঙ্কিমযুগের লেখক হয়েও তাঁর রচনায় সেই অর্থে বঙ্কিমের কোনো প্রভাব নেই। বরং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের কিছু প্রভাব দেখবার মত।

'কঙ্কাবতী' আমাদের সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। এখানে রূপকথার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাসের, আর তা উপস্থাপিত হয়েছে ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে। পনেরোটি পরিচ্ছেদযুক্ত প্রথমভাগ এবং 'পরিশেষ' নামের শেষ পরিচ্ছেদটি নিয়ে মূল কঙ্কাবতীকাহিনীর বিস্তার। উনিশ পরিচ্ছেদ বিভক্ত দ্বিতীয়ভাগটিতে সকলের উপযোগী রূপকথার কাহিনী অসাধারণ ব্যঙ্গরচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে এ বই দুর্বল। কিন্তু দ্বিতীয়ভাগে যে অলৌকিক স্বপ্নজগতের সৃষ্টি করা হয়েছে তার আকর্ষণও অপ্রতিরোধ্য। অনেক সমালোচকই মনে করেন যে, স্নিগ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানেই বাঙলা শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল।

14.3.6 স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক। বিংশ শতাব্দীতেও তাঁর মত নারীপ্রতিভার পরিচয় বিরল। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান প্রায় সমস্ত বিষয়ে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৬০), 'কাহাকে (১৮৯৮) এবং 'স্নেহলতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বিষয়বস্তু, রচনারীতি এবং শিল্পকৌশল বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এর মধ্যে 'স্নেহলতা' উপন্যাসটিতে তাঁর সমাজচিন্তারও পরিচয় রয়েছে। নারী হলেও লিখনরীতিতে স্বর্ণকুমারী পুরুষালি ছাঁদ অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ঠাকুরবাড়ীর অধিকাংশ গদ্যরচনায়, বিশেষতঃ আখ্যান-আখ্যায়িকায় ঠিক যেন প্রতিদিনের বাংলার ছবিটি ফুটিতে পারে নাই। ইঁহারা একটি বিশেষ নীতি ও ধর্মের পরিমণ্ডলে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় ক্ষমতা সত্ত্বেও ইঁহাদের ভাষাভঙ্গিমা, বর্ণিত বিষয়; চরিত্র প্রভৃতিতে কিছু কৃত্রিমতা, কিছু দূরাগত অস্পষ্টতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী, সাধারণ নরনারী, বিশেষতঃ শহরের নারীসমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁহার উপন্যাস খুব মহৎ শিল্প না হইলেও সহজ সরল বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে সুখপাঠ্য হইয়াছে।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাস, রোমান্স, ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্স, পারিবারিক বা সমাজসমস্যামূলক গল্পকথা এবং ব্যঙ্গাত্মক গল্পকাহিনী উপন্যাসের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বাঙালি বৃহৎ পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে এই সময়েই। সময়সীমাও বেড়ে গেছে অনেক

দূর। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে চলে এল ইতিহাস, কখনও বা অকৃত্রিম দেশপ্রেমের উত্তেজনা। এর পাশে ক্ষীণস্রোতা নদীর মত বয়ে চলল আমাদের প্রতিদিনের জীবনকথা। শেষ পর্যন্ত এই জীবনকথাই চলে এল সবকিছুর কেন্দ্রে। কি রোমান্স, কি ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী—সর্বত্রই তার অবারিত বিস্তার। বিংশ শতাব্দীর যাত্রাই শুরু হ'ল এই চেনা জীবনকথা নিয়ে। প্রস্তুতিপর্বের স্মারক হয়ে রইল এই সমস্ত রচনা।

14.4 সারাংশ

বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের অন্যতম একজন স্থপতি হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-নক্‌শা রচনার পথিকৃৎ হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতেই উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাসের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সংস্কৃত ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ দুই-ই বাঙালির সামনে ছিল। সেইসঙ্গে ছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে গড়ে-ওঠা এক নতুন পরিস্থিতি। নতুনতর জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনবীক্ষা। এরই ঠিক পূর্ববর্তী স্তরে ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-নক্‌শা। সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা সমস্ত ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত এবং ব্যাপক করেছে।

নক্‌শা হিসেবে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন 'হুতোম' তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র অনেক আগেই বার হয়েছে। কথ্যচলিত ভাষায় সেকালের সমাজজীবনের চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন তিনি। এরও আগে প্রকাশিত হয়েছে হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। এটি আসলে খ্রিস্টধর্মেরই মহিমা প্রচারের জন্য রচিত।

ঐতিহাসিক রোমান্স বঙ্কিমচন্দ্রের আগে রচনা করেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই অবশ্য তার সার্থকতম রূপ দেন। তিনি শুধু ঐতিহাসিক রোমান্স নন, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাস রচনাতেও অসামান্য সিদ্ধি অর্জন করেছেন। বাংলা উপন্যাসের যথার্থ জয়যাত্রা তাঁর উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করেই। রমেশচন্দ্র দত্তও ঐতিহাসিক রোমান্স, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা এতটা সিদ্ধি অর্জন করেনি।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী সীমিত পরিসরে হলেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

14.5 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

   (ক) কোন্ কোন্ রচনার জন্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির গুরুত্ব কী জন্য?

   (খ) প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে হুতোমের রচনার সাদৃশ্য কোথায়?

   (গ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিচয় দিন।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের পরিচয় দিন।

(খ) 'বঙ্গবিজেতা' অথবা 'মাধবীকঙ্কণ'-এর বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(গ) 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের গুরুত্ব কোথায়?

3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

(ক) নক্‌শা রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ তথা হুতোম পেঁচার সাহিত্যিক সাফল্য কোথায় তা আলোচনা করুন।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও রোমান্স-আশ্রিত উপন্যাসগুলির একটি বিবরণ দিন।

(গ) রমেশচন্দ্র দত্তের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

14.6 গ্রন্থপঞ্জি

1. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
2. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (আধুনিক যুগ)—ড. ভূদেব চৌধুরী।
5. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
6. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
7. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড)—ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।
8. বঙ্কিম সরণী—প্রথমনাথ বিশী।
9. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত।
10. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

একক 15 ❑ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

15.0 উদ্দেশ্য
15.1 প্রস্তাবনা
15.2 রবীন্দ্রনাথের কাব্য
15.2.1 সূচনা পর্ব
15.2.2 উন্মেষ পর্ব
15.2.3 ঐশ্বর্য পর্ব
15.2.4 অন্তর্বর্তী পর্ব
15.2.5 গীতাঞ্জলি পর্ব
15.2.6 বলাকা পর্ব
15.2.7 অন্ত্য পর্ব
15.3 নাট্য সাহিত্য
15.4 ছোটগল্প
15.5 উপন্যাস
15.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ
15.7 সারাংশ
15.8 অনুশীলনী
15.9 গ্রন্থপঞ্জি

15.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল :

- রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য-কবিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির শ্রেণীবিভাজন এবং বিভাজনগুলির পরিচয়
- ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব
- ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা
- রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

15.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ বলে বিশেষিত করা হয়েছে। একথাও সমানভাবে সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশক থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ বাংলার সারস্বত সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে।

কাব্য, নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় এই সময়ে তিনি অসামান্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে এই যুগ-নামকরণের সার্থকতা। একথা আজ অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে বাংলার গৃহকোণ থেকে মুক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেছেন বিশ্বজনের কাছে। ভিক্ষুকের রূপে নয়, রাজবেশে। প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বিশ্বভাষা হিসেবে। বাঙালির পক্ষে এ ঋণ অপরিশোধ্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচয় সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে বিন্যস্ত হয়েছে।

সেই বিন্যাসের মধ্যে আছে কাব্য-কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং রচনা বা প্রবন্ধের বিচিত্র দিকে তাঁর প্রতিভা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, সিদ্ধি অর্জন করেছে, তার বিবরণ।

15.2 রবীন্দ্রনাথের কাব্য

বারো বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে চেতনালুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যরচনা করেছেন তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে কোনো দেশে একজন কবিমাত্রের মধ্যে সৃষ্টির এই বিপুল ঐশ্বর্য ও লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। জার্মান মহাকবি গ্যেটের সঙ্গে তাঁর নিজের বিপুল প্রাণশক্তির প্রবর্তনাতে বিভিন্ন ভাবগত স্তর ও প্রকাশভঙ্গির পথরেখা অতিক্রম করেই অসামান্য সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

15.2.1 সূচনা পর্ব

বিভিন্ন স্তর পরম্পরার ভিত্তিতে কবির কাব্যসাধনাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। তাঁর কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত যে সমস্ত কবিতা বা কাব্য তিনি রচনা করেছেন তাকে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের শৈশব পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) কাব্য। এ ছাড়া 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)-র মত গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যও ছিল। 'শৈশব সঙ্গীত' ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হলেও আগে লেখা অনেক কবিতাই এতে স্থান পেয়েছিল। আবেগ এবং উচ্ছ্বাসই এর সম্বল। তবে কয়েকটি কবিতার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। মহাকবি নিজেও বলেছেন যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই এর যা কিছু মুল্য। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও বিশেষভাবে বলবার যে মধুকবির 'আত্মবিলাপ' থেকে কবিতায় কবির একেবারে নিজের কথা বলবার যে ধারার সূচনা হয়েছিল, বিহারীলালের কবিতায় যা আমরা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের কাব্যকবিতা সেই ব্যক্তিচেতনার রসেই বিশেষভাবে জারিত। যদিও সঠিক স্বাতন্ত্র্য তিনি এখনও খুঁজে পাননি। নিজের চারদিকে তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন রোমান্টিক আবেগের এক কুয়াশা ঘেরা পরিমণ্ডল। ১৮৭৮-এ প্রাচীন বৈষ্ণব কবির ঢঙে বৈষ্ণব পদাবলির প্রচলিত শিথিল স্তবক বিন্যাসে লিখলেন, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ইংরেজ কিশোর কবি চ্যাটারটনের মত তিনি এদেশের কিছু মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কবির নিজত্ব বলতে যা বোঝায় তা এতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু একথাও বিশেষভাবে স্বীকার করবার যে স্বাতন্ত্র্যের আভাস এতে অবশ্যই আছে। আছে বলেই কবি তাঁর কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা' থেকে একে বাদ দেননি।

15.2.2 উন্মেষ পর্ব

আত্মপরিচয়ের প্রথম সুরটি পাওয়া গেল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) কাব্যে। এরপর চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগুলি হল : 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। এই পর্বই উন্মেষ পর্ব। এখানেই প্রথম প্রকাশ পেল তাঁর যথার্থ নিজত্ব। এ যেন এক নতুন জন্ম। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাতসঙ্গীত' কবিজীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই কাব্যে বিষণ্ণ কবির অন্তর্বেদনাই প্রবল—কবি প্রকৃতই যেন নিঃসঙ্গ। অথচ এই রোমান্টিক দুঃখবিলাস কবিধর্ম নয়। সেই জগৎ-প্রীতির উচ্ছ্বাসই অতঃপর ধ্বনিত হল 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মত কবিতা এই প্রেক্ষিতেই প্রতীকের ভূমিকা পালন করেছে। 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কবি বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়েই বলে উঠলেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

'ছবি ও গান'-এও প্রতিদিনের মর্ত্যপ্রীতির অনিঃশেষ স্বাক্ষর, যদিও প্রকাশ-সৌন্দর্যে তা ততটা সমুজ্জ্বল নয়। জগতের মধ্যে তাঁর প্রবেশ তখনও অবারিত নয়। ছবি এখানে অস্পষ্ট। গানও অস্ফুট। 'কড়ি ও কোমল'—এই সেই স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয়েছে। উন্মেষ পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা এই কাব্যই। শরীরের জন্য আকাঙ্ক্ষা এ কাব্যে রীতিমত তীব্র, যদিও সেই তীব্রতার মধ্যেই যে স্থায়ী স্বস্তি তথা মুক্তি—রবীন্দ্রের কবিজীবনে সে কথাও সত্যি নয়। তাঁর বারবার বড় পীড়াদায়ক ভাবেই মনে হয়েছে যে অসীমের লীলাভূমি থেকে তিনি হঠাৎ নেমে এসেছেন সীমাবদ্ধ বস্তুজগতের মধ্যে। সূচনা হল মুক্তির আনন্দের। এই পর্বই তাঁর কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব। সমালোচকরা এই পর্বকেই চিহ্নিত করেছেন—'ঐশ্বর্য পর্ব' হিসেবে।

15.2.3 ঐশ্বর্য পর্ব

এই পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩) এবং 'চিত্রা'য় (১৮৯৬) রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা অসাধারণ সমুন্নতি লাভ করেছে। এই ছয় বছরের কাব্যের যে ফসল তা নানাদিক দিয়েই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। যাই হোক, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে সীমার বন্ধন এবং বস্তুসর্বস্বতার মধ্যে কবির যে বেদনা পাঠক প্রত্যক্ষ করেছেন সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব 'মানসী'-র মধ্যেও বর্তমান। বাসনাকে কবি প্রেমের থেকে পৃথকভাবেই দেখেছেন। কবির বিশ্বাসের জগতে বাসনার উত্তাপ এবং প্রেম সমার্থক বিষয় নয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর দেহবোধ থেকে সরে এসে 'মানসী'র কবি লিখলেন, 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাই ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা', সেই সঙ্গে অসীমের সীমা রচনার অঙ্গীকারও। 'মানসী'তে এসেছে বিচিত্র প্রসঙ্গ। কখনও কবি বার হয়েছেন মানসজগতের অভিসারে, কখনও বা বহুবিচিত্রের মধ্যে সংহত করার চেষ্টা করেছেন, প্রেমচেতনাকে কখনও বা এসেছে সমকালীন জীবনের না-বাচক দিকের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনার মনোভাব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে কবির নানান খেয়াল।

এই সময় কবি পদ্মার সাহচর্যে লালিত। প্রকৃতির যে অপূর্ব মাধুর্যে তিনি এখানে প্রতিনিয়ত স্নিগ্ধ, উজ্জীবিত হচ্ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল 'সোনার তরী' কাব্যে। প্রকৃতি জড় কিছু নয়, তা মানুষের জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম। প্রেমেরও নতুন আইডিয়া এই কাব্যে আরও সমৃদ্ধভাবে প্রকাশ পেল। এ রূপই

আলাদা। মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা তত্ত্বের যথার্থ সূত্রপাতও এইখানে। প্রকৃতির সঙ্গে জীবলোকের অচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুভবও তিনি প্রকাশ করেছেন। 'ছিন্নপত্র'-এর একটি পত্রে আছে, 'আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যকাল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।' জীবনের সমগ্রতা তথা পূর্ণতার উপলব্ধিতে প্রাণিত কবিহৃদয় মানবজীবনের দৃশ্যমান খণ্ড বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বৃহত্তর অখণ্ড প্রাণলীলার বিশ্বাসে পৌঁছেছে, 'সোনার তরী' এবং তারপর প্রকাশিত 'চিত্রা' কাব্যের কবিতায় সেই বিশ্বাস আর অনুভবের উপলব্ধিই সঞ্চিত হয়েছে। জীবন এবং প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথাও এই বোধ, বিশ্বাস আর অনুভবের অন্তর্গত।

'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টি, আমাদের সাহিত্যে তো বটেই বিশ্বসাহিত্যের সামগ্রিক মানদণ্ডেও। এতে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব (লক্ষণীয় : চিত্রা, জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, সিন্ধুপারে), প্রেম ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্যতার অনুভব (প্রেমের অভিষেক), অনন্ত সৌন্দর্যের বন্দনা (উর্বশী, বিজয়িনী) প্রভৃতি বিষয়ে মহাকবির পরিণত মন, শান্তস্নিগ্ধ ভাবঘন আবেশ, নিপুণ বাক্‌ভঙ্গি এবং সৌন্দর্যচেতনা দিয়েছে এক অপূর্ব সিদ্ধির মাত্রা। 'চিত্রা' কাব্যের প্রথম কবিতাতেই রয়েছে এই সৌন্দর্যের স্তবগান :

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিচ ফুল কাননে,
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।'

ভিতরের দিকে ফিরলে দেখা যাবে এই সৌন্দর্যই আবার—

'অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।'

এই ভিতর বাহিরের সম্পর্ক পূর্ণ হয়ে উঠল অপূর্ব কাব্যরসে। কবি উপলব্ধি করতে পারলেন, অন্তরাল থেকে কে যেন তাঁর জীবন ও জীবনাতীত অস্তিত্ব ও চেতনাকে আলো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ইনিই 'জীবনদেবতা'। একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে 'চৈতালি'। রবীন্দ্র কাব্যসাধনার একযুগের ইতিহাস যেন এখানে এসে সমাপ্ত হল। সাহিত্যের সমালোচক ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার মন্তব্য করেছেন এই মর্মে যে, 'পরিপূর্ণ জীবনের আনম্র ঐশ্বর্য, খণ্ড প্রত্যহকে অখণ্ড অন্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তুলিবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষে মানস পরিক্রমা—সর্বোপরি গাঢ়বদ্ধ সনেট রচনায় এই কাব্যখানি এই পর্বের শেষ ফসল। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চৈতালি'—চৈত্র মাসে সংগৃহীত বৎসরের শেষ ফসল। ইহার পর তাঁহার মন প্রাচীন ভারত, কল্পজগৎ ও বিশাল সৌন্দর্যলোকের মধ্যে আর একপ্রকার মুক্তি পাইল।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)।

15.2.4 অন্তর্বর্তী পর্ব

রোমান্টিকতা, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনের আকুতি, জীবনদেবতার লীলাময়তার অপরূপ অনুভব, প্রেমভাবনার উন্নয়নে স্বাতন্ত্র্যসমৃদ্ধ 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পর্বের কাব্য-কবিতা এবং 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'র

আধ্যাত্মিকতাভাবসমৃদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০) এবং 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যগুলিকে অন্তর্বর্তী পর্বের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কথা' ও 'কাহিনী'তে কবির মানসপরিক্রমা প্রাচীন ভারতবর্ষে। কবি সেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার তথা নিজের পুরনো গৌরববোধের স্মারক। 'কল্পনা'র একদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপকে আবিষ্কারের ঐকান্তিক আগ্রহ, অন্যদিকে আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবনের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ঘোষণা প্রত্যয়দৃপ্ত পৌরুষকে দিল নতুন রূপ। 'ক্ষণিকা'র মধ্যে ছন্দ ও বাক্‌বিন্যাসের লঘুচপল ভঙ্গিতে কবি আশ্চর্যভাবে রূপ দিলেন 'ক্ষণশাশ্বতী'-র বন্দনা। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতিতে কবির এ এক অপরূপ মানসমুক্তি। ক্ষণিকের মধ্যেই অনন্তকে পাবার গূঢ় বাসনা তাঁর। যদিও শেষ পর্যন্ত সব কিছুই যেন তাঁকে সেই পরমের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যাঁকে সমস্ত 'গীতাঞ্জলি' পর্ব জুড়েই তিনি খুঁজেছেন।

'নৈবেদ্য' (১৯০২), 'স্মরণ' (১৯০২-৩), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ (১৯১৪) সালে কাব্যাকারে প্রকাশিত) এবং 'খেয়া' (১৯১০)-র মত কাব্যও এই পর্বের ফসল। এর মধ্যে 'নৈবেদ্য' কাব্যের অধিকাংশই সনেট এবং স্তবকবন্ধে রচিত কিছু গান। 'কল্পনা'য় কবির সীমানা ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষ, 'নৈবেদ্য'-য় তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন আধুনিক দেশকালের বিপুল পরিসরে। মহৎ মনুষ্যধর্ম এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের মানবতা, বীরত্ব, ত্যাগ ও ক্ষমার পবিত্র ক্ষেত্রে পরিত্রাণের ছবি এঁকেছেন কবি। জীবনে এ এক অদ্ভুত মরুময়তার অবস্থা কবির। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা হারিয়ে কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিচিত্র কাজে নিজেকে সমর্পণ করে সব কিছু যেন বিস্মৃত হতে চেয়েছেন। নিজের শিশুসন্তানগুলিকে ভোলানোর জন্য লিখলেন 'শিশু'। শিশুরই রূপকথানির্ভর রোমান্টিক কল্পনাকে এইরকম অসামান্যতায় ফুটিয়ে তুলতে জগতের খুব কম কবিই পেরেছেন।

এই পর্বের শেষ কাব্য হল 'খেয়া'। নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষয়ক্ষতির ঝড় অন্যদিকে দেশ জুড়ে বঙ্গভঙ্গের আলোড়ন— সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ। এ পথ তো কবির নয়। তাই তাঁকে বলতেই হয়েছে :

> বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
> কাজের পথে আমি তো আর নাই।

এই প্রেক্ষিতেই কবি পেলেন আর এক জগতের সন্ধান। সে জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র। রূপ ও অরূপ—এই দুয়ের মধ্যে 'খেয়া'র জগৎ। খেয়া-নৌকা যেমন একপ্রান্ত ছেড়ে আর একপ্রান্ত পাড়ি দেয় কবিও তেমনি প্রেম সৌন্দর্যের তীরভূমি থেকে যাত্রা শুরু করেছেন অধ্যাত্মভাবনার জ্যোতির্লোকে।

15.2.5 গীতাঞ্জলি পর্ব

এই পর্বে আধ্যাত্মিক অনুভবের জগতে কবি পেলেন এক অ-পূর্ব মুক্তির স্বাদ। শুরু হয়েছিল আগেই। 'নৈবেদ্য'-র প্রথম কবিতাতেই ছিল :

> প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
> করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
> দাঁড়াব তোমাবি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)-তে এই অনুভব গীতিমাধুর্যে মুখরিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় বিরল বিপ্রলম্ভই এর মূলভাব। সব অহংবোধ দূরে সরিয়ে কবি ঝড়ের রাতে বার হন অভিসারে, সে অভিসার পরাণসখার প্রতি। এ অধ্যাত্মঅনুভব নিছক নীতি বা ধর্মসাধনা— কোনোটাই নয়। অনুভবের বিচিত্র ধারাপথ অতিক্রম করেই 'গীতাঞ্জলি'র বৃহত্তম অনুভবের জগতে পৌঁছনো।

'গীতালি' (১৯১৫) প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব বা অধ্যাত্মসাধনা কোনোটাই নয়—এ হল গীতিসংগ্রহ। কবির দেবতার সাজ পরম প্রেমিকের। উপলব্ধির গাঢ়তায় 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) এবং 'গীতালি' আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। জীবনকে ভালবেসেই কবি বলেছেন—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।

শেষ পর্যন্ত তা জীবনেরই গান হয়ে দাঁড়ায়।

15.2.6 বলাকা পর্ব

'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) এবং 'মহুয়া'—পঞ্চম পর্বের এই কাব্যগুলিতে কবিমানসের আবার দিক পরিবর্তন ঘটল। প্রৌঢ় ঋজুর ফসল হিসেবে এখানে পেয়েছি বুদ্ধির বিস্ময়কর দীপ্তি এবং জগৎ সম্বন্ধে বিশালতার বোধ। প্রেম, সৌন্দর্যআকাঙ্ক্ষার জগৎ থেকে গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য-এর ভক্তির জগতে পৌঁছনো। সেখান থেকে কবি যেন হঠাৎই এসে পৌঁছলেন 'বলাকা'র জগতে। সমকালীন ফরাসি দার্শনিক আঁরি বার্গসঁ-র সৃষ্টিশীল গতির ভাবনা কবিকে নতুনভাবে প্রাণিত করে থাকবে। উদ্দাম গতিবেগের স্বীকৃতির সঙ্গে দেখা যায় কাব্যের শেষে কবির আস্তিক্যবাদী মন বিদ্রোহী হয়েছে। পৃথিবীর কিছুই স্থিতিশীল নয়, শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকবে না— কবি এই কথা মেনে নিতে পারেননি। গতি ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে জীবন পূর্ণতর সত্যের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করছে, এই বিশ্বাসেই কবি উপসংহার টেনেছেন। ভাষা ও ছন্দের অভিনবত্বও দেখবার। এ ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল চরণবিন্যাসের অসমতা।

'বলাকা' ও 'পূরবী'র মধ্যপর্বে প্রকাশিত হয় 'পলাতকা'। কবি এখানে তাঁর জীবনপ্রীতির কথা অপূর্ব সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। 'পূরবী'তে সৌন্দর্যবোধ এবং ফেলে আসা যৌবনের স্মৃতিচারণার সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের মূর্ছনা গীতিকবিতার রসে জারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

'মহুয়া'র লক্ষ করেছি দ্বিতীয় যৌবনের রক্তরাগ। এখানে যে প্রেমকে আমরা পাই তা বীরত্বে, মহৎ কর্তব্যবোধে, বৈশ্বিক চেতনা ও গতির আলোয় সমুজ্জ্বল।

15.2.7 অন্ত্যপর্ব

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মহুয়া'—প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৮৮২-১৯২৯) কবির কাব্য-কবিতায় যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে একটা জিনিসই বলবার। সেটি হল, আঙ্গিক বিষয়বস্তু কোনোটাতেই পুরনো পদ্ধতি-প্রকরণ ছেড়ে কবি বেশিদূর অগ্রসর হননি। ১৯৩১-এ প্রকাশিত 'বনবাণী' সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্ব যথার্থ শুরু হয়েছে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) থেকে। 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—এই চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫) এবং 'পত্রপুট' (১৯৩৬) নামাঙ্কিত আরও চারটি কাব্য। এই কাব্যগুলিকে একত্রে 'পুনশ্চ' পর্বের ও বর্গের কাব্য বলা সঙ্গত। এর আগে 'বলাকা'য় প্রবহমান ছন্দ রচনায় কবি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবারও ভাষা ও ছন্দরীতিতে পাঠক প্রত্যক্ষ করল আর এক পরিবর্তন। 'পুনশ্চ' থেকেই গদ্যকবিতার সূচনা এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্যছন্দেই রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রকাশের বাহন। প্রতিদিনের কথাকে কবি এইসব কাব্যে আনতে চেষ্টা করেছিলেন আটপৌরে ভাষায়। সে কাজ অবশ্য লঘুছন্দে তিনি পালন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

'পুনশ্চ' বর্গ বা পর্বের পর লঘুতরল হাস্য-পরিহাস সমন্বিত কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন 'খাপছাড়া' (১৯৩৭), 'ছড়া ও ছবি' (১৯৩৭), 'প্রহসিনী' (১৯৩৯)। তাঁর জীবনের এ এক দিক। কিন্তু অন্ত্যপর্বের শেষকটি কাব্য যেমন, 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' (১৯৪১) এমন কয়েকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে যে মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রের কবিচেতনার অখণ্ডতা আমাদের প্রকৃতই অভিভূত করে। সমকালীন জীবন এবং ইতিহাসকেও কবি দেখছেন মোহমুক্ত অন্তরে। অনেকের বিবেচনায় ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ এই তিন বছরেই নাকি কবিপ্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি এখন যেমন উচ্চকণ্ঠ, বাস্তব জীবনের মর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধ, সেই সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসার তৃষ্ণাও তাঁর অবিরল। তবে মনে রাখতে হবে, 'নৈবেদ্য' কাব্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত জীবনের কল্পনা সমানভাবে স্থান নিয়েছিল। আসলে কোনো পর্বই ঠিক কোনো পর্বের তুলনা নয়। প্রত্যেক পর্বই সময়চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গোচর-অগোচর নিজেকে নির্মাণ করেছে। সেই এক অখণ্ড কবিসত্তাই বর্ণালীর মত নানান আলোয় বারবার নিজেকে বর্ণময় করে তুলেছে। যদিও সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক-ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "তাঁহার সর্বশেষ কাব্যপর্বকে 'চিত্রা' পর্ব বা 'বলাকা' পর্বের সমতুল্য বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।" (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)।

15.3 নাট্য সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নাটকের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক বা শিল্পরূপের গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়ের নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বা ধ্যানধারণা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। ইব্‌সেন এবং বার্‌নারড্‌ শ'-এর নাটকগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নাটকেও এই গীতিধর্মেরই প্রাধান্য থাকবার কথা। এ ছাড়া তাঁর সমস্ত নাটকে তত্ত্বপ্রাধান্যও লক্ষ করবার মত। কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, প্রচলিত ধারায় রচিত নাটক বা রূপক-সাঙ্কেতিক

নাটক, যার কথাই ধরা যাক না কেন, সব ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব বা আইডিয়ার ব্যাপারটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এড্ওয়ার্ড টমসন (Edward Thompson) যথার্থই বলেছিলেন, 'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action' (Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist)। কথাটি অনুধাবনযোগ্য। তাঁর নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তিগত চিন্তাসূত্র নাট্যকাহিনীর ধারা গতি বা পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে অনেকে মনে করেন। ফলে তাঁর প্রায় সমস্ত নাটক কোনো না কোনো অর্থে তত্ত্বনাটক হয়ে উঠেছে।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি নাটকের প্রতি তাঁর তরুণ বয়স থেকেই জাত অনুরাগের কথা বলেছেন। প্রাথমিকভাবে ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল এবং বিশেষ করে মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। সেই প্রেরণায় যে নাটক তিনি লিখেছেন তা একান্তভাবেই রবীন্দ্রস্বভাবের। গীতিধর্মের সঙ্গে সেখানে অবারিত হয়েছে আইডিয়া বা তত্ত্বের সমন্বয়। কিন্তু সে তো আধুনিকতমতারও অবশ্য লক্ষণ। ঘটনার ভার কমে এসে তা তো নাট্যকারের অন্তর্গূঢ় বাণীকেই প্রধান করতে উন্মুখ। ঠিকই যে ইউরোপের সাঙ্কেতিক গোষ্ঠীর নাটক যদি নাটক হয়, ইব্সেন-বার্নারড্ শ'-গল্সওয়ার্দি বা ইউজিন ও নীল-এর নাটক যদি নাটক হয় তবে রবীন্দ্রনাথও অবশ্যই যথার্থ নাট্যকার বলে বিবেচিত হবেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে মোটামুটি ছ'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত—গীতিনাট্য : এর মধ্যে আছে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮৮), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রীতির নাটক। যেমন, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'তপতী' (১৯২৯)। তৃতীয়ত কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য। যেমন—'সতী' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯৭), 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' (১৯০০)। চতুর্থত, নৃত্যনাট্য—'চিত্রাঙ্গদা' (১৯০৬), 'চণ্ডালিকা (১৯৩৮), 'শ্যামা' (১৯৩৯)। পঞ্চম, কৌতুক রসপ্রধান নাটক, যেমন—'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) এবং ষষ্ঠত, রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক যার মধ্যে ছিল 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), এরই অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'গুরু' (১৯১৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬) এবং 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যে নাটকীয় ধারা বা আদর্শের মানদণ্ডে তাঁর নাটক-রচনা শুরু করেছিলেন তা মূলত চরিত্র ও ঘাত-প্রতিঘাতনির্ভর। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই তিনি ভিন্ন পথের পথিক এবং নানান পরীক্ষায় ব্রতী। একেবারে প্রথম দিকে নাটকের প্রকরণ হিসেবে সংগীতের সার্থকতা তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' বা 'মায়ার খেলা'-র মত রচনায় পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণ ঘটনা ইত্যাদি সবই যেন সংগীতময়, সংগীতনির্ভর। এতে অবশ্য কার্যত নাটক খুব কমই থাকে।

কবি যেখানে প্রচলিত ধারায় নাটক লিখেছেন সেখানে তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য গীতিধর্ম থেকে মুক্ত না হয়ে প্রচলিত গঠন কৌশলকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। 'সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি'—এই তত্ত্বটিকেই কবি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপ দিয়েছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে। গীতিধর্মতার কিছু প্রকাশ থাকলেও কবি এখানে মান্যতা দিয়েছেন জীবনসমস্যাকে। 'রাজা ও রাণী এবং 'বিসর্জন' শেক্সপিয়রিয় নাট্যরীতির আদর্শে রচিত। 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ

পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিক্রমদেব এবং সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই নাটকের অবলম্বন। যদিও শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক আঘাত-বেদনার মধ্যে তার পরিসমাপ্তি। সেখান রয়েছে অতিনাটকীয়তার রীতিমত ছোঁয়া। এ দুর্বলতা সম্পর্কে মহাকবি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাই সংশোধিত নাট্যরূপ 'তপতী'-র প্রকাশ। তবে নাটকীয় ভারসাম্য এখানেও ঠিক রক্ষিত হয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জন' এও পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি রক্ষিত হয়েছে। এই নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং প্রেমের শক্তির সঙ্গে আচারসর্বস্ব পৌরোহিত্য শক্তির প্রতীক রঘুপতির দ্বন্দ্ব রূপ পেয়েছে। 'মালিনী' নাটকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মসংঘর্ষ তেমন নাটকীয় সংহতি লাভ করেনি।

কাব্যনাট্য এবং নাট্যকাব্যগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নাটকীয় নয়, সেখানে গীতিধর্মিতাই প্রধান। এই সূত্রে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট সমালোচক 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের নিকট রূপ ঋণ লইয়া যে অর্জুনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহার জন্য তাহার মনে অনুতাপ ও আত্মধিক্কার জাগিয়াছে।...কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনা হইয়াছে নাটকীয় রীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ ও প্রেম নিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ব ও হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই কাব্য প্লাবনের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরাত্মা কাব্যের।" (রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা) 'গান্ধারীর আবেদন'-এর বিষয়বস্তুতেও নীতিপ্রতিষ্ঠাই প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্রগুলির মধ্যে আবেগের কোনো পরিবর্তন নেই। নাটকীয়তা প্রধান হয়নি। 'কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ'-এ বরং কাব্য এবং নাটকের সবচেয়ে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে হয়। কর্ণের জীবনের নিষ্ফলতার বেদনা এক ট্রাজিক সমাপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকেই রবীন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। ঘটনা এবং চরিত্রসৃষ্টির সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা অনুসরণের পরিবর্তে এখানে প্রকাশ পেয়েছে গভীরতম সত্যোপলব্ধি, তত্ত্বভাবনা তথা কবিআত্মার অবারিত প্রসার। সর্বত্রই যেন অমূর্তভাবের ব্যঞ্জনা, তাই এই গোত্রীয় নাটকের নিয়ন্ত্রণী শক্তি। 'রাজার' নায়িকা সুদর্শনা অন্ধ প্রবৃত্তিধর্মের প্রবর্তনাতেই অন্ধকারের রাজাকে নিজের আসক্তির সীমায় দেখতে চেয়েছিল। অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে পেয়েছে সেই সত্যদৃষ্টি যাতে রাজাকে সে প্রকৃত নিজের অন্তরের মধ্যে পায়।

প্রসঙ্গত বলবার যে 'রাজা'রই রূপান্তরিত সংস্করণ হল 'অরূপরতন'। 'ডাকঘর'-এও দেখি পরমাত্মার উদ্দেশে জীবাত্মার অভিসার। এক মৃত্যুপথযাত্রী বালকের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের পাঠানো চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে তার গভীর বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর প্রায় সমাসন্ন মুহূর্তে তার উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ যেন উঠে গেল—বাধাহীন স্বাধীনতায় তার ভগবৎ-সাক্ষাতের প্রস্তুতি 'ডাকঘর'-এর রূপক-সাঙ্কেতিকতাকে অসামান্যতায় আভাসিত করেছে। 'রাজা' এবং 'ডাকঘর'-কে আরও একভাবে ভাবা যায়। যেমন, প্রথম নাটকের নায়িকা সুদর্শনা রাজাকে প্রত্যক্ষভাবে পাবার জন্য উন্মুখ, আর দ্বিতীয় নাটকের বালক অমল ঈশ্বরের চিঠি পাবার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। কোনো নাটকেই সেই রাজা বা ঈশ্বর কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্চে এসে উপস্থিত হন না। হবেনই বা কী করে। ঈশ্বর বা পরমপুরুষকে তো অন্তরের মধ্যে পাওয়া ছাড়া অন্যভাবে পাওয়ার উপায় নেই।

'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'তে রয়েছে ধনবাদী যন্ত্রসভ্যতার সংকট এবং তার থেকে মানুষের মুক্তির কথা। মানুষ বিজ্ঞানের সাধনায় নিজের কল্যাণের জন্য যে যন্ত্রশক্তিকে আবিষ্কার করেছে, সাম্রাজ্যবাদী

অপপ্রয়াসে তা কেমন করে কার্যত মানুষের অকল্যাণেই ব্যবহৃত হয়—যুবরাজ অভিজিৎ নিজের জীবনের মূল্যে সেই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে এবং যন্ত্রের চেয়ে মানুষের শুভবুদ্ধিই যে বড়— সেই ব্যঞ্জনাকেই স্পষ্ট মাত্রা দেয়। এই ঘটনার রূপকে আমরা যেন শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির হাতে দুর্বল জাতিগুলির পীড়নকেই প্রত্যক্ষ করি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সভ্যতার লোভ, বঞ্চনা, নিষ্ফলতার যন্ত্রণা এবং নিজের কাছে নিজের বিড়ম্বনার পটভূমিকায় মানবাত্মার সত্য-অন্বেষণ, এই নাটকে রূপক-সাঙ্কেতিকতায় আভাসিত। এখানে যক্ষপুরীর যে অধীশ্বর, সে তার নিজের ব্যর্থতার যন্ত্রণায় নিজেই বিদ্ধ। যান্ত্রিকতা ও মনুষ্যত্বনাশী শোষণে সে বাড়িয়ে চলে তার সঞ্চয়ের বস্তুপিণ্ড। এর বিড়ম্বনা তার মত আর কে উপলব্ধি করতে পারবে। 'রক্তকরবী'র নায়িকা নন্দিনী যক্ষপুরীর এই অতৃপ্ত আবহাওয়ায় তথা বাতাবরণে বহন করে নিয়ে আসে প্রাণের ঐশ্বর্য। রাজাও মুক্তি পায় ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা থেকে। উপলব্ধি করে প্রেমের পবিত্রতাকে। যৌবনের প্রতীক, নন্দিনীর দয়িত রঞ্জনের আত্মদানেই সম্ভব হয়েছে এই পরিণতির।

'শারদোৎসব' এবং 'ফাল্গুনী' রূপক-সাঙ্কেতিক পর্যায়ের নাটক হলেও কিছুটা পৃথক গোত্রের রচনা। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত বা ভাবনার সংঘর্ষ এখানে সে অর্থে নেই। এ হল অবকাশের ঋতু শরৎ এবং যৌবনের ঋতু বসন্তের সৌন্দর্য ও ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ। 'অচলায়তন' নাটকে কবি দেখান, আচরণ ধর্ম নয়, বাইরের সাধনায় অন্তরের আকূতির নিবৃত্তি ঘটে না। এবং অর্থহীন অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নয়, তা বন্ধন মাত্র। কবি আসলে অন্ধসংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছেন। তবে উদ্দেশ্যময়তা কিছুটা প্রকট হওয়ায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার সৌন্দর্য সব সময় ফোটেনি।

'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা' (নৃত্যনাট্যের উপযোগী সংস্করণ), চণ্ডালিকা, শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে কবি সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভাববস্তুকে রূপায়িত করেছেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রসাশ্রিত নাটক। এখানে নাট্য পরিস্থিতি এবং আত্মমগ্ন খেয়ালি মানুষগুলির স্বভাব তথা আচরণগত অসঙ্গতি কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সে সময়ের অন্য প্রহসনের পাশে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি প্রকৃতই ব্যতিক্রম।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, তত্ত্ব বা আইডিয়ার প্রাধান্য রবীন্দ্রনাটককে দিয়েছে এমন এক মাত্রা যাতে তাঁর নাটক প্রচলিত ধারাতে বিশিষ্ট না হয়েও একান্ত নিজস্ব স্বভাবে সমুজ্জ্বল। আধুনিক কালের সংশয়-সংকট যন্ত্রণা তাঁর নাটকে এসেছে ভারতীয় কল্যাণবোধে আস্থা রেখে। বিদেশি নাটক মহাকবিকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে কতখানি প্রাণিত করেছিল সে আলোচনায় লাভ নেই। কেননা শেষ পর্যন্ত সবই তিনি আশ্চর্যভাবে নিজের মত করে রূপ দেন—পশ্চিম এবং পূর্ব যেখানে একবিন্দুতে সংহত। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ দর্শকের কৃপাধন্য হোক বা না হোক, বাংলা নাটকের ধারায় তা উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। উত্তরকালের কাছে তার মূল্য বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে।

15.4 ছোটগল্প

ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য বিশাল। মিল একটাই। দুই ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনের গল্প বলা হয় এবং তা গদ্যে। মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের যেমন সম্পর্ক, উপন্যাসের সঙ্গে গল্পের তেমন। উপন্যাসে জীবনের নানা বিচিত্র জটিল কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। তার বিচিত্র আবর্ত, বিপুল বিস্তার। ছোটগল্পে

এই বিস্তৃতির অবকাশ নেই, জটিলতারও নয়। একটা বিশেষ মুহূর্ত বা দিকই যেন বিদ্যুতের দীপ্তিতে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাকি অংশ আড়ালে চলে যায়। আর সেজন্যই এখানে নাট্য-মুহূর্তের আকস্মিকতা, গীতিকবিতার ব্যক্তিগত ভাব এবং সাঙ্কেতিকতার ব্যঞ্জনা একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। গীতিকবির মত গল্পকারও সব কিছুকে তাঁর ব্যক্তিমনের রসের শরিক করেই প্রকাশ করেন। উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা বাইরের দিক থেকে— ছোটগল্পে সেই উপস্থাপনা লেখকের নিজের উপলব্ধি, ধারণা ও চেতনার প্রেক্ষিতে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'ঘাটের কথা' প্রকাশিত হয়। সার্থক ছোটগল্পের সূচনা এখান থেকেই। এরপর 'হিতবাদী' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন তিনি। জমিদারি দেখাশুনোর সূত্রে যে বাংলাদেশের জীবন ও মৃত্তিকার সান্নিধ্যে তিনি এলেন— তাঁর গল্পে সেই পরিচিতিরই অসামান্য প্রকাশ। পদ্মা, বরেন্দ্রভূমির জীবন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভূত প্রভাবিত করেছে। কবি নিজে লিখেছেন, 'বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি পরিচয় অপরিচয়ে মেলামেশা মনের মধ্যে।...ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য বিপুল। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ধারায় যে গল্পগুলি পেয়েছি সেগুলি হল—'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দান প্রতিদান' 'ছুটি' প্রভৃতি। পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে পাত্র-পাত্রীরা গিয়েছে 'হালদার গোষ্ঠী', 'ঠাকুরদা' বা 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর মত গল্পে। তীব্র সমাজ-সমালোচনা তথা নারীর ব্যক্তি-অধিকারের কথা রয়েছে 'দেনাপাওনা' 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা' বা 'পয়লা নম্বর'-এর মত গল্পে। প্রেমের বিচিত্র জটিলতা, আবর্তের ব্যঞ্জনা রয়েছে, 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক'-এর মত গল্পগুলিতে। কাব্যব্যঞ্জনার সঙ্গে নিসর্গের মেলবন্ধন প্রেমের গল্পকে দিয়েছে অ-পূর্ণতার মাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে 'শুভা', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পে। অনায়াসেই সামান্য দু-একটি রেখাপাতে কবি মানবমনের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দরজাটি খুলে দিয়েছেন। 'অতিথি' গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের অবিচ্ছেদতার কথাই বলা হয়েছে অসামান্য শিল্পিত ভাষায়। তাঁর অতিপ্রাকৃত-রসাশ্রয়ী গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথ', 'মণিহারা' ইত্যাদি। কল্পনার বিচিত্র বর্ণময়তায় এ কেবলমাত্র আমাদের ভৌতিক সংস্কারের কাহিনী থাকেনি। বাইরের ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে কবি সঞ্চারিত করেছেন জীবনের অপরিমেয় রহস্যকে। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের ভিন্নতা আপনা থেকেই যেন সরে গিয়েছে।

শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ একেবারে আধুনিকতম সময়ের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। 'রবিবার' 'শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি' এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবনসমস্যার বিশ্লেষণের চেয়েও বক্তব্যের তির্যকতাই তাঁর লেখনীকে আকর্ষণ করেছে বেশি। কবি যে মনের দিক দিয়ে চিরতরুণ রয়ে গেছেন, 'শেষের কবিতা'র পর এই সব গল্পই প্রমাণ করে তিনি যেন একালের থেকেও ভাষায় আচরণে—এককথায় সবদিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছেন। অবশ্য নিজের মনের সার্বিক আভিজাত্য বজায় রেখেই। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সাহিত্যিক বিচারেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও তিনজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার চেকভ, পো এবং মোপাসাঁর পাশেই তাঁর স্থায়ী আসন।

15.5 উপন্যাস

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বঙ্কিমবৃত্তের বাইরে আসতে চেয়েছেন। যদিও সহসা সে ব্যাপারটি করে ফেলতে পারেননি। এর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস অবশ্যই বঙ্কিমপ্রভাবিত। ষোল বছর বয়সে কবি লিখেছেন 'করুণা'। ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) রোমান্সনির্ভর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' সম্পর্কে কবির নিজের মন্তব্য হল : "প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারে বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলো। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারেও, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।" বস্তুতই এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি—যেমন প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, সুরমা বা বসন্ত রায়, সবই যেন এক-একটা বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। চরিত্রের বহুবর্ণময়তা এতে ফোটেনি। অসৎ, মমতাহীন মানুষ বা ব্যক্তিত্বের চাপে কেমন করে সৌন্দর্য, কোমলতা ধ্বংস হয়—এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই। 'রাজর্ষি' অত্যন্ত সুখপাঠ্য উপন্যাস। কিন্তু এখানেও গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতি দুটি বিপরীতভাবের প্রতীক—প্রেম ও হিংসার। জয়সিংহের মধ্যে অবশ্য দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কিছুটা আছে।

'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসেই বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। মনস্তত্ত্বের জটিল পটভূমিতে মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী এবং রাজলক্ষ্মী—বিশেষ করে এই ক'টি চরিত্রের পারস্পরিক টানাপোড়েন বা ঘাতপ্রতিঘাত অসাধারণ বিশ্লেষণনৈপুণ্যে শিল্পিত হয়েছে। এই উপন্যাস থেকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূত্রপাত।

পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) কিন্তু একান্তভাবেই বাইরের ঘটনা বা যোগাযোগনির্ভর। পাত্র-পাত্রীর চরিত্রেও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার তেমন কোনো অবকাশ নেই। বরং সরলীকরণের মাত্রাই অত্যন্ত প্রকট। সমালোচকেরা 'নৌকাডুবি'কে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন।

'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৮) বৃহৎ জীবনসমস্যা তথা রাষ্ট্রিক আবর্তের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ বা জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনকথাই এই উপন্যাসগুলির অবলম্বন। 'গোরা'য় রয়েছে এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির চালচিত্র। ধর্ম থেকে এর নায়কচরিত্র যথার্থ স্বদেশ ভারতবর্ষে পৌঁছেছে। সে এক অসামান্য ছবি। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতি এবং ধর্মীয় আদর্শের এক সুসমঞ্জস্য মিলন, ব্যক্তিমনের শাখাপ্রশাখায় সমস্ত সমাজশরীরে প্রবাহিত প্রাণধারায় এইরকম অনায়াস সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত 'গোরা'র পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হয়ে গিয়েছে।

'ঘরে-বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখান— দেশমুক্তি কোনো প্রমত্ততার সমার্থকশব্দ নয়, তা কোনো সহজসাধনও কিছু নয়, দুঃখের আঁধার রাত্রি পার হয়ে তপস্যালব্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনেই সেই স্বদেশ সত্য হয়ে উঠবে। 'ঘরে-বাইরে'-তে বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ত্রিভুজ বৃত্তে সেই বোধ আর প্রকাশকে নির্মাণ করেছেন তিনি। বিমলাকে এ উপন্যাসে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র মনে হয়। নিখিলেশ এবং সন্দীপ মনে হয় দুটি পরস্পরবিরোধী আইডিয়ার রূপক মাত্র। যদিও প্রথম জনের বেদনা এবং দ্বিতীয় জনের খানিকটা

অনুতাপজনিত আবেগ ও উপলব্ধিতে কিছুটা জীবনের পরিচয় আছে। পক্ষান্তরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে কবি দেখাতে চেয়েছেন রুদ্রপন্থার অভাবাত্মক দিক। যদিও একথাও সমানভাবে বলবার যে, এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখালেন যে—ভালবাসা বর্বর।

পারিবারিক দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস হিসেবে 'যোগাযোগ' (১৯২৩) বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। মধুসূদন তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে কাছে পেতে চেয়েছে প্রেমে নয়, পুরুষের অধিকারবোধ আর অহংকারে। কুমু সেই আচরণের প্রতিবাদ করেছে। মধুসুদনকে বুঝিয়ে দিয়েছে এই অধিকারবোধ আর অহংকারকে সে স্বীকার করেনা। সে প্রেমের কাছে হার মানতে রাজি—বর্বর পুরুষত্বের কাছে নয়, অর্থের মত্ততার কাছেও নয়। শেষ পর্যন্ত তার মাতৃত্ব সব প্রশ্নকেই অমীমাংসিত রেখে ঘটনার যবনিকা ফেলেছে। 'যোগাযোগ' ভেতর থেকে সত্যি হয়ে ওঠেনি, তা নিতান্তই যেন এক বিদ্রূপের মত।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) কাব্যধর্মী উপন্যাসের আঙ্গিকে উজ্জ্বল। প্রথম উপন্যাসে শচীশ ও দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করা কঠিন। শচীশের মনের মধ্যে রূপ-অরূপের দোলন। শেষ পর্যন্ত অরূপের জগতেই যেন যাত্রা তার। দামিনী বাস্তব মানবী। এই বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব কবি অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন।

'শেষের কবিতা'য় অমিত ও লাবণ্যর আশ্চর্য রোমান্টিক প্রেম পাঠক-পাঠিকাকে এই উপলব্ধিতে উদ্‌বোধিত করেছে যে—প্রতিদিনের দম্পতি-জীবনের মধ্যে তার ঠিক প্রবেশাধিকার নেই। অমিত আর লাবণ্য এই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বিবাহ করেছে যথাক্রমে কেটী মিত্র এবং শোভনলালকে। তত্ত্ব যাই হোক না কেন এর কাব্যিক মাধুর্য, সৌন্দর্যের নন্দনলোক এবং তার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনের করুণ বেদনা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পথে পদচারণার অসামান্য সামর্থ্যকেই প্রকাশ করেছে।

'দুই বোন' (১৯৩১), এবং 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) আয়তনে ক্ষুদ্র। প্রথমটিতে দেখি নারীর দুই রূপের কথা—প্রিয়া এবং জননী। এই আইডিয়ার কথা শর্মিলা, শশাঙ্ক এবং ঊর্মিমালার কাহিনীর মধ্যে বিবৃত হয়েছে। এই সমস্যাই কিছুটা ভিন্ন দিক দিয়ে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা এবং আদিত্যের জীবনে বর্ণিত হয়েছে। অনেকটা ছোটগল্পের প্যাটার্নেই এখানে গল্প বলা। কাহিনী বা চরিত্রের জটিলতা নেই বলে অনেকে একে পুরো উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান না।

'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে বাইরে'র মত উপন্যাস যিনি রচনা করেছেন, তাঁর সামর্থ্য বা ঔপন্যাসিক প্রতিভার গভীরতা প্রমাণের জন্য সমালোচকের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। এটুকু অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন নতুন পথের অপেক্ষা করছিল, তখন সে পথ খুলে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। কবিধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের পথ তিনিই নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রভাবকে শিরোধার্য করেই তো শরৎ-প্রতিভার বিস্তার তথা প্রতিষ্ঠা।

15.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে বাংলা প্রবন্ধ তথা রচনা সাহিত্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। যাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে অর্থাৎ যেখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর অর্থাৎ লেখকের নিজের মনের প্রক্ষেপই একমাত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তারও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধকে পুরোপুরি শিল্পবস্তু করে তুলেছেন, বিষয়কেও দিয়েছেন

যথোচিত মান্যতা। কাব্য-কবিতার পাশে যে বিপুল পরিমাণ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তার বিষয়গরিমা তথা বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের প্রকৃতই বিস্মিত করে। পনেরো বছর বয়সে তাঁব গদ্যরচনার শুরু। শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট' তাঁর শেষ প্রবন্ধ। পঁয়ষট্টি বছর ধরে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসের মতই। তিনি মহৎ কবি মাত্র নন, মননের সীমানাতেও তিনি সম্রাট। জীবনের সদর্থকতায় বিশ্বাসই সেই মনন সাহিত্যের মর্মকথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যায় : সাহিত্যসমালোচনা, রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্র সাহিত্য এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

সাহিত্য-সমালোচনা : 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' এবং 'দুঃখসঙ্গিনী' এই তিনটি কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সূচনা। পরবর্তীকালে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাহিত্য প্রসঙ্গে বহু আলোচনাই তিনি করেছেন। তাঁর এ সংক্রান্ত আলোচনাগুলি 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোক সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যের সার্থক সমালোচনার সূচনা ও প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কবিদৃষ্টির গভীরতায় তাকে দেন সৌন্দর্য তথা রসোপলব্ধির অপরূপ মাত্রা। 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থগুলিতে কবি সাহিত্যের বিচার নিজের অনুভূতির আলোয় অসামান্য করে তুলেছেন। তার প্রবর্তনা সুন্দর এবং সত্যের সঙ্গে ভারতীয় মঙ্গলবোধ তথা 'শিবম্'-এর আইডিয়া। এও দেখবার যে সাহিত্য-সমালোচনাকেও তিনি এক অর্থে সৃষ্টির সীমানায় নিয়ে গেছেন। তা শুষ্ক সাহিত্য বিচার বা আলোচনা মাত্র নয়।

রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা : শুধু সাহিত্যের বিচার-আলোচনা নয়, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাতে কালাতিক্রমী আধুনিকতার পরিচয় সুমুদ্রিত। 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'সঞ্চয়' (১৯০৬), 'পরিচয়' (১৯০৬), 'শিক্ষা' (১৯০৬), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র, সমাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মনুষ্যত্বধর্ম তথা সর্বজনীন মানবতাই মহাকবির বাণী। এই গ্রন্থগুলির তাৎপর্য প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই পরম সম্পদ। শিক্ষা সংক্রান্ত রচনার মধ্যে 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩) বিশেষভাবে উল্লেখ করবার। শিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভারতীয় এবং মৌলিক ছিলেন এই সমস্ত রচনায় তার অসামান্য পরিচয় রয়েছে।

ভ্রমণ সাহিত্য : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উপলব্ধিরই সোপান বলে মনে করতেন। সেই উপলব্ধির প্রেরণাতেই তিনি বার হয়েছেন দেশে-দেশান্তরে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের স্থূল প্রয়োজনও। কিন্তু অন্তরের প্রেরণাই ছিল প্রধান। কখনও চিঠি কখনও বা ডায়েরির আকারে লেখা তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১৮৯১-৯৩), 'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পারস্যে' (১৯৩৬) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে প্রথানুগ ভ্রমণকাহিনী বিবেচনা করলে ভুল হবে। বিশ্বসভ্যতাকে কবি নিজের মনের রং রাঙিয়েই উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষভাবে একথাও বলবার যে প্রকাশকালের বিচারে প্রথম দুটি গ্রন্থে কবি প্রথম চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ : একথা সর্ববাদিসম্মতরূপে সত্য যে বিশেষ কোনো ধর্ম বা দর্শনের সূত্রে

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির প্রকাশকে বোঝা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারায় বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি যে বিশ্বমানবধর্মে বিশ্বাসিত হয়েছিলেন তার মধ্যে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার কোনো অবকাশ নেই। এরই অসামান্য পরিচয় রয়েছে 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬) এবং 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে। জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে দার্শনিকতা এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে। এর অপূর্বতাও সেইখানেই।

পত্র সাহিত্য : পত্ররচনাতেও মহাকবি চিরকালের লেখক হয়ে রয়েছেন। পত্রের আদর্শ হল সহজ ও অন্তরঙ্গ ভাষায় প্রিয় পরিজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা। ঠিক এতটা না হলেও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি তাঁর অসামান্য কবিত্বময় মানসিকতারই বর্ণাঢ্য প্রকাশ। 'ছিন্নপত্র'-এ (১৯১২) অবশ্য কবিজীবনের নিভৃত দিকের অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবির সাহিত্যসৃষ্টির এক সোনালি অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করছে এই পত্রগুলি। অন্যান্য পত্র সংকলনের মধ্যে 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) এবং 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯) উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তু এবং রসের আবেদন উভয়দিক দিয়েই বিশিষ্ট। এই গোত্রীয় রচনার মধ্যে 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) খুবই বিশিষ্ট। 'পঞ্চভূত'-এর 'মন', 'পল্লীগ্রাম', 'নরনারী' প্রভৃতি রচনায় অনুসৃত হয়েছে বৈঠকী সংলাপের এক মনোরম রীতি। এগুলি অনেকটা ডায়েরি জাতীয় আত্মনিষ্ঠ রচনা। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'পাগল', 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা', 'রুদ্ধগৃহ', 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রভৃতি রচনায় কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যানদৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাবিষ্ট কল্পনার একটি বর্ণময় চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'-র মত স্মৃতিকথাতেও কবি নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস রচনা করেননি। ব্যক্তিজীবনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিচেতনার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ একই সঙ্গে মনন সামর্থ্যে এবং কাব্যসম্পদে সমুজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধ প্রকৃতই এক মহাকবির প্রবন্ধ। কবিচেতনা এবং মনীষার লেখনী এখানে একবিন্দুতে সংহত হয়েছে।

15.7 সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং অভিনবত্বে বিশিষ্ট। কাব্য-কবিতার সঙ্গে তিনি লিখেছেন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অজস্র প্রবন্ধ নিবন্ধ।

বারো বছর বয়স থেকে চেতনালুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত কবিতাই কবির জীবনদেবতা। কাব্যরচনার পর্বগুলিকে সূচনা, উন্মেষ, ঐশ্বর্য, অন্তর্বর্তী, গীতাঞ্জলি, বলাকা এবং অন্ত্য—নানান বিভাজনে সাজানো হয়েছে। নাটকগুলিকে যেমন ভাগ করা হয়েছে গীতিনাট্য, প্রথানুগ, কাব্যনাট্য-নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য, কৌতুক রসাশ্রিত এবং রূপক-সাঙ্কেতিক পর্যায়ে।

এ ছাড়াও রয়েছে ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং মনীষী প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক পথিকৃৎ ও স্রষ্টা তিনি। আধুনিকতম জীবনও এসেছে এর বৃত্তে। উপন্যাসেও এনেছেন নতুন কাল ও রীতির তুলনাহীন স্বাক্ষর। নাটকেও তিনি বিশিষ্টতম। রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে তাঁর মনন এবং কবিধর্মের ঘটেছে অ-পূর্ব মিলন। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর বিপুল প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সাহিত্য-সমালোচনা, স্বদেশ ও সমাজচিন্তা, ভ্রমণসাহিত্য, শিক্ষানীতি, পত্রসাহিত্য, ধর্ম ও

দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন এক মনীষী রচনাকার। জীবন, স্বদেশ, সমাজ সব কিছুকেই যিনি দেখেছেন এক অখণ্ড দৃষ্টিতে।

15.8 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) রবীন্দ্রকাব্যের শৈশব পর্বে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম করুন।
   (খ) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যনাটকের উল্লেখ করুন।
   (গ) 'হৈমন্তী' এবং 'স্ত্রীর পত্র' গল্প দুটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় কেন বিশিষ্ট?
2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) 'চোখের বালি' উপন্যাসের অভিনবত্ব কোথায় আলোচনা করুন।
   (খ) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের পরিচয় দিন।
   (গ) 'ছিন্নপত্র'-এর বিশিষ্টতা কোথায়?
3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :
   (ক) 'বলাকা' পর্বের কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তার আলোচনা করুন।
   (খ) 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।
   (গ) 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার যে দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার বিবরণ দিন।

15.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম-চতুর্থ খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
2. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড)—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. রবীন্দ্রনাথ—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
4. রবীন্দ্রসরণী—প্রমথনাথ বিশী
5. রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়—ড. ক্ষুদিরাম দাস
6. ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রথম-ষষ্ঠ খণ্ড)— নেপাল মজুমদার
7. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য—ড. জীবেন্দু রায়
8. রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ—ড. জীবেন্দু রায়
9. রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা; রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা; রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
10. কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ—শঙ্খ ঘোষ
11. রবীন্দ্র-চিন্তা-চর্চা—ভবতোষ দত্ত
12. রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ—হরপ্রসাদ মিত্র

একক 16 ❑ রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

গঠন

16.0 উদ্দেশ্য

16.1 প্রস্তাবনা

16.2 রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

16.3 কাব্য-কবিতা

- 16.3.1 সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- 16.3.2 যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী
- 16.3.3 করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
- 16.3.4 কুমুদরঞ্জন মল্লিক
- 16.3.5 কালিদাস রায়

16.4 যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল

- 16.4.1 যতীন্দ্রনাথ
- 16.4.2 মোহিতলাল মজুমদার
- 16.4.3 নজরুল ইসলাম

16.5 আধুনিক কবিতার নবপর্যায়

- 16.5.1 জীবনানন্দ দাশ
- 16.5.2 অমিয় চক্রবর্তী
- 16.5.3 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- 16.5.4 প্রেমেন্দ্র মিত্র
- 16.5.5 বিষ্ণু দে
- 16.5.6 সুভাষ মুখোপাধ্যায়

16.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

- 16.6.1 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
- 16.6.2 প্রমথ চৌধুরী
- 16.6.3 বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 16.6.4 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- 16.6.5 মোহিতলাল মজুমদার

16.7 উপন্যাস ও ছোটগল্প

- 16.7.1 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- 16.7.2 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- 16.7.3 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

16.7.4 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
16.7.5 তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
16.7.6 বনফুল
16.7.7 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
16.7.8 প্রেমেন্দ্র মিত্র
16.7.9 মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
16.8 সারাংশ
16.9 অনুশীলনী
16.10 গ্রন্থপঞ্জি

16.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল :

- রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্য-কবিতার পরিচয়
- বাংলা প্রবন্ধের পরিচয়
- উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

16.1 প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য অবশ্যই এক সমৃদ্ধ পর্ব। কেমন করে কাব্য-কবিতা রবীন্দ্র-অনুসরণের পথরেখা অতিক্রম করে রবীন্দ্রবিরোধিতার পর্বে গিয়ে পৌঁছেছে তার বিপুল বৈচিত্র্য সমেত এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে রবীন্দ্রসমকালীন বাংলা প্রবন্ধের সমৃদ্ধ অধ্যায়েরও। সেই সঙ্গে এসেছে উপন্যাস ছোটগল্পের আলোচনা। প্রভাতকুমার শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যার সীমা প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত।

16.2 রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশটি বছর রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে দেশে-বিদেশে অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি। একথাও সত্যি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল। বিরুদ্ধতাও ছিল রীতিমত। পুরস্কার প্রাপ্তির পর তা যেন হঠাৎই দূর হয়ে যায়। অবশ্য বিরোধিতা তার পরেও হয়েছে। কিন্তু তা ব্যক্তিগত কিছু নয়, সাহিত্যিক আদর্শের ভিন্নতাই তার কারণ। স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তাতে সামিল হন। যদিও মনেপ্রাণে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। অন্তত তাঁর নিজের কথাতে তাই প্রমাণ হয়।

রবীন্দ্র-আদর্শ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে চলবার চেষ্টা শুরু হল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ১৯২৩ সালে

প্রকাশিত 'কল্লোল', ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'কালিকলম' এবং ১৯২৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রে এই অন্য পথে চলবার আহ্বান এল তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'। মোটামুটিভাবে সূত্রপাত হল রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্যের। প্রকৃতই এ এক সন্ধিক্ষণ তথা কালান্তরের মুহূর্তে। রবীন্দ্রসমকালীন পর্বের কবিদের সংক্ষিপ্ত কাব্যালোচনার মধ্যে দিয়ে এই সময়ের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

16.3 কাব্য ও কবিতা

16.3.1 সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১-১৯২২)

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সময়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বিষয়কেই তিনি তাঁর কাব্য-কবিতার বৃত্তে নিয়ে এসেছিলেন। ছন্দ এবং শব্দের ওপর ছিল তাঁর অনায়াস অধিকার। স্বয়ং কবিগুরুই তাঁর উদ্দেশে এই মর্মে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, 'তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রীপরে—একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে।'

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট লেখক এবং মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির সঙ্গে সংযত ক্লাসিক রুচি বা অনুশীলন যুক্ত হয়েছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'বেণু ও বাণী' (১৯০৬), 'তীর্থসলিল' (অনুবাদ কবিতা-১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (অনুবাদ কবিতা-১৯১০), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) 'অভ্র ও আবীর' (১৯১৬) এবং ব্যঙ্গ কবিতা 'হসন্তিকা' (১৯১৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ছন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্য, বাক্‌রীতির অভাবনীয় বিস্ময়, ইতিহাস-পুরাণ-প্রত্নতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মন্থন' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) করে প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গ, স্বদেশ এসব কিছুকেই কবি নিয়ে এসেছেন তাঁর কবিতার প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রানুসারী কবি হয়েও তাঁর বিশিষ্টতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। আবেগের ওপর স্থান দিয়েছেন যুক্তি এবং মননকে। এদিক দিয়েই তিনি আধুনিক। তাঁর জ্ঞানের পরিধিও বহুদূর বিস্তৃত। আঙ্গিকের দিকে তিনি যত্নশীল। কিন্তু যাকে সৃজনী কল্পনা বলে তাঁর সৃষ্টিতে তার অভাব আছে। এককথায় বড় মাপের রোমান্টিক কবিধর্ম তথা কবিধর্মের বিশিষ্টতা, গভীরতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।—এসব সত্ত্বেও শব্দমাধুর্য এবং চিত্রকল্পের বর্ণময়তায় তিনি পাঠকহৃদয়কে দীর্ঘকাল মোহিত রাখতে পেরেছেন।

16.3.2 যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (১৮৭৮-১৯৪৮)

রবীন্দ্র-অনুগামী কবিসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। শুধু রবীন্দ্র-অনুসরণ নয়, মৌলিকতার স্বাক্ষরও তাঁর কাব্য-কবিতায় রয়েছে। কোনো দূরপ্রসারী ভাবকল্পনা নয়, প্রতিদিনের চেনা পল্লীর আনন্দবেদনার ছবিই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার পল্লীশ্রী কবিকে মুগ্ধ করেছিল। কাব্যিক প্রয়োজন নয়, এই পল্লীবাংলাকে তিনি ভালবেসেছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। তাঁর প্রকাশরীতিও সহজ মাধুর্যবিশিষ্ট।

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অপরাজিতা' (১৯০৯), 'নাগকেশর' (১৯১৩), 'নীহারিকা' (১৯১৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে কাব্যরসিকেরা এই কাব্যগুলিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

রূপতৃষ্ণা কবির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে করুণানিধানের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। তাঁর কবিতায় নারীরূপের বন্দনা আছে, আছে সম্ভোগাকাঙ্ক্ষাও। কিন্তু সেই অর্থে উন্মাদনা কিছু নেই। শান্ত সংযত প্রকাশভঙ্গিমা তাঁর কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। রয়েছে দেশপ্রীতি এবং পৌরাণিক কাহিনীও। ইতিহাসবোধ এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গেও তিনি অন্তরের যোগ অনুভব করেছেন। এর দৃষ্টান্ত 'মহাভারতী'। এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরাও তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। গভীর বিশ্বাসজনিত মুগ্ধতাই কবি যতীন্দ্রমোহনের কবি-আত্মা বা কাব্য-চেতনার মর্মকথা।

16.3.3 করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)

রবীন্দ্রানুসারী বা রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে লালিত কবিসমাজের সম্পর্কে যে কথাটি বিশেষভাবে বলবার তা হল কবিতার রূপ নির্মাণের অসাধারণ কুশলতা সত্ত্বেও বিষয় বা ভাববস্তুতে নিজত্বের পরিচয় তেমন কিছু প্রবল নয়। আর রূপ নির্মাণেও তাঁরা রবীন্দ্ররীতির বাইরে যেতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের কাব্যে ছিল এমন এক সহজ সরল মাধুর্য যা আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিসমাজেরই একজন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০), 'ধানদূর্বা' (১৩১৮) এবং কাব্য সংকলন 'শতনরী' (১৩৩৭) উল্লেখযোগ্য। প্রেম-প্রীতি আসক্তিই এর মর্মকথা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব তাঁর কবিতায় আছে। কিন্তু ছন্দ, বিশেষ করে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগে তাঁর সিদ্ধি বিশেষভাবে বলবার। সেই সঙ্গে রয়েছে বাস্তবোচিত রোমান্টিক কবিপ্রাণ। বাস্তব তাঁকে আলোড়িত করলেও প্রতিদিনের সমস্যাজর্জরিত বিশৃঙ্খলা বা গ্লানির মধ্যে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। নিজের মত করেই গড়ে নিয়েছিলেন স্বপ্নের জগৎ।

16.3.4 কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)

পল্লীপ্রেমিক এবং বৈষ্ণবীয় ভাবরসে স্নাত কবি কুমুদরঞ্জন অনেকগুলি কাব্য লিখেছেন। তাঁর 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিক' (১৯১৮), 'অজয়' (১৯২৭), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' পল্লীগ্রামের রূপ এবং বৈষ্ণবীয় স্নিগ্ধতা নিয়ে বাঙালি পাঠককে দীর্ঘকাল এক ধরনের তৃপ্তি দিয়েছে, এনে দিয়েছে প্রসন্ন জীবনের স্বাদগন্ধ। একই সঙ্গে একথাও বলবার যে শব্দনির্বাচনে কবির তেমন যত্ন ছিল না, প্রথা অনুসরণের চেষ্টাই সমধিক। অল্প কিছু কবিতা হয়তো বেঁচে থাকবে তার নিজস্বতার জন্য।

16.3.5 কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)

কবিধর্মের বিচারে কালিদাস কুমুদরঞ্জনের মানসিকতার পরিমণ্ডলেই রয়েছেন। পল্লীঅন্তপ্রাণ না হলেও রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি তাঁর কাব্যে চমৎকারভাবেই এসেছে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে, 'পর্ণপুট' (১৯১৪), 'ব্রজবেণু' (১৯১৯), 'বল্লবী' (১৯১৫) এবং 'বৈকালী' (১৯৪০) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বৈষ্ণবীয় প্রেম প্রীতি তাঁর কাব্যবীণার মূল সুর। কাব্যের রূপপ্রসাধনে তিনি যত্নশীল, যদিও সেটা মাঝে মাঝে যেন একটু বেশি রকম বোঝা যায়। রসতত্ত্ববিদ্ হিসেবেই কাব্যের শিল্পরূপে তিনি যত্ন নিয়েছেন।

16.4 যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল

রবীন্দ্রসমকালীন এই তিনজন কবিকে পৃথক বৃত্তে রাখতে হবে সাহিত্যিক বিচারের মানদণ্ডেই। প্রকৃত কথা হল সম্মোহের অবস্থা থেকে রবীন্দ্রসমকালীন কবিরা বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। কবিরা পথ খুঁজছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। এইরকম এক অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। হঠাৎই একদিন 'বিদ্রোহী' কবিতার জয়পতাকা উড়িয়ে, অগ্নিবীণা বাজিয়ে নজরুলের মত কবি বাংলা কাব্যসংসারে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব বসুর মত সাহিত্যস্রষ্টা এবং রসিক মন্তব্য করেছিলেন 'সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।' রবীন্দ্রনাথের পাশে নিজের এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে জায়গা করে দেয়। যাকে আমরা ভদ্রলোকের পরিবেশ বলি, যেখানে সবই মার্জিত শালীন, বেশি রকমের শিষ্টাচার যেখানে ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে, নজরুলের সহজ বিচরণের ক্ষেত্র সেখানে নয়। তিনি সাধারণ মানুষের কবি। এ জিনিস সেদিন নতুন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও যে অন্য পথে পদচারণা করা যায় সাধ্য এবং প্রকৃতি অনুযায়ী এ ব্যাপারটি তিনিই দেখিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু অতঃপর যা বলেছিলেন তার মর্মকথা হল—মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত কবিদের (যাঁরা বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন) অন্যপথে হাঁটবার অন্যতর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার প্রেরণা এবং সামর্থ্যও যেন সহজ হয়ে এল। এরই প্রাথমিক পরিণতি 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব। সাহিত্যে নতুন কাল যে নিশ্চিতভাবেই আসন্ন, একথাটাও পাকা হয়ে গেল।

16.4.1 যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই প্রথম জন অর্থাৎ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব। অথচ এও সত্যি যে রবীন্দ্রের আস্তিক্যবাদ, প্রেম ও প্রকৃতিচেতনায় কবি তৃপ্তি পাননি। বিশ্বাসও করেননি বলা যায়। তাঁর চেতনাজগতে জীবনের বঞ্চনা ফাঁকি বা আত্মপ্রতারণার কথাই মান্যতা পেয়েছে। এককথায় তাঁর জগৎবোধ দুঃখময়। এর মধ্যে আনন্দময় বিশ্ববিধাতার কোনো মঙ্গলস্পর্শ তিনি অনুভব করেননি। এ বোধই তাঁর কাছে মিথ্যা, অসত্যমূলক। জীবনকে কবি দেখতে চেয়েছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। শুধু জীবন নয়, বাইরের প্রকৃতিও তাঁর কাছে রক্তাক্ত জীবন সংগ্রামে আকীর্ণ।

যতীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭) এবং কাব্যসংকলন 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬)। পরিমাণে যথেষ্ট না হলেও গুণমানে প্রথম শ্রেণীর।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'কবি যতীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তার মর্মকথা হল যে—এই আইডিয়া খুব নতুন কিছু নয়। এ ব্যাপারে ইংরেজ কবি ডান্ (John Donne) তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। সাহিত্যের সমালোচক ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অনেক সময়ে একটা ভঙ্গী মাত্র, দর্শন, হৃদয় ও মননের খুব গভীর স্তরে এই দুঃখবেদনা পৌঁছায় নাই। এই দুঃখবাদ কবির আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইলে, তিনি আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে দুঃখের দেবতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। দুঃখবাদ তাঁহাকে নৈরাশ্যবাদী করিলেও নাস্তিক করিতে পারে নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)।

যাই হোক, যতীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি এবং মানবপ্রেম তাঁর দুঃখবাদিতাকে মর্মস্পর্শী রূপ দিয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি সৌন্দর্যের জগতে ফিরে যাবার গাঢ় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছেন। 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' এবং 'নিশান্তিকা'-র মত কাব্য সেই চেতনারই ফসল।

আঙ্গিকের ব্যাপারেও কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। বক্তব্যের মধ্যে বলিষ্ঠতা আনতে গিয়ে কবি আশ্রয় নিয়েছেন বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির। তদ্ভব, দেশজ সব শব্দই তাঁর কাব্যবৃত্তে এসেছে প্রয়োজন অনুসারেই। শ্লেষ এবং ব্যঙ্গাত্মক বাক্য নির্মাণে, অলঙ্কার ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে তাঁর স্বাতন্ত্র্য তিনি সুনির্দিষ্ট আকারেই চিহ্নিত করেছেন।

16.4.2 মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

যতীন্দ্রনাথেরই প্রায় সমকালীন মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কাব্যে নিয়ে এলেন দেহাত্মবাদের বলিষ্ঠ সুর। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা-সংকুল জীবনবোধ। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগে এ এক অন্যতর আধুনিকতা। প্রবীণ এবং নবীন সমালোচকেরা বারবারই তাঁর কাব্যের আলোচনায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্তগোধূলি' (১৯৪১) এবং 'ছন্দচতুর্দশী' (১৯৫১) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

দেহবাদের বলিষ্ঠতার সঙ্গে মোহিতলালের কাব্যে হৃদয়ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। রোমান্টিকতা, ক্লাসিক রূপনির্মাণ এবং ভাস্কর্য নিয়ে মোহিতলালের কাব্যের আঙ্গিক ত্রুটিহীন ও বৈচিত্র্যময়। 'প্রাণের খেলায় দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার'-এ কেবল কোনো কাব্যের কবিতাবিশেষের পঙ্‌ক্তিমাত্র নয়, মোহিতলালের সমস্ত কবিচেতনারই মর্মবাণী।

16.4.3 নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক—নজরুলের দশক। এই সময়ে তরুণমনের কাছে, বিশেষ করে তাঁর কাব্যকবিতার আবেদন এতই প্রবল ছিল যে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও যেন ম্লান হয়ে যায়। কিছুকালের জন্য সাময়িক আবহাওয়া এবং পরে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর জীবন এবং সাহিত্যতে অন্য এক ধরনের মাত্রা দেয়। কবি 'লাঙল', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি বিপ্লবপন্থী সাম্যবাদী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। প্রকৃতই এরকম উন্মাদনা, প্রাণোচ্ছ্বাস, উৎসাহ-উদ্দীপনার বিপুল প্রবাহ, মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িকতা, সেই সঙ্গে স্বদেশ ও বিশ্বের মুক্তির জন্য স্বপ্ন আমাদের সাহিত্যে নতুন সামগ্রী। কবি যোগ দিয়েছিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে, অল্প কিছুসময় সান্নিধ্যে এসেছিলেন কবি মোহিতলালের। তাঁর প্রেমের কবিতায় আসক্তির যে তীব্রতা, তা মোহিতলালের প্রভাব বা সান্নিধ্যের ফল বলে মনে হতে পারে। 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) বিদ্রোহের বাণী। তাঁর 'ভাঙার গান' (১৯৩১), 'বিশের বাঁশী' (১৯৩১)-ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উল্লেখ্য সম্ভার।

শুধু বিদ্রোহ নয়, নজরুল রচনা করেছেন প্রেমের গান, একই সঙ্গে ঈদ্ এবং শ্যামামায়ের গান। এই সমদর্শিতা কবির পক্ষে বানানো কোনো সামগ্রী নয়, তা উঠে এসেছে তাঁর অস্তিত্ব ও চেতনার মর্মমূল থেকে। যদিও আবেগ তরলতা এবং ভাবগত অসংগতি তাঁর কাব্য-কবিতাকে অনেক সময়ই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা থেকে খানিকটা ভ্রষ্ট করেছে—বিষয়বস্তু যত মহৎই হোক না কেন। কিন্তু সব বাদ-সাদ দিলেও নজরুল তাঁর প্রেমিক এবং বিদ্রোহী মূর্তিতে উত্তরকালের কাছে বহুলাংশেই অম্লান থাকেন।

16.5 আধুনিক কবিতার নব পর্যায়

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি'—একটু পরে 'পরিচয়'-এর হাত ধরে বাংলা কাব্য-কবিতায় যে পালাবদল ঘটল আজ পর্যন্ত নানাভাবেই তার ধারা অব্যাহত, রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই সেদিনের পথিকৃৎ কবিরা নতুন পথের নির্মাণ ও অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। (১৯৩০) থেকেই এই যাত্রার শুরু। পূর্বসূচনা অবশ্য 'কল্লোল' থেকে (১৯২৩) হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক এই সব কবির দল বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তাকে নতুন কালের ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। কেবল অনুসরণ, কেবল চর্বিতচর্বণ কখনও মহৎ কিছুর জন্ম দেয় না।

16.5.1 জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। 'ঝরাপালক' (১৯২৭)-এ নজরুল-মোহিতলালের অনুসরণ আছে। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) বা 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৯)-র মত কাব্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্বতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। আধুনিক ইউরোপের কাব্য বা চিত্রশিল্প যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছিল তার পরিচয় যেমন এ সব রচনায় রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে আবহমানকালের বাংলার নিসর্গকে ভালবাসা, জীবনের বিষণ্নতার বোধ, ইতিহাসচেতনা—এককথায় আধুনিক জীবনচেতনার সবদিক। কাব্যের নির্মাণ বা বাক্‌রীতিতেও কবি নতুন। অবচেতনা তাঁর কাব্যে সবই যেন বিশৃঙ্খল এলোমেলো করে তোলে— সেই শৈথিল্য আর আপাত অসঙ্গতি আধুনিক জীবনচেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশকেও এমন রূপসী করে রবীন্দ্রনাথ আর বিভূতিভূষণ ছাড়া কেউ এঁকে তোলেননি।

16.5.2 অমিয় চক্রবর্তী (১৯০০-১৯৮৫)

আধুনিক সমালোচকেরা অমিয় চক্রবর্তীর কবিমনকে সবচেয়ে জটিল বলে বিবেচনা করেছেন। বাইরের দিক দিয়ে তাঁকে 'আধ্যাত্মিক' মনে হলেও অন্তরঙ্গ স্বভাবে তিনি একজন দ্বন্দ্বক্ষত মানুষ—এক শিকড়হীন ছিন্নমূল সত্তা। সমন্বয় বা সঙ্গতি যিনি ঠিক চেয়েও পাচ্ছেন না—অথচ মাটির বাংলাদেশ তাঁকে আকুল করে, একই সঙ্গে যিনি বিশ্বপথিক, বিশ্বমনা—সংক্ষেপে কবিমনের মানচিত্র এই।

'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'পারাপার' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এসব কাব্যের একদিকে রয়েছে বর্তমান জীবন ও সভ্যতার নঞর্থকতা, গ্লানিময়তার প্রতি তীব্র ধিক্কার; একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে প্রেম, সৌন্দর্য করুণার প্রতি তাঁর অবিমিশ্র পক্ষপাত এবং আশ্রয় নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা বীরধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—

> 'বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃতকরুণায় জিৎ,
> প্রত্যহ বীর্যেই ধ্যানের ভিৎ...
> পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা শোক
> মাথা নিচু করব না কোটি লোক।' (সত্যাগ্রহ/পারাপার)

16.5.3 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্য 'তন্বী' (১৯৩০) সে অর্থে কোনো মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্য তথা কবিতার সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ। তাঁর উল্লেখ্য কাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬) এবং 'দশমী' (১৯৫৬)। জীবনানন্দের আপাত অসঙ্গতি এবং আঙ্গিকগত শিথিলতার বিপরীতে তাঁর অবস্থান। ক্লাসিক সংহতি এবং দুরূহ শব্দের নির্বিচার প্রয়োগ তাঁর কাব্যকে দুর্বোধ্য করলেও রসিক পাঠকের কাছে এর রোমান্টিক জীবনসচেতনতা আড়াল থাকেনি। যদিও সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত জীবনের ইতিবাচকতায় স্থির থাকতে পারেননি। 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে দীপ্তি ত্রিপাঠী এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তার কাব্যকে 'ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ' বলে অভিহিত করেছেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'আবেগকে সংহত করিয়া, রসসিন্ধুকে বিন্দুতে পরিণত করিয়া এবং বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত বিশ্বকে হস্তামলকরূপে গ্রহণ করিয়াও তিনি জীবন সম্বন্ধে বিষণ্ণতা বোধ করিয়াছেন।...জীবনে প্রেম ও সৌন্দর্যকে কামনা করিয়াও তিনি সীমাবদ্ধ চেতনায় মাথা খুঁড়িয়াছেন। তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমের অন্তরালে একটা কোনো বিষণ্ণ স্বপ্নাভিসারী কবিপ্রত্যয় জাগিয়া আছে— যে কবিপ্রত্যয় জগৎ ও জীবনকে একটা সমন্বয়ী সূত্রে ধরিতে চাহে, কিন্তু অন্তর ও বাহিরের গরমিলের জন্য সেই সূত্রটার স্বরূপ বুঝিতে পারে না'। (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত)

16.5.4 প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

আঙ্গিকের বিচারে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) তেমন কিছু কৃতিত্বের দাবি করতে না পারলেও বৃহৎ মানবতার প্রেক্ষিতে প্রকৃতই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' এই সূত্রেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদর্শ হুইটম্যান, স্পেন্ডার-এর মত কবি। এই আদর্শেই তিনি পথিক মানুষের সাথী। ক্ষুধিতের ঈশ্বরকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বিপুল পৃথিবীর মধ্যেই। এই বলিষ্ঠ জীবনাবেগই তাঁর কবিতার প্রাণসম্পদ। এখানে আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মসর্বস্বতার অবকাশ নেই। যদিও জীবনের গভীর জটিল দিককে কাব্যে তিনি তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। কবি প্রেমেন্দ্র-র তা হয়তো স্ব-ধর্ম নয়ও। প্রত্যয়দৃপ্ত কবি বাইরের ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তবে 'কাব্যনির্মিতি'র ক্ষেত্রে তেমন কোনো মৌলিকতার পরিচয় যে তিনি রাখতে পারেননি, এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। তাঁর সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না।

16.5.5 বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

কালগত বিচারে বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র-র পরবর্তী। সচেতনভাবে রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিরোধিতায় তিনি প্রায় পথিকৃৎসদৃশ। 'মর্মবাণী' (১৯২৫) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), দ্রৌপদীর শাড়ী' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) পাঠকসমাজে খুবই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও রোমান্স, প্রেম ও সৌন্দর্যই, অন্য কিছু নয়। প্রেম, সৌন্দর্যকে বুদ্ধদেব জৈব শরীরের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে চেয়েছেন, তাকে অস্বীকার করে নয়। নারীর প্রেম তাঁর কাছে শরীর ব্যতিরিক্ত কোনো আইডিয়া নয়। কিন্তু কার্যত তিনি রবীন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কিনা তা নিয়েও গুরুতর সংশয়

আছে। আর তাছাড়া কাব্যে রূপ-রীতির দিক দিয়েও তিনি তেমন অভিনব কিছু একটা করতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মূলত বিষয়ের দিকে। লরেন্স বা বোদ্‌লেয়রের মত কবিস্রষ্টারা এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ। পরবর্তীকালে আঙ্গিক ব্যাপারে তিনি সচেতন হন, জীবন সম্পর্কে বোধেরও পরিবর্তন ঘটে, যদিও তিনি বিষ্ণু দে এমন কি জীবনানন্দের মতও সমকালীন রাষ্ট্রিক বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আলোড়িত ছিলেন না। এক অর্থে তিনি রসস্রষ্টা, শুদ্ধ কবি।

16.5.6 বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১)

বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাঠক পেলেন ব্যক্তিকে নতুন কাল আর বিশ্বাসের পটভূমিকায় তাঁর 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪০), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতার শরীরে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে মার্কসীয় পথে নতুন সমাজ ও পৃথিবীর স্বপ্ন যদিও পরে কবি ফিরে এসেছেন রোমান্সের জগতে। কিন্তু পুরনো বিশ্বাসকে বর্জন করে যে তিনি এ পথের পথিক হয়েছেন একথাও একেবারেই ঠিক নয়। আসলে রাজনীতি এবং জীবনকে বিসদৃশ কোনো বস্তু বলে তিনি বিবেচনা করেননি। তাই বারবারই বিষয়বৈচিত্র্যের আশ্রয় নেওয়া। কবির ভাষা প্রয়োগ অবশ্য সরল কিছু নয়, রীতিমত দুর্বোধ্য এবং কোনো কোনো সময় বৈদগ্ধ্যের ভারে আক্রান্ত। কিন্তু তাঁর কবিতার সম্পদ যে বিপুল এ নিয়ে এখন কাব্যরসিক এবং সমালোচক-মহলে কোনো মতাদ্বৈধতা নেই।

16.5.7 সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত মন নিয়েই বাংলা কাব্যসংসারে আবির্ভূত হন। ১৯৪০-এ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। 'পদাতিক' ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৫০), 'যতদূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬২), 'ফুল ফুটুক' (১৩৯৯)। এ ছাড়াও আরও অনেক কাব্যকবিতা তিনি রচনা করেছেন। মার্কসবাদের মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে কাব্যরচনা শুরু করলেও সুভাষের বিশ্বাস অনুযায়ী এখন তিনি জীবন ও সময়নিষ্ঠ কবি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারাননি।

আধুনিক কবিতা দীর্ঘ প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর পরে আজ একটি স্থায়ী ঐতিহ্যে পরিণত। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের চেষ্টায় তিনের দশকে যে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যান্দোলন শুরু হয় আজ তা এক কীর্তি অথবা ইতিহাসবিশেষ। বাংলা উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধের মতই কবিতার বৈচিত্র্য এবং প্রতিষ্ঠা আজ এক সর্ববাদিসম্মত সত্য এবং উত্তরকালের পক্ষে অবশ্যই গর্বের সামগ্রী।

16.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

রবীন্দ্রযুগের মননশীল প্রবন্ধ বা রচনাকারদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার সমৃদ্ধি এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এই সব রচনাকে এমন স্থায়িত্ব দিয়েছে যে দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তার গুরুত্ব সমান রয়ে গিয়েছে। এগুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল অংশের আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

16.6.1 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর নিজের মহিমায় ভাস্বর। মানবতাবাদ, ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনাকে দিয়েছে এক অনন্য চারিত্র্য। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, চরিত্রকথা সব কিছুতেই তিনি রেখে গেছেন স্মরণীয় সম্ভার। বিজ্ঞান ও দর্শনের মতই সাহিত্যও তাঁর স্বক্ষেত্র, স্বধর্ম। এই তিনের মিশ্রণে তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ রচনাতেও এসেছে সাহিত্যের সরসতা, তা নিতান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রবন্ধই তাঁর বিশ্বজ্ঞানের পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সমান মর্যাদা এক্ষেত্রে তাঁর। 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪), 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞকতা' প্রভৃতি রচনায় সেই অসামান্যতাই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রাথমিকভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহ ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দার্শনিক চিন্তার প্রতি গাঢ় অভিনিবেশ। সেখান থেকে তিনি পৌঁছে যান অস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রশান্তিতে। তত্ত্বজ্ঞান এবং রচনারীতি দুয়ের যুগলবন্দীতে তাঁর রচনা স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দৃশ্যমান বস্তুজগৎ এবং মানসিকভাবে তৈরি অধ্যাত্মজগতের সম্পর্ক ও স্বরূপ স্থির করার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শনের। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষতা দাবি সেকালেই বা কজন করতে পারতেন। এই প্রক্রিয়াতে রামেন্দ্রসুন্দর আরো একটি মহৎ কাজ করে গেছেন। বাংলা ভাষাকে তিনি আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনার উপযোগী করে তুলেছেন।

16.6.2 প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

'সবুজপত্র' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক হিসেবেই প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা 'বীরবল' ছদ্মনামের এই মনীষী রচনাকারের। যুক্তিপূর্ণ প্রগতিবাদী চিন্তাচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্যে তিনি খুবই বিশিষ্ট একজন লেখক। 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলিত গদ্যরীতির সার্বিক প্রয়োগের জন্য তিনি যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাকে স্বাগত জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'সবুজপত্র'-এর শক্তিশালী লেখকদল সমস্ত দুরূহ প্রসঙ্গকেই প্রকাশ করলে চলিত গদ্যভাষায়। বাংলা সাধু গদ্যরীতির বিপুল ঐশ্বর্যের পাশে এও আর এক নতুন ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা। বিশুদ্ধ চিন্তায়, যুক্তিতে জগৎ এবং জীবনের প্রকৃতিকে বুঝতে চাওয়া এবং তাকে চলিত ভাষার আধারে উপস্থাপিত করা সেদিন অবশ্যই এক ঐতিহাসিক দায়িত্বপালন। ধীরে ধীরে চলিত রীতিরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সর্বাত্মক। সমালোচকেরা অবশ্য মনে করেন যে ভাষার চেয়েও ভাব এবং চিন্তার জগতেই তাঁর বিদ্রোহ অনেক বেশি। 'তেল-নুন-লক্ড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯) এবং 'নানাচর্চা' (১৯৩২) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এর মধ্যে বিশেষ করে 'বীরবলের হালখাতা' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ বা দর্শন বিষয়ে যে এরকম একটি গভীর ভাব ও ভাবনাদ্যোতক গ্রন্থ চলিত ভাষায় রচনা করা যায় তা সে সময়ে অনেকের কল্পনারও অগোচর ছিল।

একথাও প্রসঙ্গত বলবার যে প্রমথ চৌধুরী-অনুসৃত চলিত গদ্যরীতি কিন্তু প্রতিদিনের লোক-ব্যবহারের ভাষা নয়। সে ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এবং বিবেকানন্দ নানা রচনায় অনেক সহজ ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাধু ভাষা প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি সহজ করে লিখতে পেরেছিলেন। আসলে লেখার মধ্যে একটি মানুষই ফুটে ওঠে। সেদিক দিয়ে 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী এবং

তাঁর রচনা একার্থক। কিন্তু ভাষা আরও সহজ এবং জীবনানুগ করবে বলে যে অঙ্গীকার তাঁর ছিল তা কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। এই সব খুঁটিনাটি দিকগুলি বাদ দিলে সাহিত্যিক আদর্শ এবং ভাষাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন কালকে আহ্বান করে এনেছেন তিনি। আমাদের জাতিগত মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করেছেন। এ ব্যাপারে ফরাসি সাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে প্রাণিত করে থাকবে। সেই সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রও আছেন। সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকেরা বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

16.6.3 বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের আয়ু মাত্র উনত্রিশ বছরের। 'চিত্র ও কাব্য' (১৩০১) তাঁর একমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। এর বাইরে আরও কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর গদ্যপ্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্র-সুহৃদ্ প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতীতে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাবগৌরবে এবং রচনাসৌন্দর্যে তাহারা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকল ব্যথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনি সুমধুর।' প্রকৃতই বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনার সঙ্গে কবিমনের একান্ত মৃণ্ময় গীতিকাব্যিক অনুভব ও সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। ভাষার চিত্রময়তা, শব্দের উজ্জ্বলতা তাঁর প্রবন্ধের উল্লেখ্য দিক। চিন্তার থেকে ব্যক্তিগত অনুভবেরই প্রাধান্য এখানে সমধিক। স্বাভাবিক জীবনসীমা লাভ করলে বলেন্দ্রনাথের হাতে বাংলা প্রবন্ধ আরও সমৃদ্ধ হত।

16.6.4 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষারও এক অসামান্য চিত্রকর। শব্দ দিয়ে ছবি এঁকেছেন তিনি। কখনো রূপকথার, কখনো ইতিহাসের, কখনো প্রকৃতির, কখনো বা আটপৌরে জীবনের। সব জায়গাতেই রঙ্ লেগে আছে। সরস রোমান্টিকতা এর মধ্যে ওতপ্রোত রয়েছে। তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' এবং 'শকুন্তলা' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত হয়। 'বাংলার ব্রত' (১৯০৮) 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫), 'খাজাঞ্চির খাতা' (১৯১৬), 'আলোর ফুলকি' (ভারতী-১৩২৬) এবং 'বুড়ো আংলা'র (মৌচাক-১৩২৭) মত রচনায় রূপকথাই যেন হাজির নতুন বেশে। সব কিছুকেই উলটে-পালটে অদ্ভুত রসসৃষ্টিতে তাঁর তুলনা নেই। তিনি যখন 'বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' (১৯৪৮), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৩), 'ঘরোয়া' (১৯৪১)-র মত অন্য বিষয় ও স্বাদের গ্রন্থ রচনা করেন তখন সেখানেও এমন একটা সহজ সরল সৌন্দর্যময় ছবির জগৎ আঁকা যায় যা লিপি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। সমালোচক-ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদ্ভট খেয়াল', 'রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম' এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্নিগ্ধ মধুর ব্যক্তিগত অনুভূতি' এই তিনের যেন যোগফল তিনি। এর সঙ্গে ছিল এক অনাসক্তির বোধ, কোথাও তিনি জড়িয়ে যান না। এমন কি নিজের সৃষ্টিতেও তাঁর তেমন মায়া নেই।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু প্রথম শ্রেণীর 'শিল্পী' নন, রূপকথাকারও বটে। সুন্দরের সঙ্গে অসঙ্গতির যুগলমিলনে যে উদ্ভট রসের সৃষ্টি করেছেন, চমৎকারিত্বে আগে বা পরে তার তুলনীয় কোনো রচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

16.6.5 মোহিতলাল মজমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। একসময়ে 'ভারতী' পত্রিকার লেখক, পরে 'কল্লোল' গোষ্ঠীতেও যোগ দিয়েছিলেন। 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে একসময়ে লিখেছেন তিনি। তাতে নিন্দা ও প্রশংসা দুয়েরই অধিকারী হয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্য বিচারের আদর্শ হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন ম্যাথু আর্নল্ড এবং ওয়ালটার পেটারের সাহিত্য বিচার পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি এবং তা তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৬), 'সাহিত্য কথা' (১৯৩৮), 'সাহিত্য বিতান' (১৯৪২), 'শ্রী মধুসূদন', 'বাংলার নবযুগ', 'সাহিত্য বিচার' তাঁর এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং বাঙালি জীবনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ, মোহিতলালের সাহিত্যসমালোচনাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। জীবনের আদর্শ এবং সাহিত্যিক আদর্শকে তিনি এক করে দেখেছিলেন। কিছু বিপত্তি হয়তো এতেই ঘটে থাকবে। অন্তত বিরোধীদের কাছে।

বাংলা প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি এখন বিপুল। অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত এক্ষেত্রে উজ্জ্বল নাম। আছেন অন্নদাশংকর, ধূর্জটিপ্রসাদের মত মনীষী রচনাকারও। বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও তেমন প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু চিন্তামূলক নিবন্ধ, ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা এবং সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

16.7 উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে দুজন কথাসাহিত্যিক বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একজন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অন্যজন শরৎচন্দ্র। দুজনেই তাঁর শিষ্যপ্রতিম। প্রথমজন সরাসরি রবীন্দ্র-নির্দেশেই কথাসাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। শরৎচন্দ্রও কমবেশি এই পরিমণ্ডলেরই লেখক। তা সত্ত্বেও শেষোক্তজন বিশেষ করে সে সময়ে এতটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন যে একদল পাঠক তাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী এক সাহিত্যপ্রতিভা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এসব বাদ দিলেও যে কথা আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী মূল্য পেয়েছে, তাহল সহজ সরল মাধুর্যেই ফুটে উঠেছে এঁদের সৃষ্টির চরিত্রগুলি। মনে হয় তা যেন আমাদের কত চেনা কখনও বা নিজেদেরই কেউ বলে মনে হয় অথবা নিজেরাই সেই কুশীলব। লেখক ও পাঠকের মধ্যে মূলত গড়ে ওঠে এক অদ্ভুত আত্মীয়তার বোধ।

16.7.1 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দো এবং গল্পসংকলন গ্রন্থের সংখ্যা বারো। সহজ সরল সর্বজনীন আবেদন তাঁর রচনাকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উপন্যাসগুলি হল 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'জীবনের মূল্য' (১৯২২), 'সিন্দুরকৌটা'

(১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'আরতি' (১৯২৪), 'সত্যবালা' (১৯২৫), 'সখের মিলন' (১৯২৭), 'সতীর পতি' (১৯২৮), 'প্রতিমা' (১৯২৯), 'বিদায়বাণী' (১৯৩৩), 'গরীব স্বামী' (১৯৩৮) এবং 'নবদুর্গা' (১৯৩৮)।

এগুলির মধ্যে 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ' ও 'সিন্দুরকৌটা' এক সময় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পল্লীবাংলার জীবন, পারিবারিক সুখ-দুঃখের বিচিত্র রূপই তাঁর কথাসাহিত্যে জায়গা করে নেয়। জীবনের জটিল রূপ বলতে যা বুঝি বা হৃদয় সম্পর্কের নানান কাটাকুটি খেলা তথা আবর্ত—তাঁর গল্পে তার পরিচয় নেই। মধ্যবিত্ত জীবনকথার একটা সীমিত পরিসরেই তাঁর বিচরণ। প্রভাতকুমারের 'রত্নদীপ' উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে ঘটনাধারার যোগাযোগজনিত চমৎকারিত্ব যেমন আছে সেই সঙ্গে পরিণামে আছে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা, সেই সঙ্গে নাটকীয়তাও। 'সিন্দুরকৌটা'-র মত উপন্যাসে বিজয়-সুশীলার প্রেমের কাহিনীর মিলনাত্মক পরিণতি পাঠক মনে এক তৃপ্তির আবেশ এনে দেয়। তত্ত্ব, তর্ক, আবর্ত বা জটিলতাহীন এই ধরনের রচনা পাঠকের কাছে চিরকালই প্রীতিপদ।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস সাধারণভাবে উপভোগ্য। যদিও টানা কাহিনী হিসেবে খুব একটা সুখপাঠ্য সব সময় নয়। তা ছাড়া উপন্যাসের উপযুক্ত একটা সমগ্র রূপও ঠিক তৈরি হয়ে ওঠে না। সীমিত পরিসরেই তাঁর কুশীলবদের যাওয়া-আসা। এই কারণেই ঔপন্যাসিক হিসেবে বাঞ্ছিত সার্থকতা তাঁর সব সময় আসেনি। যদিও পাঠকদের কাছে তা খুবই প্রীতিপ্রদ হয়েছিল।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। সহজ সরল এবং সরস ভঙ্গিতে তা পরিবেশিত হয়েছে। যদিও জটিল জীবনবোধ বলতে যা বোঝায় তা উপন্যাসের মত এই গল্পগুলিতেও নেই। তাঁর গল্পসংকলনগুলির মধ্যে 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'গহনার বাক্স' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক' (১৯২৩), 'জামাতা বাবাজী' (১৯৩১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পরচনার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করলেও পরে নিজের বিষয় ও আঙ্গিক তৈরি করে নেন। এই গল্পগুলির প্রধান আবেদন—আবেগ ও সংবেদনশীলতায়। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় জীবনই তাঁর বিষয়। গল্পের শরীরে এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন সেই প্রসাদগুণ এবং গতিধারার ঐশ্বর্য যাতে পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আর এইভাবেই তিনি পাঠকের গোচরে আনেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিককার বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বস্ত ছবি। নির্মল হাস্যরস বা হিউমারও তিনি প্রয়োগ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। আমরা মনে করতে পারি 'বলবান জামাতা' বা 'রসময়ীর রসিকতা'-র মত গল্প। 'মাষ্টার মহাশয়', 'প্রণয় পরিণাম', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পগুলির নির্মল আনন্দ পাঠকচিত্তে চিরকালের সামগ্রী হয়ে আছে।

করুণরস সৃষ্টিতেও প্রভাতকুমারের সাফল্য অবিসংবাদিত। তাঁর 'দেশী ও বিলাতী' গল্প সংগ্রহের 'ফুলের মূল্য' এবং 'মাতৃহীন' গল্প দুটির আবেদন সর্বজনীন। 'আদরিণী', 'দেবী', 'কাশীবাসিনী' গল্পগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'আদরিণী'র সেই হাতিটি আজও বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে প্রতিদিনের জীবনযাপনের একজন অন্যতম অংশীদার হিসেবে। কুসংস্কারের নির্মম রূপ রয়েছে 'দেবী' গল্পে। কালীকিঙ্করের অন্ধসংস্কার কীভাবে পুত্রবধূ দয়াময়ীকে দেবীতে রূপান্তরিত করে তাঁর জীবনে নিয়ে এল করুণ পরিণতি এই গল্পের বিষয়বস্তু তাই।

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের অবদান পাঠকস্মৃতিতে হয়তো কালধর্মে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু গল্পকার হিসেবে তিনি এখনও স্মরণীয়—এই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণেও।

16.7.2 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু—সময়সীমার ব্যবধান একশো বছরের। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ('করুণা' নয়) 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)। এরপর 'রাজর্ষি' (১৮৮৫)। 'চোখের বালি' (১৯০২) থেকে বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারার সূত্রপাত। অন্যদিকে গ্রন্থাকারে শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হল 'বড়দিদি' (১৯১৩)। এর আগে তাঁর কিছু গল্প অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সামাজিক বা ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্সগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে আধুনিক জীবনের উদাররূপ স্বীকৃতি পেলেও তাঁর নীতিশাসিত মনের দাপটও বড় কম নয়। এ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক বা ভুলবোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তায় এরকম অন্তর্বিরোধের অবকাশ কম ছিল। জীবনের এক পূর্ণবৃত্ত উদার মানবিক রূপই 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' বা 'চার অধ্যায়'-এর মত উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। একথা বলার মধ্যে কিছুমাত্র ভুল নেই যে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত। একথা তিনি নিজেও বলেছেন বহুবার। বস্তুত যাকে আমরা নিষিদ্ধ প্রেমকাহিনী বলি, আধুনিক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই তার গোড়াপত্তন করেছেন। সেই ধারাতেই, এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে আশ্রয় করেছেন 'চোখের বালি' এবং 'নষ্টনীড়'-এর মত রচনাকে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতা তাই গুণগত নয়, পরিমাণগত। ভাষা বা ভঙ্গির মধ্যে আন্তরিকতা, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসায় শরৎচন্দ্রের জিত অনেকটাই। তিনি যে তাঁর কালের অ্যাভারেজ পাঠক-পাঠিকাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্পর্শ করেন তার কারণ এই। মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও এই ভালবাসাতেই তিনি অমর হয়ে আছেন।

মোটকথা বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সমাজের আনন্দ-বেদনার রূপকার হলেন শরৎচন্দ্র নির্যাতিত মানুষের বেদনাও এসেছে অনিবার্যভাবে। সে মানুষ অবশ্যই নারীপুরুষ দুই-ই। পরিচিত জীবন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন উপন্যাসের উপকরণ।

বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের গল্প এবং উপন্যাসের বিভাজন নিম্নরূপ : এক : স্নেহ-ঈর্ষা-স্বার্থবোধকেন্দ্রিক সাধারণ পারিবারিক কাহিনী। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৫), 'রামের সুমতি', পণ্ডিতমশাই (১৯১৭), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) প্রভৃতি।

দুই : সমাজনিষিদ্ধ প্রেম-ভালবাসানির্ভর কাহিনী : 'বড়দিদি' (১৮৭৭), 'দেবদাস' (১৯১০) 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম ১৯১৭, দ্বিতীয় ১৯১৮, তৃতীয় ১৯৩৩, চতুর্থ ১৯৩৩), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)।

তিন : বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস : 'পথের দাবী' (১৯২৬)।

এভাবে পর্ববিভাজন করলেও একথাটিও বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্রের শিল্পীআত্মার সামগ্রিক প্রতিবাদী প্রকাশ ঘটেছে 'বড়দিদি', 'শ্রীকান্ত' (প্রথম-তৃতীয়) 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ' এবং 'শেষপ্রশ্ন'-এর মত উপন্যাসে। এই সমস্ত উপন্যাসে আমাদের বাঙালি সমাজের প্রচলিত নীতিধর্মকেই প্রশ্ন করেছেন তিনি। মানুষের ব্যথা-বেদনাকে প্রত্যক্ষ করে তাদের হৃদয়বেদনা এবং মর্মের আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে অসতী বলে বর্ণনা না করে তাদের অতৃপ্ত, অচরিতার্থ জীবনের প্রতি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা এবং তৃতীয় ব্যক্তি সুরেশ। অচলার দেহের তথাকথিত অশুদ্ধিকে শরৎচন্দ্র দেখেছেন উদার মানবিক দৃষ্টিতে। একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন নারীর মোহাবেশ সাময়িকভাবে দাম্পত্য-নীতিতে কিছুটা ধ্বস্ত হলেও তার অবচেতন মনে স্বামীর প্রতি একধরনের সংস্কারজনিত আনুগত্য থেকেই যায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আত্মজীবনীর স্মৃতিমূলক উপাদানের সঙ্গে ভ্রমণকাহিনীর রসরূপ এবং উপন্যাসের শিল্পমূর্তি সম্মিলিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের আবাল্য প্রণয় এ উপন্যাসের ধ্রুবপদের মত। বহু পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তের জীবন ও মনকে দিয়েছে বিস্তৃতি ও গভীরতার মাত্রা। 'দেবদাস' উপন্যাসে ভাবময়তার প্রাবল্যের মধ্যেও দেবদাস-পার্বতীর করুণরসপরিণামী জীবনকথার প্রকাশ ঘটেছে। 'পল্লীসমাজ'-এর রমা-রমেশের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। 'পথের দাবী'-র মত দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসেও মানবিক প্রেম-ভালবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প। দুটি গল্পেই শরৎচন্দ্র অসাধারণভাবে প্রমাণ করেছেন যে একেবারে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের বেদনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত গভীর ছিল। এই পরিচয়ের সূত্র-উৎস মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের অবিমিশ্র ভালবাসা। এই ভালবাসাতেই তাঁর অমরত্বের আসন।

16.7.3 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

শরৎচন্দ্রের মত বিভূতিভূষণের আবির্ভাবও এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১৯২২ সাল থেকেই তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছোটগল্প লিখেছেন। 'পথের পাঁচালী (১৯২৯) প্রকাশিত হবার পরই তাঁর প্রতিষ্ঠা পাকা হয়ে যায়। এর পর 'অপরাজিত' (১৯৩২)। কিন্তু এর আগেই প্রকাশিত গল্পগুলি যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। 'উমারাণী' (১৯২২) এবং 'পুঁই মাচা' গল্প দুটি আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (1934) বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৩৪২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'দেবযান' (১৩৫১), 'ইছামতী' (১৩৫৬)। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চল উঠে এল তাঁর সৃষ্টিতে এক অসাধারণ আটপৌরে ভঙ্গিমায়। তিনি যখন ইতিহাসকে আনলেন সে ইতিহাসও আশ্চর্যভাবে আমাদের প্রতিদিনের চেনা জীবনের সঙ্গেই যেন মেশানো। সমালোচকদের মতে 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'-র মধ্যে রোলাঁ (Romain Rolland)-র জাঁ-ক্রিস্তফ (Jean Christopher)-এর ছাপ আছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি এবং অদ্ভুত রহস্যচেতনা এক সঙ্গে মিশে গেছে। অলৌকিকে পৌঁছলেন 'দেবযান' উপন্যাসে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'মুডের দিক থেকে তিনি রোমান্টিক ও লিরিকধর্মী' (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস)। পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে 'দেবযান'-এর মত আরও একটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন—'দৃষ্টি প্রদীপ'।

বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিকের আদর্শ, রূপরীতির প্রতি কতটা বিশ্বস্ত ছিলেন তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসকারের কলমে তাঁর কবিচেতনা আমাদের নিয়ে গেছে প্রকৃতির সেই অ-পূর্ব সীমানায় যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ পরিচয় করিয়ে দিতে পারেননি। সেই প্রকৃতির পটে মানুষও আমাদের অনেকটাই অপরিচিত ছিল। প্রকৃতি ও জীবনের মিশ্রিত রূপের রহস্যময়তার আস্বাদ আমরা বিভূতিভূষণের রচনাতেই পেয়েছি। সমকালে এব্যাপারে তাঁর শরিক ছিলেন কবি জীবনানন্দ।

16.7.4 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭)

১৯২৩ সালে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। এই সময় থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পগুলি 'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৩৮), 'রাণুর কথামালা' (১৯৪১), 'হাতি খড়ি', 'বসন্তে' (১৯৪১), 'রাণুর কথামালা' (১৯৪২)-য় স্থান পায়। এক কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ এবং দার্শনিকতা এই হাস্যরসমূলক গল্পগুলিকে অন্যতর এক মাত্রা দিয়েছে। তাঁর হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য হল 'পোনুর চিঠি' (১৯৫৪) এবং 'কাঞ্চনমূল্য' (১৯৫৬)। 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪৫), 'প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস' ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রেমের ঘৃণা ও আকর্ষণের এক আশ্চর্য দ্বৈতরূপ এখানে সম্মিলিত হয়েছে 'কঠোর পরিমিতিবোধের' (ঐ) মধ্যে। এ ছাড়া রয়েছে 'রিক্‌সার গান' (১৯৫৯), 'মিলনান্তক' (১৯৫৯), 'নয়ন বৌ' এবং 'রূপ হল অভিশাপ' (১৯৬১)-এর মত উপন্যাসও। বিষয়বস্তু এখানে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। উদ্বাস্তুসমস্যা নিয়ে লিখেছেন 'পঞ্চপল্লব' (১৩৭১)। সংক্ষেপে তাঁর শক্তির উৎস এবং জীবন পর্যবেক্ষণের পরিধি সাধারণ ঔপন্যাসিকের থেকে অনেকটাই পৃথক। বাংলা উপন্যাসের ধারায় তিনি প্রকৃতই নতুন রসের অধ্যায় সংযোজনা করেছেন।

16.7.5 তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

ঔপন্যাসিক হিসেবে তারাশংকরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর আবির্ভাবের সময়েই বাঙালি পাঠক তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাঢ়-বাংলার আঞ্চলিক বিশিষ্টতার সঙ্গে সেখানকার মানুষগুলিও তাদের বাসনা-কামনা, সুখ-দুঃখ সমেত জীবন্তভাবেই উঠে এসেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বিশেষ করে বীরভূমের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন তিনি। নিজে ছোট মাপের জমিদার বংশের সন্তান। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় ও লুপ্তি এবং নতুন কালের আবির্ভাবের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাস ও গল্পে অসাধারণভাবে বাঙময় হয়েছে। গভীর বেদনার সঙ্গেই তারাশংকর এর রূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মহাত্মাজির অহিংসা-সত্যাগ্রহের পথে যে স্বাধীন ভারতবর্ষের আবির্ভাব সমাসন্ন হয়ে উঠেছে সেই আলোড়ন-প্রক্ষোভেরও তিনি মহান শিল্পী। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে তিনি এইভাবেই নিয়ে এসেছেন তাঁর সৃষ্টির প্রাঙ্গণে। ব্রাত্য মানুষ, ব্রাত্য জীবনের সেখানে অবারিত নিমন্ত্রণ।

'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯২৯), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩০), 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'আগুন' (১৯৩৭), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৭), 'কালিন্দী' (১৯৩৭), 'কবি' (১৯৪১), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২) তারাশংকরের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'প্রসাদমালা' (১৯৪৬) তাঁর উল্লেখ্য গল্প সংকলন। তাঁর গল্পেরও বিষয়বস্তু দ্বন্দ্বদীর্ণ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

মাঝে মাঝে অনাবশ্যক মন্তব্য এবং দার্শনিক চিন্তার গুরুভার বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসের অনায়াস গতিকে যে মাঝে মাঝে রুদ্ধ করে সে অভিযোগ কিছুটা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরকম কিছু বাদসাদ দিলে একথাও অবিসংবাদিত সত্য যে তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজমানসের রূপায়ণে মানুষের গভীর জীবনকথার কথকথাতে তাঁর কোনো তুলনা নেই।

16.7.6 বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

পেশায় চিকিৎসক, প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরের মানুষ। অসাধারণ কৃতিত্ব অণুগল্প রচনায়। এ জিনিসের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ছিল না। তাঁর গল্পসংগ্রহের মধ্যে 'বনফুলের গল্প' (১৯৩৬), 'বৈতরণী তীরে' (১৯৩১), 'বাহুল্য' (১৯৪৩) এবং 'অদৃশ্য লোক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও বিন্যাসে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা। মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক দুই সত্তার যুগলবন্দী। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫), 'কিছুক্ষণ' (১৯৩৭), 'দ্বৈরথ' (১৯৩৭), 'নির্মোক' (১৯৪০), তিন খণ্ড 'জঙ্গম' (প্রথম খণ্ড ১৯৪৩) 'ডানা' (১৯৪৮), 'স্থাবর' (১৯৫১), 'পঞ্চপর্ব' (১৯৫৪), 'লক্ষ্মীর আগমন' (১৯৫৪), 'মানসপুর' (১৯৭১) ইত্যাদি।

রসসৃষ্টিতে বনফুল শিল্পী। সাহিত্যের অনেক শাখাতেই দিয়েছেন অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয়। তাঁর লেখক প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দিক অজস্রতা। সেই সঙ্গে রয়েছে বৈচিত্র্য ও নির্মাণকৌশল। তাঁর প্রভূত পরিমাণে অনুশীলিত মন, তাঁর পরীক্ষাপ্রাণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের প্রতিবেশ এবং বাইরের বিন্যাস সম্পর্কে আগ্রহ, নতুন নতুন পরিকল্পনার চমকপ্রদ আবেদন—সব মিলিয়ে বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা তাঁকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। এককথায় নতুন কালের বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে বনফুলের নিবিড় যোগ। যদিও সামাজিক বা পারিবারিক জীবনচর্যার প্রেক্ষিতে তিনি কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন বলেই মনে হয়।

16.7.7 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৬)

'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, শেষোক্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। গল্পে এবং উপন্যাসে নিয়ে এসেছিলেন নতুন সুর যা সমাজের সার্বিক অসুস্থতার প্রতিবাদী। প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন-কথাকেই তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর সৃষ্টির জগতে এবং এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্যও আছে। যদিও তা একই সঙ্গে অসাধারণভাবেই বাস্তব। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'রেজিং রিপোর্ট' (১৯২৩), 'বলিদান' (১৯২৩), 'কল্লোল' পত্রিকায় 'মা' (১৯২৩), 'নারীর মান' (১৯২৩) তাঁকে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা দেয়। 'কয়লাকুঠি' (১৯৩০), এবং 'দিনমজুর' (১৯৩২) সংকলন গ্রন্থের এই গল্পগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের সূচনা করেছে। 'অতসী' (১৯২৫), 'নারীমেধ' (১৯২৮), 'বধূবরণ' (১৯৩১), 'পৌষপার্বণ' (১৯৩১), 'সতী-অসতী' (১৯৩৩), 'নারীজন্ম' (১৯৩৪) প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গল্প সংকলিত হয়েছে। কিন্তু 'মাটির ঘর' (১৯২৩), 'ঝড়ো হাওয়া' (১৯২৩), 'জোয়ার ভাঁটা' (১৯২৪), 'অনাহুত' (১৯৩১), 'অনিবার্য' (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাস তুলনায় তেমন উৎকৃষ্ট নয়। 'ষোলো-আনা (১৯২৫) এদিক দিয়ে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। গ্রাম দেবতার উৎসবকে অবলম্বন করে অতি তুচ্ছ অথচ অর্থপূর্ণ কথাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে সহজ সরল স্বাভাবিক ভাষায়।

16.7.8 প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন। 'প্রবাসী', 'বিজলী' ও 'প্রগতি' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। তাঁর 'পাঁক' (১৯২৬) এবং 'মিছিল' (১৯৩৩) তাঁকে আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এ ছাড়া 'পঞ্চশর' (১৯২৯), 'বেনামি বন্দর' (১৯৩০), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম দিকের

ছোটগল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। ছোটগল্পের রূপ-রীতি অনুসরণ করে মানুষের জীবনের ব্যর্থতাকে এভাবে আঁকবার দুরূহ শক্তি খুব কম কথাশিল্পীরই ছিল। কবিতার মত গদ্যেও প্রেমেন্দ্র স্ব-প্রতিষ্ঠ।

16.7.9 মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এই দু'খানি উপন্যাস প্রকাশের পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়। এর অভিনবত্ব পাঠকদের অভিভূত করেছিল এবং 'বোঝা গিয়েছিল যে ইনি এমন একজন মৌলিক লেখক যাঁর নিজের স্বতন্ত্র ছক্‌কোণ ও বিশিষ্ট অভিক্রম আছে' (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন)। মানুষের ভেতরের আলো-আঁধারির রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে তিনি পশ্চিমী মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই বই দুটি ছাড়া আরো যে সমস্ত গল্প সংকলন ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'অতসী মামী' (1935), 'জননী' (1935), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সহরতলী' (১৯৪০-৪১), 'হলুদপোড়া' (১৯৫৪), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), দুখণ্ড 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১-৫২), 'হরফ' (১৯৫৫), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ'-এ মানিক-প্রতিভার কিছু গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য তাঁর গল্পের পরিণামকে যে কিছুটা ফরমায়েসি করে তুলেছে তাতে সংশয় নেই। মানসিক উৎকেন্দ্রিকতা তাঁর বেশ কিছু রচনাকে নষ্ট করে ফেলেছে। প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে এইটি তাঁর গভীর দুর্বলতাও বটে।

16.8 সারাংশ

রবীন্দ্রকালীন এবং রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতে বিবৃত হয়েছে। প্রথমে 'কাব্য-কবিতা' আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কাব্যপরিচয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এতে উপস্থিত। আলোচনার বৃত্তে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের মত কবিরা। এরপর আলোচনায় এসেছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলামের মত কবিদের কাব্য-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডল থেকে কতটা এঁরা বার হয়ে আসতে পেরেছেন, সেই বিবরণ। এরপর 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়'-এর সূত্রে বাংলা কাব্যে যে রবীন্দ্রবিরোধিতার ঘোষিত অধ্যায় শুরু হল—তার বিবরণ। কবিদের মধ্যে আছেন জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাংলা কাব্যে যতার্থ রবীন্দ্রবিরোধী আধুনিকতার সূচনা হল এখান থেকে, যদিও বিরোধিতার তর-তম আছে।

'প্রবন্ধ-নিবন্ধ' অংশে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রসমকালীন পর্বের কয়েকজন অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিকের রচনাকর্মের বিবরণ। আলোচনার বৃত্তে রয়েছেন—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদারের মত লেখকেরা। প্রবন্ধকার হিসেবে এঁদের বিশিষ্টতার কথাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

অতঃপর উপন্যাস ও ছোটগল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প এবং উপন্যাসই এখানে আলোচিত।

16.9 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) কোন্ তিনটি পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রবিরোধিতার আহ্বান জানানো হয়?
   (খ) যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম করুন।
   (গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম করুন।
2. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
   (খ) 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস' এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের বিশিষ্টতা কোথায়?
   (গ) ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় স্বতন্ত্র তা আলোচনা করুন।
3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :
   (ক) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অথবা মোহিতলাল মজুমদারের কবিকর্মের পরিচয় দিন।
   (খ) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান আলোচনা করুন।
   (গ) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন।

16.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
2. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ)—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ-সপ্তম খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
4. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
5. বাংলা ছোটগল্প—ড. শিশিরকুমার দাস
6. রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ—ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
7. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী
8. আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়

একক 17 ❑ স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর

গঠন

17.0 উদ্দেশ্য

17.1 প্রস্তাবনা

17.2 স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর

17.3 কবিতা ও কবি

17.4 উপন্যাস ও ছোটগল্প

17.5 নাটক ঃ গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক

17.6 সারাংশ

17.7 অনুশীলনী

17.8 গ্রন্থপঞ্জি

17.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি যা জানতে পারবেন তা হল :

- স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তার পরবর্তী পর্বের কবিতার পরিচয়
- উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- নাটকের কথা।

17.1 প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার কিছু আগে, স্বাধীনতা সমকালীন ও তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের চারটি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে রয়েছে। কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-ছোটগল্প এবং বিশেষ করে গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

17.2 স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রবল বিক্রমে হানা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এরই মধ্যে পরপর ঘটেছে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুই জাতির পৃথকত্বের স্বীকৃতি, দেশ বিভাগ, মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি, দেশীয় ধনিক শ্রেণীর নঞর্থক রূপ, শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা, ধর্মঘট ও বেকারজীবন, দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতালোভী রাজনীতির বিস্তার নির্বাধ—সব মিলিয়ে এক হতাশার ছবি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে কমিউনিস্ট পার্টির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ প্রজন্ম। সেখানেও বিবাদ, দ্বন্দ্ব অতি ও মধ্য পন্থীদের সঙ্গে। স্বপ্নপূরণ হবার এখনও অনেক বাকি। যেটি সম্পূর্ণ হয়েছে সেটি হল—ভারতবর্ষের

রাজনীতি বা অর্থনীতিতে বাঙালির নেতৃত্বহীনতা। মহাত্মাজির সময় থেকেই বাঙালি অবশ্য তা প্রত্যক্ষ করেছে। এত দৈন্য এবং স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টি কিন্তু নষ্ট হয়নি। চিন্তা সংস্কৃতির সে আজও এক অর্থে নায়ক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও সে প্রত্যক্ষ করেছে তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক-এর মত সাহিত্য প্রতিভা; রবিশংকর, সত্যজিতের মত শিল্পীব্যক্তিত্ব, অমর্ত্য সেনের মত বিশ্রুতকীর্তি অর্থনীতিবিদ্। বাঙালি এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তত মৃত্যুঞ্জয়। মন্বন্তর এবং উদ্বাস্তু স্রোত এই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর প্রাণসম্পদ শেষ পর্যন্ত নষ্ট করতে পারেনি।

17.3 কবিতা ও কবি

পূর্বতন কবিতার ধারাই নানাভাবে বয়ে গেছে। কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭) স্বাধীন ভারতবর্ষকে দু'চোখ ভরে দেখার ঠিক সৌভাগ্য হয়নি। মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তা বিস্ময়কর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণাই তাঁর কবিতার মূল সুর। অনেকেই তাঁর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনায় ছেদচিহ্ন টেনে দেয়। 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাষ', 'ঘুম নেই' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সমাজতন্ত্রের জন্য স্বপ্ন এবং ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ই তাঁর কবিতায় একাকার হয়ে গেছে।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫) বয়সে সুকান্তের চেয়ে প্রবীণ। কিন্তু তিনিও প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ ধনবাদী সভ্যতার শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে। এই সভ্যতা মানুষের ভেতরে ভেতরে যে গ্লানি আর বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, কবি তার কথাও অবিশ্রান্ত বলেছেন। তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা'র সম্পাদক তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই ক্ষেত্রে প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য : "উলুখড়ের কবিতা', 'মৃত্যুত্তীর্ণ', 'লখিন্দর' কিংবা 'জাতকে'র ব্যাপ্তি জুড়েও কবি 'রাণু-র জন্য'তে যেমন, অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধও তার অস্থির দহনে বিপর্যস্ত। কখনও আবার সীমাহীন নিরাসক্তি ও ক্লান্তির অবসাদে অসহায়, পর্যুদস্ত।...উল্লেখ করা প্রয়োজন, নৈর্ব্যক্তিক ও নীরক্ত যেমন নয় এই মানবতাবাদ, তেমনি তা পক্ষপাতহীনও নয়। তাই তাঁর কবিতা ভ্রষ্টাচার শাসনের প্রতিবাদে, ভণ্ড নেতা-কবি-সাংবাদিককুলের মুখোশ উন্মোচনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, শ্লেষাত্মক ও নির্মম। অন্যদিকে সাধারণ, উৎপীড়িত, সংগ্রামী-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভালবাসায় তাঁর কবিতা নম্র ও স্নিগ্ধ।" স্লোগান থাকলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই শেষ পর্যন্ত কবিত্বের সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন অনায়াসে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) এই পর্বের এক অদ্ভুত নিয়ম শাসন না-মানা কবি। 'অস্ফুট যৌবন' (১৯৫২) তাঁর প্রথম কবিতা। তাঁর কবিতা-কাব্যকে তিনি 'পদ্য' বলতে পছন্দ করতেন। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?' 'ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকার', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'উড়ন্ত সিংহাসন', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। সমস্ত পুরনো মূল্যবোধকে চূর্ণ করতে চাইলেও শেষে কিন্তু জীবনসায়াহ্নে শক্তি রবীন্দ্রনাথেই তাঁর আশ্রয় খুঁজে পান। শক্তি এও বলেছিলেন, পশ্চিমী ধরনের 'হাংরি' নন তিনি, তিনি স্পষ্টতই দরিদ্র দেশের একজন 'ক্ষুধার্ত'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪) কবিতাও পাঠক-চিত্ত জয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। জীবনের দুঃখ বঞ্চনায় কবি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ করতে চান, কখনও পারেন, কখনও পারেন না, এরই মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে ভালবাসার

স্মৃতি, ভালবাসার স্বপ্ন। সুনীল মনে প্রাণে একালের অথচ পুরনোর সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই। 'একা এবং কয়েকজন' (১৩৬৭), 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' (১৩৭২), 'বন্দী জেগে আছো' (১৩৭৫), 'আমার স্বপ্ন' (১৩৭৯), 'সত্যবদ্ধ অভিমান' (১৩৮০), 'জাগরণ হেমবর্ণ' (১৩৮১), 'মন ভালো নেই' (১৩৮৩), 'এসেছি দৈব পিকনিকে' (১৩৮৪), 'স্বর্গনগরীর চাবি' (১৩৮৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক কবিতা নদীর মত। কোথাও তার ছেদ নেই। বিপুল বৈচিত্র্য আর সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে মহাসমুদ্রের দিকে। তার যাত্রাপথ যেন এক অন্তহীনতার প্রতীক।

17.4 উপন্যাস ও ছোটগল্প

পটভূমিকাগত যে উত্তরাধিকার কাব্য ও কবিতা বহন করেছে, সেই একই কথা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কথাকার হলেন—প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ লেখকবৃন্দ। সকলের সময়সীমা এক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পর্বেই এঁদের অনেকের রচনার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা শুধু সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়, গ্লানি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম-পরিণয় নয়, সমাজ-রাষ্ট্র এমনকী ভ্রমণেও এসেছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অগ্রগামী' (১৯৩৬), 'তুচ্ছ', 'প্রিয়বান্ধবী', 'বনহংসী' উপন্যাস এবং ছোটগল্প সংকলন 'অবিকল' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রেক্ষিতে নয়, জীবনকে তিনি একান্তভাবেই তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রবোধকুমার কোনোভাবেই ভাববিলাসী নন।

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের মধ্যে 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী' (১৩৪৭) সময় সচেতন সৃষ্টি—যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত (১৯৪৫)। 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭) একটি ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের ছবি। আদিম সংস্কারপ্রধান জীবনের ছবি 'শতকিয়া' (১৯৫৮)। এছাড়া আছে তাঁর অসামান্য গল্প সংকলন 'ফেনিল' (১৯৪১), 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার' (১৯৪৪), 'জতুগৃহ' (১৯৫২)। জীবনকে সুবোধ ঘোষ শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আশাবাদী দৃষ্টিতে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' (১৩৫৯), 'দুরভাষিণী' (১৩৫৯)। মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, গ্লানি-বেদনার ছবি। স্বাধীনতার আগে রচনা শুরু করলেও পরবর্তীপর্বে মনোজ বসু লিখেছেন 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বৃষ্টি বৃষ্টি' (১৯৫৭), 'আমার ফাঁসি হল' (১৯৫৯), 'রক্তের বদলে রক্ত' (১৯৫৯), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৫৯), 'রূপবতী' (১৯৬০) এবং 'বন কেটে বসত'-এর মত উপন্যাস। 'স্বচ্ছন্দগতি ও জীবন পর্যবেক্ষণশক্তি' তাঁর রচনার সম্পদ। বিমল করের 'দেওয়াল' (১ম, ১৯৫৯, ২য় ১৯৫৮) উপন্যাসে যুদ্ধ কেমন করে আমাদের জীবনকে আলোড়িত, ধ্বংস করেছে তার অনুপুঙ্খ ছবি রয়েছে। সমরেশ বসু লিখেছেন 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা' বা 'ছিন্নবাধা'-র মত উপন্যাস। পরে 'বিবর', 'প্রজাপতি' এবং 'পাতক'-এর মত বিতর্কিত রচনা। অজস্র লিখেছেন তিনি। 'কালকূট' ছদ্মনামেও অন্যস্বাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। সাহিতের ঐতিহাসিকের মতে, 'অসামাজিক অবক্তব্য, রুচিবিরোধী জীবনের নিষিদ্ধ প্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া তরুণ উপন্যাসিকের দল ব্যাপ্তিকে বাদ দিয়া গভীরতার অতলে আত্মগোপন প্রয়াসী...ইঁহাদের ছোটগল্পগুলি সংকীর্ণক্ষেত্রে যতটা সার্থক হইয়াছে, উপন্যাসে ততটা সার্থক হইতে পারে নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

17.5 নাটক ঃ গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে বাঙালির ওপর যে আর্থ-সামাজিক দুর্যোগ-বিপত্তির ঝড় প্রবাহিত হয়েছে তার তুলনা নেই। কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসের মত নাটকেও তার প্রতিফলন অবিরল। বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন 'নবান্ন'-এর মত নাটক; দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা'; তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'পথিক'—সবই এই দ্বিতীয় যুদ্ধ সমকালীন এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের বিবিধ বিপর্যয়ের দর্পণ। নাটক নেমে এসেছে একেবারে অতি সাধারণ মানুষের কাছে—তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার অবিকল প্রতিধ্বনিসমেত। বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের মধ্যেও মানুষকে দেখিয়েছিলেন 'নবান্ন' উৎসবের স্বপ্ন, সেই প্রতিরোধের কথা কখনো তির্যক, কখনো বা সরাসরি এসেছে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসী লাহিড়ীর নাটকেও। এও এক নাট্য আন্দোলন—জনসাধারণকে নিয়ে, তাদের জন্য। স্বাধীন ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক নতুন পৃথিবীর স্বপ্নই এই সব কিছুর প্রেরণা-প্রবর্তন।

17.6 সারাংশ

স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। 'কবিতা ও কবি' অংশে রয়েছে সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 'উপন্যাস ও ছোটগল্প' অংশে আলোচিত লেখক হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিমল কর। 'গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক'-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

17.7 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম করুন।
   (খ) সুবোধ ঘোষের তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংগ্রহের নাম করুন।
   (গ) গণনাট্য আন্দোলনের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার কে কে?
2. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
   (ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
   (খ) প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহের নাম উল্লেখ করে তাঁর সাহিত্যধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
   (গ) 'মন্বন্তর' কীভাবে বিজন ভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করেছিল?
3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :
   (ক) স্বাধীনতা ও দেশভাগ পর্বের পটভূমি আলোচনা করুন।

(খ) কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতির পরিচয় দিন।

(গ) মনোজ বসু, বিমল কর এবং সমরেশ বসুর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করুন।

17.8 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
2. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব—দর্শন চৌধুরী
4. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ
5. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
6. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
7. আধুনিক কবিতা পরিচয় (মনীষা)—অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
8. তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী—অরুণকুমার সরকার
9. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী

একক 18 ❒ বাংলা ভাষার বিবর্তন

গঠন

18.1 উদ্দেশ্য

18.2 প্রস্তাবনা

18.3 বাংলা ভাষার বিবর্তন

18.3.1 বাংলা ভাষার কালবিভাজন

18.4 প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

18.5 মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

18.5.1 অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

18.6 আধুনিক বাংলার লক্ষণ

18.7 সারাংশ

18.8 উত্তরমালা

18.9 গ্রন্থপঞ্জি

18.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার বিবর্তন তথা পরিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- গত হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে তার একটি সার্বিক পরিচয় পাবেন।

18.2 প্রস্তাবনা

চর্যাপদ-এর সময় থেকে আধুনিক কাল—এই দীর্ঘ সময় নানান পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা যেভাবে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে তার পরিচয় দেওয়াই বর্তমান এককের লক্ষ্য।

18.3 বাংলা ভাষার বিবর্তন

18.3.1 বাংলা ভাষার কালবিভাজন

উনিশশো' সাত সালে নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরী থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'-এর পুঁথি উদ্ধার করে প্রকাশ করলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই। রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী বা তার অল্প কিছু পরে। বাংলা ভাষার আদিপর্বকে এই আবিষ্কারের ফলে নতুন করে চেনা গেল। কীভাবে এর বিবর্তনটি ঘটেছে সে সম্পর্কে উৎসাহী গৌড়জন নিশ্চিন্ত হলেন।

প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন আমরা পেয়েছি বৌদ্ধ সাধকদের 'চর্যাপদ'-এ, এছাড়া আছে বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস-এর 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' কাব্যের কয়েকটি শ্লোক এবং 'সেক শুভোদয়া'-য় সংকলিত কিছু গান এবং ছড়া। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর ব্যাখ্যা) গ্রন্থে প্রায় চারশো'র বেশি বাংলা, আধা সংস্কৃত, তদ্ভব এবং দেশি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিছু ভূমিদান পত্র বা শিলাপটের কথাও উল্লেখ করবার মতো। প্রথম পর্বের বাংলা ভাষার উদাহরণ এগুলির মধ্যেই রয়েছে। সময়সীমা আনুমানিক অথবা কমবেশি ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পরের একশো বছরকে (অর্থাৎ ১২০০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়েছে সন্ধিপর্ব।

মধ্যপর্বের বাংলা ভাষার দুটি পর্যায়—(এক) আদি-মধ্য এবং (দুই) অন্ত্য-মধ্য। শেষ পর্যায়ের স্থিতি ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুকুমার সেন-এর মতে শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা ভাবলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের সীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরাই ঠিক হবে। তবে এর সঙ্গে সাহিত্যিক ব্যবহারের দিক লক্ষ্য রাখলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

18.4 প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

সাধারণভাবে লক্ষণগুলি হ'ল এইরকম ঃ

এক। চর্যাপদ-এর ভাষায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জণবর্ণের ধ্বনিগত বিশিষ্টতা আধুনিক বাংলার মতোই। তবে সংস্কৃত বানানগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহারে বিচ্যুতি আছে। যেমন সবর/শবর, পানি/পানী। এই একই ধরনের বিচ্যুতি আছে শ, ষ, স-এর প্রয়োগেও। ন, ণ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। যেমন বলা চলে অ, ই এবং এ-কারের আপাত বিশৃঙ্খলা সম্পর্কেও। বানান বিভ্রাট ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেনি, ঘটেছে অসতর্কতা বা অজ্ঞতার জন্য। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ডুম্বী, ডোম্বী যেমন আছে তেমনি ডোম্বি, শবরি বানানও আছে।

দুই। সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জন সরল হয়েছে। সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি হয়েছে দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা অবশ্য লেখায় নেই। যেসব ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঙ, ঞ, ণ, ম যুক্ত থাকত তাদের পূর্বস্বর দীর্ঘ হত। সেগুলি লুপ্তপ্রায় হয়ে তাদের জায়গায় সানুনাসিক স্বরধ্বনি এসে গেল। যেমন 'ধর্ম' হয়েছে 'ধাম',

'জন্ম'—'জাম', 'মাধ্যন'—'মাঝেঁ' প্রভৃতি। এর ব্যতিক্রম রয়েছে অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে যুক্তব্যঞ্জন থেকে গেছে। যেমন 'দুর্লক্ষ্য' থেকে আসা 'দুলক্‌খ', 'মিথ্যা' থেকে জাত 'মিছা'।

তিন। ক্রিয়াপদের শেষে 'অ' লুপ্ত হয়েছে। 'উট্‌ঠিঅ' হয়েছি 'উঠি'। কিন্তু মূল বিশেষণপদ যখন ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তার শেষে 'অ' থেকে গেছে, লুপ্ত হয়নি। যেমন 'করিঅ', 'জ্বলিঅ' প্রভৃতি। আদিতে এগুলি 'কৃত', 'জ্বলিত' এই অর্থপ্রকাশক পদ ছিল।

চার। র-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়। পাঁচ, সাত বা বত্রিশ সংখ্যক চর্যায় 'নি অড়ি' 'নিয়ড়ি' পদে এবং এগার সংখ্যক চর্যায় 'ন আড়ি' পদে য়-শ্রুতির উদাহরণ আছে। এইরকম ব-শ্রুতির উদাহরণ রয়েছে বারো সংখ্যক পদের 'নওবল', আঠারো সংখ্যক পদের 'ভুঅন' এবং দশ সংখ্যক চর্যার 'নাবেঁ' পদে। এই 'নাবেঁ' রূপান্তরিত হয়েছে 'নাএঁ-তে'।

পাঁচ। এর, অর এবং র বিভক্তির সাহায্যে ষষ্ঠীর পদ সম্পন্ন করা হত। চর্যায় আছে 'রুহের তেন্তলি' অর্থাৎ গাছের তেঁতুল বা 'ডোম্বী-এর সঙ্গো' অর্থাৎ 'ডোম্‌নীর সঙ্গো'। ষষ্ঠী বিভক্তির পদ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন, 'তোহোরি কুড়িয়া' বা 'হানেরি মালী'। পুরোনো ষষ্ঠীর পদও আছে। দৃষ্টান্ত—'ক্ষণস্য' থেকে 'খণহ', 'যস্য' থেকে 'জাহ'।

ছয়। কে, কে রে বিভক্তি দিয়ে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ সাধিত হত। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় 'নাশক' অর্থাৎ নাশের জন্য, 'বাহবকে পারই' বা বাইতে পারে, 'কেহ কেহ তোহোরে বিরুআ বোলই' অর্থাৎ কেউ কেউ তোকে বিরূপ বলে।

সাত। ই, এ, হি, তে—সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ। এই ধারায় 'গৃহকে' থেকে এসেছে 'ধরে', 'হৃদয়াভিঃ' অথবা 'হৃদয়ধি' থেকে এসেছে 'হিঅহি'।

আট। রূপে এবং প্রয়োগে কারণের সঙ্গো মিল থাকায় সপ্তমীতে কোনো কোনো সময় 'এঁ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়—যেখানে ঐ 'এঁ' বিভক্তি মূলত তৃতীয়ারই চিহ্ন। যেমন 'ঘরেঁ'।

নয়। প্রধানত অধিকরণ কারকই 'তির্যক কারক' (রূপতত্ত্বগত বিচারের নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক দুটি—কর্তা বা মুখ্য কারক এবং **তির্যক বা গৌণ কারক**। প্রাচীন প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে মুখ্য কারক, ষষ্ঠী সপ্তমী মিশে গিয়ে হয়েছে গৌণ কারক। অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে সৃষ্ট নতুন বিভক্তিগুলিও তির্যক বা গৌণ কারকে ব্যবহৃত হয়।) হওয়ায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার এসে গেল। উদাহরণ 'জানে কাম কি কামে জান'—অর্থাৎ জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্ম। অথবা, 'ডোম্বীতে আগলি নাহি ছিণালী' অর্থাৎ ডোম্‌নীর থেকে বড় ছিণাল আর কেউ নেই।

দশ। পঞ্চমীতে অপভ্রংশ-জাত 'হু' বিভক্তির প্রয়োগ দু'বার পাওয়া গেছে। এইভাবে 'ক্ষেপভ্যম' থেকে এসেছে 'খেপহু' ; 'রত্নাৎ' থেকে 'রঅণহুঁ'।

এগারো। তৃতীয়া বিভক্তি, 'এঁ' সংস্কৃতের 'এন' থেকে এর সৃষ্টি। 'বেগেন' হয়েছে 'বেগেঁ' 'গজবরেন—'গজবরেঁ',

'সন্ধানেন' হয়েছে 'সন্ধানে'। চর্যার প্রায় প্রত্যেক পদেই এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। সপ্তমীর সঙ্গো এক হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে 'তেঁ', 'তে' বা 'এঁতে' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা গেল। দৃষ্টান্ত ঃ 'সুখদুখেঁতে' (সুখদুঃখ + অন্ত + এন)

বারো। আহ্মে, তুহ্মে সংস্কৃতে বহুবচন বোঝাত। প্রাচীন বাংলায় এর একবচনে ব্যবহারও হয়েছে। অবশ্য 'অহকম্' শব্দজাত 'হউ' তখন পুরো লুপ্ত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'আহ্মে দেহুঁ', অর্থাৎ আমি দিই। 'ময়েন' থেকে আসা 'মই' এবং 'ত্বয়েন' থেকে আসা 'তঁই' প্রধানত করণকারকের পদ। এখন তখন কেবল কর্মভাববাচ্যের কর্তা হিসেবেই চলিত ছিল। যেমন 'মই দেখিল'-এর উৎস সংস্কৃতের 'ময়া দৃষ্টম্'।

তেরো। কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের অর্থে বিভিন্নপদ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। উদাহরণ ঃ 'তঁইবিনু'র মূল 'ত্বয়া বিনা', 'তোহোর অন্তরে', অর্থ হ'ল—'তোর তরে', 'অধরাতি ভর কমল বিকসিউ', অর্থ—আর্ধেক রাত ধরে কমল বিকশিত হ'ল। অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঃ 'দিআঁ চঞ্চালী' অর্থ হ'ল—'চেঁচাড়ী দিয়ে'।

চৌদ্দ। ধাতুরূপের বর্তমান কালের উত্তমপুরুষে পেখমি, জাণমি, পুছমি ঃ করহুঁ, লেহুঁ, মধ্যম পুরুষে আইমসি, পুছসি, জানহ ; প্রথম পুরুষে পেখই, ভণই, চাহন্তি, কহন্তি, ভণসি, বোলসি প্রভৃতির প্রয়োগ চলিত ছিল।

পনেরো। অতীতকালে বোঝাতে প্রায় ক্ষেত্রেই 'হল' বা 'ল' এবং মধ্যম পুরুষে 'মি' 'ম' যুক্ত করা হত। উত্তম বা প্রথম পুরুষে 'ইল' বা 'ল' সাধারণভাবে নির্বিচারে ব্যবহার করা হত। যেমন 'মই দেখিল' বা 'শবরী দিল' ; 'লা' বা 'লী' যোগ করে 'বাট রুন্ধেলা', 'সোনে ভরিলী'। মধ্যম পুরুষে আছে 'অছিলেস', 'নিলেসি'।

ষোল। ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ বোঝাতে 'ইব', 'মি'—চলিত ছিল। যেমন 'করিব নিরাস', 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। মধ্যম পুরুষে যুক্ত হত 'বে', 'সি', যেমন 'যাইবে', 'মারিহসি', প্রথম পুরুষে ছিল 'ই'-এর প্রয়োগ। উদাহরণ ঃ 'করিহ', 'কহিহ' প্রভৃতি।

সতেরো। কর্মভাববাচ্যেও ক্রিয়াপদে অতীতকাল বোঝাতে 'ই', 'ইল' এবং ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে যুক্ত হ'ত 'ইব' বিভক্তি। ক্রিয়া যদি সকর্মক হত, তাহলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হত। অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি। এইরকম ক্রিয়াপদ সাধারণভাবে কর্তৃপদের বিশেষণ হিসেবেই বিবেচিত হত। অর্থাৎ কর্তা স্ত্রীলিঙ্গা হলে ক্রিয়াপদেও লাগত স্ত্রীপ্রত্যয়। যেমন 'চলিল কাহ্ন'—এর মূল হল 'কৃষ্ণঃ চলিতঃ'। অনুরূপভাবে 'অগ্নিকা লগ্না' থেকে 'লাগেলি আগ্নি'। ভাববচন (Abstract Noun) পদের সঙ্গো 'যা' ধাতুর পদ যৌগিক কর্মভাববাচ্য চলিত হয়েছিল। যেমন 'ধরণং ন জাতি' থেকে চর্যাপদের 'ধরণ এ যাই'।

আঠারো। শব্দরূপের প্রকাশে একবচন এবং বহুবচনের কোনো পার্থক্য ছিল না। বহুবচন বোঝাতে 'সকল',

'লোক', 'জাল', 'গণ' প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হত। উদাহরণ ঃ 'পণ্ডিত লোঅ', অর্থাৎ পণ্ডিত লোকেরা, 'জোইনি জাল' অর্থাৎ যোগিনীরা। অনুরূপভাবে 'সকল সমাহিঅ' অর্থাৎ সকল সমাধির দ্বারা।

উনিশ। সংস্কৃত অনুসারী সমাসবন্ধ পদও বাংলায় ছিল যথেষ্ট। যেমন 'কমলরস', 'মহাবরু', 'মোহতরু', 'কায়াতরুবর' প্রভৃতি। সংখ্যা বোঝায় এমন শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর টীকা) গ্রন্থে বেশ কিছু বাংলা তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশি শব্দ পাওয়া গেছে। যেমন 'তির্যক' থেকে আসা 'টেরা', 'পরস্ব' থেকে আসা 'পরশু'। অনুরূপভাবে 'ঝম্পান', 'তেলাকোন', 'পিম্পড়ি' প্রভৃতি।

রাজকীয় ভূমিদান পত্রেও কিছু দেশীয় নাম পাওয়া যায়। যেমন 'চবটি গ্রাম' (চট্টগ্রাম), 'কণামোটিকা' (কানামুড়ি), 'নড্‌জোলি' (নাড়াজোল) ইত্যাদি। কিছু কিছু খাঁটি বাংলা শব্দও এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আঢ়া, খিল, জাঙাল, নাল, বরজ, গাড্ডা প্রভৃতি।

অনেকেরই দাবি হ'ল যে চর্যাপদ-এর ভাষা নাকি হিন্দীরই প্রাচীন রূপ। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত হল যে চর্যাপদাবলীর এমন বেশ কিছু শব্দ বা বাক্‌ বিধির ব্যবহার আছে যার সঙ্গে আধুনিক বাংলার বিশেষ রীতি বা প্রকাশভঙ্গির মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তা দেখি', 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'সরি পড়িআঁ', 'থির করি', 'দুহিলা দুধু', 'গুনিয়া লেহুঁ' প্রভৃতি এই সমস্ত প্রয়োগবিধির দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাংলায় প্রবাদ বাক্যের সংখ্যাল্পতা ছিল না। এছাড়াও 'ইল' প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার অতীতকাল এবং 'ইব' প্রত্যয় দিয়ে ভবিষ্যৎকাল বোঝানোর ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে চর্যাপদ-এর ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষারই নিদর্শন।

18.5 মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

সামগ্রিকভাবে মধ্য বাংলার সময়সীমা আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর উপস্তর দুটি। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি মধ্যস্তর ; ১৫০০ থেকে ১৭৫০ বা আরও একটু বাড়িয়ে ধরলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ—অন্ত্য মধ্যস্তরের সীমা। প্রথম স্তরের ভাষার পরিচয় রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং তার সমসাময়িক কিছু মঙ্গলকাব্য, ভাগবতের অনুবাদে। কৃত্তিবাসী রামায়ণক্ষেত্র ধরা যায়। তবে সেখানে এত প্রক্ষেপ ঘটেছে যে আদি নিদর্শন নেই বললেই হয়। পরবর্তী স্তরের ভাষায় দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, সমসাময়িক মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, চট্টগ্রামের মুসলমানী সাহিত্য, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সবই পড়ে।

আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতা বা সাধারণ লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। আ-কারের পরে অবস্থিত ই-কার, উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দু'টি স্বরধ্বনির অবস্থান। যেমন বড়াই—বড়া^{ই} ; আউলাইল—আ^{উ}ল^{ই}ল।

দুই। মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতার ক্ষীণতা বা লুপ্তি। এইভাবে 'কাহ্ন' হয়েছে 'কান', 'আহ্মি' হয়েছে 'আমি'।

তিন। চর্যাপদে বহুবচন সৃষ্টিতে জাল, ভাগ, সমূহ, কুল প্রভৃতি যুক্ত হত। 'রা' শব্দ যোগে বহুবচনের ব্যবহার বা প্রয়োগ এই সময়ে শুরু হ'ল। যেমন, 'আহ্মারো', 'তোহ্মারা'।

চার। 'ইল' শেষে আছে এমন অতীতের এবং 'ইব' শেষে আছে এমন ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার শুরু হ'ল। দৃষ্টান্ত ঃ 'মো শুনিলোঁ' (অর্থাৎ আমি শুনলাম), 'মো দেখিলোঁ, 'মো করিবোঁ', 'মো নাসিবোঁ' প্রভৃতি।

পাঁচ। প্রাচীন (ইঅ) বিকরণ সমন্বিত কর্মভাববাচ্য ক্রমশ অচলিত হয়ে এল। যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য তৈরি হওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে 'যা' ও 'ভু'-ধাতুর সাহায্যে। যেমন ততকে মুঝাল গেল মোর মহাদানে', 'সে কথা কহিল নয়।'

ছয়। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গো 'আছ্' ধাতু যোগ করে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হল। যেমন—লই + আছে = লইছে, রহিল + আছে = রহিলছে।

সাত। আভিমুখ্য এবং প্রাতিমুখ্য বোঝাতে 'সিয়া' (অর্থাৎ এসে এবং গিয়া) যথাক্রমে মূল ক্রিয়ার সঙ্গো অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ দেখ সিয়া—দেখ সে, দেখ গিয়া—দেখ গে প্রভৃতি।

আট। চর্যায় ছন্দ ছিল মাত্রামূলক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। ফলে ষোলো মাত্রার পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা থেকে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের বিকাশ ঘটল।

18.5.1 অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

এক। অন্ত্যস্বরের লোপ (apocope) এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা এসে গেল। পদের শেষে একক ব্যঞ্জনের পরের যে অ-কার তা লুপ্ত হ'ল। দৃষ্টান্ত—রাবণ, টোপর, দাম, ঘাম, জল, ভাত্ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন শক্ত, ভক্ত, গোবিন্দ প্রভৃতি। শুধু অন্ত্যস্বর নয়, মধ্যস্বরের লুপ্তিও একালের ভাষাকে সরল করে তুলেছে। যেমন—গাম্ছা, রান্না, অপ্রাজিত প্রভৃতি। ফলে দ্বিমাত্রিকতার ব্যবহার এসে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক। তাই হয়েছে।

দুই। **অপিনিহিতি এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের পরিবর্তন অভিশ্রুতি** এই পর্বেই দেখা দিল। এগুলি আধুনিক সময়ের ভাষারই বৈশিষ্ট্য। তবে তা দেখা দিয়েছে এই পর্বেই। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের ক্রমরেখাটি এইরকম ঃ

কালি—কাইল, চারি—চাইর, মারি—মাইর।

কালি—কাইল—কাল, বানিয়া—বন্যা—বেনে, আকুল—আউল—এলো, জলিয়া—জাল্যা—জোল প্রভৃতি।

অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত উ হয়েছে ই ; পরে এই 'উ' ধ্বনিও লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'ধাতু'—ধাউত—হয়েছে চেল। সন্ধি অথবা লুপ্তির পর অভিশ্রুতি হয়েছে। 'করিয়া' হয়েছে কইরা—ক'রা—কর্যা—কোরে। এইরকম খাইয়া—খেয়ে, পাত্তিয়া—পেতে।

তিন। সাধু এবং চলিত ভাষায় ঢ়, ন্হ ও ম্হ—এইসব মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'বুঢ়া' হয়েছে বুড়া, 'কাহ্ন'—কান, 'আম্মর'—আমার, 'আম্মি'—আমি।

চার। 'ইআ' হয়েছে এ্যা অথবা এ। 'উআ' হয়েছে 'ও'। যেমন 'বনিয়া' হয়েছে 'বন্যা', তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'বেনে' শব্দটি। অনুরূপভাবে 'সাথুয়া' হয়েছে, সেথো, 'জালিয়া'—জেলে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট।

পাঁচ। বিশেষ্য কর্তার বহুবচনে রা, নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি বিভক্তি এবং তির্যক কারকের বহুবচনে দি, দিগ, দে বিভক্তির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দেখা দিয়েছিল।

ছয়। ইল, ইব যথাক্রমে অতীতে ও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। অতীতে এগুলি যুক্ত হত কর্মবাচ্যে। যেমন 'মই করিল', 'মুই করিলাঙ্‌', 'তেঁ করিব', 'সে করিবে' ইত্যাদি।

সাত। 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিককালের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল। যেমন 'আসিছি', 'আসিতেছে', 'আসিয়াছিল' প্রভৃতি।

আট। কোনো একটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার না করে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে—ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ পরবর্তীকালের সংস্কৃতের লক্ষণ। 'নৃত্যতি' ব্যবহার না করে 'নৃত্যং করোতি', 'গমনং করোতি', দর্শনং করোতি' প্রভৃতি হ'ল এর উদাহরণ। এই ব্যবহার অপভ্রষ্ট-অবহট্‌ঠের মধ্যে দিয়ে বাংলায় চলে এল। অন্ত্য-মধ্য পর্বের সাধু বাংলায় এর ব্যবহার অনেক তদ্ভব ধাতুকেও অচলিত করে দেয়। যেমন—ভ্রমণ করে, শ্রবণ করে প্রভৃতি। এমনকি পালি-পর্বে ব্যবহার শুরু হয়েছিল এমন সব নতুন বিকরণ দিয়ে ধাতুগুলি নতুন রূপ লাভ করে। সংস্কৃত 'জিনাতি' থেকে সৃষ্ট 'জিনা', 'জিনিল', 'জিনিবে'। 'উপবিশিতি'—'বসে', 'নিবর্ততে'—'নেওটা', 'বুলা' অর্থ চলে বেড়ানো, 'গোড্ড' এই দুই দেশি ধাতু থেকে এসেছে 'গোড়া' ; অর্থ হ'ল—পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুগমন করা।

নয়। সংস্কৃত শব্দকে নামধাতু হিসেবে প্রয়োগের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন 'নিমন্ত্রিয়া', 'কাতরিয়া', 'প্রণমিলা', 'অগ্রসরি', 'প্রবর্তিতে' প্রভৃতি।

দশ। প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফারসি, কিছু তুর্কি এবং শেষদিকে পোর্তুগিজ শব্দও অন্ত্য-মধ্যস্তরের বাংলায় চলে এসেছে। কমবেশি আড়াই হাজারের মতো ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবে।

এগারো। অবহট্‌ঠ এবং প্রাচীন মৈথিলী থেকে আসা ব্রজবুলি ভাষা এই পর্বের বাঙালি লেখকেরা রীতিমতো অনুশীলন করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব মহাজন কবিরা এ ব্যাপারে প্রকৃত সাফল্য দেখিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার অনুশীলন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অসম এবং বাংলাদেশেই বেশি হয়েছে। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু এসে গেছে।

বারো। অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষায় লিখিত এবং মুখের ভাষার মধ্যে তেমন কোনো রীতিসম্মত পার্থক্য ছিল না। এ দু'য়ের মিশ্রণ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন।

18.6 আধুনিক বাংলার লক্ষণ

আধুনিক বাংলার সূচনা মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে। এই সময় থেকেই সাহিত্যসৃষ্টিতে 'সাধু' ভাষার ব্যবহারও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

সংক্ষেপে এই পর্বের ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। লিখবার ভাষা মুখের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সাধুভাষা হিসেবে সাহিত্যের একমাত্র বাক্‌রীতির আকার নিয়েছে। অন্ত-মধ্য পর্বের বাংলায় লিখবার ভাষা এবং কথ্য ভাষায় যে মিশ্রণ আমরা লক্ষ করেছি, এখন তা আর থাকল না।

দুই। অন্ত্য-মধ্য পর্বে অপিনিহিত স্বরধ্বনি অভিশ্রুত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। স্বরসঙ্গতিও হয়েছে। যেমন 'হাটুয়া'—'হোটো', 'নাটুয়া'—'নেটো', 'মাধব'—'মেধো' প্রভৃতি। অপিনিহিতি না ঘটলেও পাশাপাশি অবস্থিত স্বর পরিণত হয়েছে একস্বরে। 'আকুল' হয়েছে 'এলো।' যেমন 'এলো কেশ'। এই পর্বে স্বরসঙ্গতি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। যেমন—জলো, গেছো, মেছো, পটো ইত্যাদি অজস্র দৃষ্টান্ত।

তিন। নিজন্ত ধাতুর অর্থ অনিজন্ত হয়ে গেছে। যেমন, 'পেলা', 'ফেলা' বা 'পৌছায়' প্রভৃতি ধাতু।

চার। সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যেমন—দান করা, পান করা, আহার করা, উপবেশন করা, ভ্রমণ করা প্রভৃতি। নামধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ সাধু এবং চলিত দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ঘটেছে।

পাঁচ। নঞর্থক 'ন' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্যপর্বের বাংলায় ক্রিয়াপদের আগে ছিল। যেমন 'আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে'। আধুনিক বাংলায় এর প্রয়োগ হ'ল ক্রিয়াপদের পরে। তবে কবিতায় পুরোনো রীতি একেবারে বাদ পড়েনি। মধুকবির কাব্যে এর বিশেষ প্রয়োগ আছে। সম্ভাবক ভাবেও পুরোনো প্রয়োগ বিদ্যমান। যেমন—'সে না শোনে, না শুনবে' বা 'না করল তো না করল বয়েই গেল'।

ছয়। সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন—রমেন সেখানে গেল। সে দেখল। সে অবাক হ'ল। এই তিনটে বাক্য না লিখে লেখা হল—'রমেন সেখানে গিয়ে দেখে অবাক হল।'

সাত। অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে ভাববাচক শব্দের সঙ্গো 'পূর্বক' বা 'করতঃ' যোগ করে। যেমন—গমনপূর্বক, গমনকরতঃ, দর্শনপূর্বক, দর্শনকরতঃ প্রভৃতি।

আট। পদের ও বাক্যের সংযোগ সাধনে ফারসি অব্যয় 'ও' (ফারসি 'ব' জাত)-এর প্রয়োগ 'এবং'-এর সঙ্গোই রয়েছে। যেমন—'নারী ও পুরুষ', 'সে সেখানে গেল ও দেখল'। সংস্কৃত 'অপি' থেকে সৃষ্ট অব্যয় 'ও' শব্দের সজ্ঞা—চলতে লাগল। যেমন সোহপি—সেও।

নয়। গদ্যরীতির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা হ'ল। শুধু তাই নয় এর প্রসারে পুরনো পদ্যরীতি ম্লান হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকেই এর ফলে সাহিত্যের বোধ ও সীমা প্রসারিত হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হ'ল এই পর্বেই। সাহিত্যিক গদ্যকারের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এর পলে আমাদের যে গদ্যের পত্তন হল তা অবশ্যই পণ্ডিতী রীতির। তৎসম শব্দের বাহুল্যও তাই এতটা। তবে এও বিশেষভাবে বলবার যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, সেই সূত্রে ব্যবসায়িক নানা প্রয়োজনে ওলন্দাজ (হল্যান্ডের অধিবাসী), ফরাসি ইত্যাদি জাতির সঙ্গে সংযোগ—সম্পর্ক নিবিড় হওয়ায় ইংরেজি সমেত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ আইন-আদালত বা প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলায় গৃহীত হতে থাকল। কাজকর্মে ফারসি শব্দের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসতে থাকল। সে জায়গায় ছায়া দীর্ঘ হ'ল ইংরেজি, শেষ পর্যন্ত তার প্রভাবই যেন একমাত্র। এর কারণ অবশ্য ইংরেজের রাজনৈতিক আধিপত্য। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

18.7 সারাংশ

প্রথমে বাংলা ভাষার কাল বিভাজন। চর্যাপদ-এর বাংলা ভাষা থেকে আরম্ভ করে আদি-মদ্য এবং অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরে রয়েছে আধুনিক বাংলা ভাষার বিবরণ, যার পরিণতিতে গদ্যভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ।

18.8 অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) 'চর্যাপদ' ছাড়াও আর কোথাও কোথায় প্রাচীন বাংলার নিদর্শন আছে?

(খ) প্রাচীন বাংলায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ দিন।

(গ) 'চর্যাপদ' যে প্রাচীন বাংলাই তার অব্যর্থ লক্ষণ কী?

(ঘ) মধ্য বাংলার দুটি উপস্তরের উল্লেখ করুন।

(ঙ) আধুনিক বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ কী?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন বাংলার অন্তত দশটি সাধারণ লক্ষণের পরিচয় দিন।

(খ) আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) আধুনিক বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

18.9 গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৪. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। (১ম ও ২য়)।

৫. ড. জীবন্দেু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একক 19 ❐ আধুনিক বাংলা উপভাষা

গঠন

19.1 উদ্দেশ্য

19.2 প্রস্তাবনা

19.3 আধুনিক বাংলা উপভাষা

19.3.1 রাঢ়ি উপভাষা

19.3.2 ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

19.3.3 বরেন্দ্রী উপভাষা

19.3.4 বঙ্গালী উপভাষা

19.3.5 কামরূপী উপভাষা

19.4 সারাংশ

19.5 উত্তরমালা

19.6 গ্রন্থপঞ্জি

19.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- সাধারণভাবে বাংলা উপভাষাগুলি সম্বন্ধে পরিচিত হবেন।
- প্রতিটি উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আপনার ধারণা তৈরি হবে।

19.2 প্রস্তাবনা

বাংলা উপভাষাগুলির নাম, স্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর প্রত্যেকটি উপভাষার লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথোচিত বিস্তৃতিসহ আলোচনা করা হয়েছে।

19.3 আধুনিক বাংলা উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দু'য়ে মিলে যে বাংলাভাষী বঙ্গভূমি তার প্রধান উপভাষা মোট পাঁচটি। এই বিভাজন অঞ্চলভিত্তিক। এর মধ্যে মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূমকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চলটি বিস্তৃত তার

উপভাষার নাম রাঢ়ি। এই বৃত্তের মধ্যে আছে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষার নাম **ঝাড়খণ্ডি**। এর মধ্যে রয়েছে মেদিনীপুর সীমান্ত, বর্তমান পুরুলিয়া, ধানবাদ এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চল। **বরেন্দ্রী** হ'ল উত্তরবঙ্গের উপভাষার নাম। মালদহ, দিনাজপুরের কিছুটা, রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া এর অন্তর্গত। পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর থেকে বরিশাল পর্যন্ত অংশের উপভাষা হ'ল **বঙ্গালী**। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়-ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম—কার্যত এই সমস্ত অংশটাই এর পরিসীমার মধ্যে চলে আসে। **'কামরূপী'** উপভাষার মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দার্জিলিং, দিনাজপুরের কিছুটা, কোচবিহার, রংপুর, ধুবড়ী এবং পশ্চিম গোয়ালপাড়ার অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষের ভাষা।

একথা বলতেই হয় যে একই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ অবিকল একই রকম কথা বলেন না। বর্ধমান, বীরভূম এবং নদীয়ার সকলেই রাঢ়ি ভাষাই বলেন, কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে কমবেশি পার্থক্য আছে। ঢাকা জেলা বঙ্গালী ভাষা বলে আবার ফরিদপুর বরিশালও বলে। কিন্তু তা তো এক নয়। একইভাবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া জেলা একই উপভাষার অন্তর্গত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। আসলে বাইরের সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐক্যের কল্পনা করা হয়েছে। ঐক্যটা মিথ্যে নয়। কেননা সূক্ষ্ম প্রভেদ সত্ত্বেও প্রত্যেকটি উপভাষা গোষ্ঠীর ভিতরকার মিলও যথেষ্ট।

19.3.1 রাঢ়ি উপভাষা

(ক) রাঢ়ি উপভাষায় যে জিনিসটি প্রথমেই লক্ষ করবার তা হ'ল অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন। দৃষ্টান্ত ঃ শুনিয়া—শোনে, রাখিয়া—রেখে। এই ধরনের পরিবর্তন এ ভাষার প্রধান বিশেষত্ব। যেমন ঃ দেশী—দিশি, বিলাতি—বিলিতি, মিছা—মিছে প্রভৃতি। উচ্চারণে 'অ'-কারের 'ও'-কার প্রবণতাও বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও বানা অ-ই লেখা হয়। যেমন ঃ অতি—ওতি, অতুল—ওতুল, লক্ষ্য—লোক্‌খো, দৈবজ্ঞ—দৈবোগ্‌গোঁ।

(খ) চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ রাঢ়ি উপভাষায় খুব স্পষ্ট। এতটাই যে, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্তি চন্দ্রবিন্দুও যুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ হাঁসি, কাঁনা, ঘোঁড়া, বেঁজি প্রভৃতি। এই অতিরিক্ত চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বেশি শুনতে পাওয়া যায় মানভূম-বাঁকুড়ার সীমান্ত অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে এবং বীরভূম-বর্ধমানের সীমানায়।

(গ) শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ায় অনেক সময় পদের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা থাকে না। যেমন ঃ দুধ—দুদ্, মধু—মদু। কোনো কোনো সময় অবশ্য অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। ফলে 'কাক' হয়ে যায় 'কাগ', 'শাক'—'শাগ'।

(ঘ) বহুবচন বোঝাতে বেশিরভাগ সময়ই 'দের' ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবুদের বাবুয়ানি, মেয়েদের রকম সকম প্রভৃতি। গৌণকর্ম সম্প্রদানে এবং অধিকরণ কারকে যথাক্রমে 'কে', 'তে', 'এ' ও 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন ঃ দেবাইকে বল কলেজে যেতে, চুবাই এ বাড়িতে নেই, চুমকি ছাদে দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি।

(ঙ) অতীতকালের প্রথম পুরুষে অকর্মক এবং সকর্মক দুটি ক্রিয়াপদই 'ল' বা 'লে' যুক্ত হয়। যেমন ঃ সে টাকা দিল, সে ছেলেটাকে অনর্থক মারলে। সে পেট ভরে খিঁচুড়ি খেল বা খেলে।

(চ) লুম্, নু, লম্ যোগ করে উত্তম পুরুষের পদ গঠন। যেমন ঃ দেখলুম, দেখনু। লুম্, লাম-এর সবরকম প্রয়োগই এই উপভাষায় আছে।

(ছ) যৌগিক ক্রিয়াপদের সম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ইয়া' এবং অসম্পন্ন কালের পদ গঠন করতে 'ই' অন্ত অসমাপিকা ব্যবহার করে বোঝানো হয়। যেমন ঃ বলিয়াছে-বলেছে, বলিতেছিল-বলছিল, বলিয়াছিল-বলেছিল ইত্যাদি।

19.3.2 ঝাড়খণ্ডি উপভাষা

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আনুনাসিকের প্রাচুর্য। যেমন—'মুশাই চাঁ মিলবেক', 'বাঁলতিটো রাখ'।

(খ) 'কে' বিভক্তি দিয়ে অনুসর্গহীন গৌণকর্ম বোঝানো। যেমন ঃ 'ঘাসকে গেল্ছে', 'দোকানকে চল', 'জলকে চল'।

(গ) নামধাতুর বিচিত্র প্রয়োগ। যেমন ঃ 'পুঁথুরের জলটা গাধাচ্ছে' ? 'দিনকে বড় দগ্ধাচ্ছে'।

(ঘ) পদের মধ্যেকার অল্পপ্রাণবর্ণের মহাপ্রাণতা প্রাপ্তি। যেমন ঃ 'পুকুর' হয়েছে 'পুথুর' 'দুপুর'—'দুফুর', 'বিকেল'—'বিখেল'।

(ঙ) যুক্ত ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর জায়গায় 'বট্' ধাতুর ব্যবহার। যেমন 'করিবটে' অর্থ হল—করছে।

(চ) 'ও'-কারের জায়গায় 'অ'-কার উচ্চারণের প্রবণতা। যেমন ঃ 'চোর'-এর উচ্চারণ 'চর', অথবা 'লোক'—'লক'।

(ছ) অপিনিহিতি অথবা বিপর্যাসের ফলে অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত ধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ 'রাইত', সাঁঝি—'সাঁইঝ'।

(জ) 'লে' হল পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' এখানে 'চেয়ে'র পরিবর্তন 'লে'-র ব্যবহার হয়েছে।

(ঝ) সম্বন্ধ পদ বিভক্তিহীনতা। যেমন—'ঘাটশিলা শাড়ি কুনি মনে নাই লাগে'। অর্থ হ'ল—'ঘাটশিলার শাড়ি কুনির পছন্দ হয়নি'। দেখবার যে 'নাই' এই নঞর্থক অব্যয়টি মূল ক্রিয়ার আগে বসেছে। এই প্রয়োগবিধি এ উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ঞ) অধিকরণে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন ঃ 'রাইতকে' (রাতে)।

19.3.3 বরেন্দ্রী উপভাষা

(ক) রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী প্রথমে এই উপভাষা দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। পরে একদিকে বঙ্গালী,

অন্যদিকে বিহারীর প্রভাবে বরেন্দ্রী রাঢ়ির থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই কারণেই বরেন্দ্রী স্বরধ্বনির উচ্চারণে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। সানুনাসিক ধ্বনির ব্যবহারও পর্যাপ্ত। পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণধ্বনি বজায় আছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(খ) অনেক সময় 'জ' ধ্বনি ইংরেজি Z ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ কাজে কাজেই—'কাZ কাZ ই' ; 'হাজার'—'হাZার' প্রভৃতি।

(গ) শব্দের আগে 'র'-এর জায়গায় 'অ' এবং 'অ'-এর জায়গায় 'র'-এর আগম লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ আমের রস—'রামের অস্', রামবাবুর আমবাগান—'আমবাবুর রামবাগান'।

(ঘ) শব্দ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রীর সঙ্গে রাঢ়ির কোনো ভিন্নতা নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন চর্যাপদে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। অতীতকালে উত্তর পুরুষে বরেন্দ্রীতে 'লাম্'-এর ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

(ঙ) বহুবচনের বিভক্তি 'গুলি', 'গিলা' এবং তির্যক কারকে বহুবচনে বিভক্তি 'দের'। গৌণকর্মে 'কে' এবং 'ক' বিভক্তি, অধিকরণ কারকে 'ৎ' বিভক্তি। যেমন 'ঘরৎ যাও'।

19.3.4 বঙ্গালী উপভাষা

বঙ্গালী উপভাষা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত। বৈচিত্র্য এত বেশি যে এদের দুটো গুচ্ছে বিভক্ত করাই সঙ্গত। প্রথম গুচ্ছে পড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নদীয়ার অংশবিশেষ এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট। অন্য গুচ্ছে রয়েছে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছাড় ও পূর্ব শ্রীহট্ট। কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ অবশ্য থেকেই যায়।

(ক) বঙ্গালীতে স্বরধ্বনির পুরোনো প্রকৃতি অনেকটাই রক্ষিত। 'অ'-কারের 'ও'-র উচ্চারণ প্রবণতা নেই। তবে ও-র জায়গায় 'উ' এবং 'এ'-র জায়গায় 'অ্যা' উচ্চারণের প্রতি ঝোঁক অবশ্যই লক্ষ করার মতো। যেমন ঃ দেশ—দ্যাশ, মেঘ—ম্যাঘ প্রভৃতি।

(খ) অপিনিহিতের বাহুল্য লক্ষণীয়। তা চলে আসছে মধ্য বাংলা থেকেই। যেমন ঃ আজি—আইজ, কালি—কাইল, হাটিয়া—হাইট্যা। যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে বিশেষ করে ক্ষ, হ্ম, য-ফলা ইত্যাদির আগে 'ই'-ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন ঃ রাক্ষস—'রাইকক্ষস্', ব্রাহ্ম—ব্রাইহ্ম। বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি নেই।

(গ) বঙ্গালীতে সানুনাসিক স্বরধ্বনির অস্থানে আগম তো নেইই, উপরন্তু স্বস্থানে অবস্থিত ঐ ধ্বনিও লুপ্ত। যেমন ঃ চন্দ্র বা চাঁদ—চাদ, কন্টক/কাঁটা—কাটা, পঞ্চ/পাঁচ—পাচ, হংস/হাঁস—হাস, বাঁশ—বাশ, বাঁধন—বাধন, দন্ত/দাঁত—দাত। শ্বাসাঘাতেরও কোনো নির্দিষ্ট স্থান বঙ্গালী উপভাষায় নেই।

(ঘ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'ভাত' হয়েছে 'বা'ত', 'ঘা'—'গা', 'ভয়'—'বয়', 'বিড়ি'—'বিরি'। 'হ'-কারেরও মহাপ্রাণতা নেই বা কণ্ঠনলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'হাতি' হয়েছে 'আত্তি', 'হাটু' হয়েছে 'আঠু', 'ফলাহার'—'ফলার', 'পুরোহিত'—'পুরুত'।

(ঙ) শব্দরূপে লক্ষণীয় হ'ল কর্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির যোগ। যেমন ঃ 'মারে কইছে', 'বাবায় আইছে', 'দাদায় কইলো' ; গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি—'দেবাইরে দাও' ; করণ কারকে 'এ' বিভক্তি ছাড়াও 'দিয়া, সাথে, লগে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। অপাদানে 'থে', 'থিকা' প্রভৃতি। অধিকরণে ব্যবহৃত বিভক্তি হ'ল 'এ', 'ৎ'। সাধারণভাবে সপ্তমীতে 'তে' বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার। যেমন ঃ বাড়িতে, হাতেতে, জলেতে ইত্যাদি।

(চ) লুম্, লম্, বা নু-র মতো উত্তম পুরুষে অতীতকালে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ বঙ্গালীতে নেই। সেখানে কেবল 'লাম্'-এর ব্যবহার। যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার কিছুটা রাঢ়ির উল্‌টো। যেমন ঃ 'ই' এই অসমাপিকা দিয়ে সম্পন্ন কালের এবং সাধুভাষার মতো 'ইতে' শেষে আছে এমন অসমাপিকা দিয়ে অসম্পন্ন কালের পদ হয়। যেমন ঃ 'বলিয়াছি', রাঢ়িতে হয় 'বলেছি'—বঙ্গালীতে 'বলছি (স)' (Bolsi) আমি করেছি—কইর্‌ত্যাছি' (Koirtasi)। আমি করিতেছি। সামান্য বর্তমান ঘটমানের (Present Continuous) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ 'ছেলে ডাকে', অর্থ—'ছেলে ডাকছে'।

(ছ) একমাত্র কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন ঃ 'আমাগো করতে দিবা না ?' (আমাদের করতে দেবে না ?)

(জ) উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি 'উম্' এবং 'মু'। যেমন ঃ 'আমি খেবল' অর্থে 'আমি খেলুম্'। 'আমি যামু' অর্থাৎ 'আমি যাব'।

(ঝ) বঙ্গালী উপভাষা মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হ'ল 'বা'। যেমন ঃ 'তুমি খাবা না' ?

(ঞ) রাঢ়িতে অতীতকালে ব্যবহৃত হয় নঞর্থক প্রত্যয় 'নি', যেমন ঃ 'তুমি যাও নি' ? এখানে তার বদলে 'নাই'—যেমন ঃ 'তুমি যাও নাই' ?

বঙ্গালীর প্রধান বিভাষা চট্টগ্রামী। এতে উচ্চারণে, পদ প্রয়োগে, শব্দ ও ধাতুরূপে বঙ্গালীর সঙ্গেও অনেক পার্থক্য। অনুনাসিক বর্ণের ব্যবহার, ক বা প ইত্যাদির খ, ফ-তে পরিণত হওয়া চট্টগ্রামী ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ কালীপূজা—'খালি ফুজা'। '**চাক্‌মা**' ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামী সম্পর্ক আছে।

19.3.5 কামরূপী উপভাষা

(ক) কামরূপী বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালীর মাঝামাঝি। প্রথমটির মতো পদের প্রথমেই কেবল ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ রয়েছে। শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। আবার বঙ্গালীর মতো রয়েছে অনুনাসিক বর্ণের লোপ প্রাণতা। অপিনিহিতির স্থিতি। অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতির অনুপস্থিতি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই কামরূপী-র সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কাছের।

(খ) কামরূপী-তে চতুর্থ বর্ণ পদের প্রথমে বজায় থাকে। অন্য ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায়। যেমন—ড়-র, ঢ-র্‌হ। এর ব্যতিক্রমও আছে। 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ড. নির্মল দাশ দেখিয়েছেন কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' বদলে যায়নি। যেমন—'বাড়ির'।

(গ) চ, জ, স বা শ যথাক্রমে ৎম (ৎসামড়া), জ (x) হ।

(ঘ) শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(ঙ) গৌণকর্ম সম্প্রদানে 'কে' এবং অধিকরণে 'ত' বিভক্তি। যেমন—'ঘরকে গেলাম', 'বড়িত্ যাব' (বাড়িতে যাব)।

(চ) বহুবচন বিভক্তি 'বা' শেষে আছে এমন পদটি শব্দরূপে তির্যক কারক হয়ে সম্বন্ধ বিভক্তি গ্রহণ করে, যেমন ঃ 'আমররার', 'তোম্‌রার' প্রভৃতি।

(ছ) নিত্যবৃত্ত অতীতের ভবিষ্যৎ অর্থে প্রয়োগ কামরূপীয় লক্ষণ। যেমন ঃ 'খাইতাম না'—খাব না, 'যাইতাম না'—যাব না। এছাড়াও আছে যাইবাম, করবাম প্রভৃতি।

(জ) 'ও'-কে 'উ'-র মতো উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তবে সবক্ষেত্রে নয়। যেমন ঃ তোমার > তুমারর, কোন > কুন্। গোয়ালপাড়ায় 'কোন' উচ্চারণই—চলিত আছে।

(ঝ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হ'ল 'নু'। যেমন 'কনু'—অর্থাৎ 'করলাম'।

(ঞ) 'ইল' সদ্য অতীতে প্রথম পুরুষের বিভক্তি, যেমন—ধরিল (ধরল)।

(ট) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি 'ক', যেমন 'বাপের'—এই বোঝাতে 'বাপো'র।

(ঠ) উত্তম পুরুষের একবচনে 'মুই' 'হাম' প্রভৃতি সর্বনামের প্রয়োগ দেখা যায়।

আরও কিছু বিশিষ্টতা। যেমন 'ছেলে' অর্থে 'পুত', 'পুতাইন' ছাড়াও আরবি শব্দ 'আবু'-র প্রয়োগ আছে। হাতে পাওয়া অর্থে 'লগেইল পাওয়া'। চুপ করে থাকা অর্থে 'টিপ্'—'টিপ্ মাইরা বইসা থাক'। স্পন্দন নেই বোঝাতে 'ঝিম্', লাগি অর্থে 'উষ্ট', 'ঝাঁটা' বোঝাতে 'হাচুন' প্রভৃতি।

19.4 সারাংশ

বাংলায় উপভাষার সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ। পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই মিলেই তার পরিধি। রাঢ়ি, ঝাড়খণ্ডি, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী এবং কামরূপী উপভাষার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ এই আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলা উপভাষা সম্পর্কে একটি সার্বিক পরিচয় লাভ করবেন।

19.5 অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কয়েকটি বাংলা উপভাষার নাম করুন।

(খ) রাঢ়ি উপভাষার অভিশ্রুতির কয়েকটি উদাহরণ দিন।

(গ) ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় নামধাতু প্রয়োগের উদাহরণ দিন।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষায় ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণের অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হওয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাঢ়ি উপভাষার প্রধান লক্ষণগুলির উল্লেখ করুন।

(খ) দৃষ্টান্তসহ বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কামরূপী উপভাষার প্রধান লক্ষণ কী কী ?

19.6 গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ODBI (অংশবিশেষ)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৩. পার্বতী ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা।

৪. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৫. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৬. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

একক 20 ☐ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

গঠন

20.1 উদ্দেশ্য

20.2 প্রস্তাবনা

20.3 সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

20.4 সারাংশ

20.5 উত্তরমালা

20.6 গ্রন্থপঞ্জি

20.1 উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে আপনি—

- বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার উদ্ভব ও প্রয়োগবিধির সাধারণ সূত্রগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

20.2 প্রস্তাবনা

বাংলায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার কীভাবে সৃষ্টি হ'ল, তার সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাংলা গদ্যে, বিশেষ করে দুটি ধারা কীভাবে কেন তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানে কোন ধারাটির অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়েছে সে ইঙ্গিতও এখানে রয়েছে।

20.3 সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষার পার্থক্য নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। এর কারণ হ'ল লিখবার ভাষা উপস্থিত, নিকট দূর প্রত্যেকের জন্য। মুখের ভাষা কেবল উপস্থিত জনের জন্যই ব্যবহৃত। পরিসর বড় বলে লেখার ভাষার শব্দভাণ্ডার সুবৃহৎ। তাছাড়া লিখবার ভাষায় ওতপ্রোত মিশ্রিত জড়িত থাকে বহুকাল ধরে চলা ঐতিহ্যের ব্যাপারটি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা ভাষায় দু'টি আদর্শই বিদ্যমান। একটি হ'ল সাধুভাষা, অন্যটি চলিতভাষা। মুখের ভাষার সঙ্গে লিখবার ভাষায় দূরত্ব আছে। তবে দূরত্বের হেরফের আছে। সাধু-তে বেশি, চলিত-এ কম।

সাধারণভাবে আমরা তিন ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করে থাকি। একটি লিখবার, একটি শিষ্ট কথ্যভাষার, অন্যটি উপভাষার। বাংলার মতো ভাষা, যেখানে কমবেশি পাঁচটি উপভাষা আছে, সেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লেখাপড়ায় ব্যবহারের যে ভাষা তার মূলে থাকে বিশেষ একটি উপভাষা। অন্য উপভাষার শব্দ বা বাকবিধিতে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসুবিধে নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি উপভাষারই প্রাধান্য ঘটে। সে ভাষা যদি রাজধানীর ভাষা হয়, লেখক-সাহিত্যিক যদি সেই ভাষাতেই লেখেন তাহলে এমনটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে

থাকে। কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষার যে স্বর্ববাদি সম্মত প্রতিষ্ঠা ঘটল তা এই কারণেই। তবে অন্য উপভাষার ছাপ যে ভাষায় কিছুমাত্র পড়েনি সে কথাও অসঙ্গাত। ড. সুকুমার সেন-এর মতো ভাষাবিদের বক্তব্য হল যে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁদের লেখায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপভাষার ছাপ পড়েছে। আমাদের ধারণা, মুখে ব্যবহৃত 'করছি' পদের সাধুরূপ হল 'করিতেছি'। এটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের উপভাষার পদ।

বাংলা ভাষার একেবারে প্রথম পর্বে লেখার ও মুখের ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য কিছু ছিল না। সামান্য যা কিছু তা তৎসম শব্দাশ্রয়ী, প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ পদ ও বাগ্‌ধারার সীমিত প্রয়োগ নির্ভর। তখন অপভ্রষ্ট-এর সঙ্গেই বাংলার সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। চর্যার কোনো কোনো পদকার এ ভাষায় পদও রচনা করেছিলেন। সরহ এ রকম একজন পদকার।

মধ্য বাংলায় কথ্যভাষা সাহিত্যসৃষ্টির থেকে অবশ্যই পার্থক্য বজায় রাখছিল। সে সাহিত্য ছন্দোবন্ধ রচনা, সাধারণ মানুষ এর লক্ষ্য এবং উপভোক্তা। মুখে ভাষাও সেখানে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। ছন্দের স্বার্থেই সাহিত্যের ভাষায় পুরানো নতুন শব্দ পদ বা বাগ্‌ধারায় পর্যাপ্ত ব্যবহার হ'ত। সাধুভাষা আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে সূচনা পর্যন্ত মুখের ভাষা এবং সাধুভাষায় বিরাট কোনো ভিন্নতা কিছু ছিল না। মুখের ভাষায় স্বরধ্বনিতে বিশেষ করে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার ভিন্নতা। ভিন্নতার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা শক্ত। ছন্দের দরকারেও মুখের ভাষার প্রবেশ ছিল নির্বাধ। সবচেয়ে বড় কথা মুখের ভাষা কেমন ছিল তারও কোনো নিদর্শন কিছু রক্ষিত নেই। দলিল-দস্তাবেজে সংস্কৃত এবং ফারসিরই অবারিত বিকার।

সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাংলা এবং বর্তমান সাধুভাষার সম্পর্ক যে কত নিবিড় ভাষাবিদেরা তা দেখিয়েছেন। যেমন ঃ

> 'এ সব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
> সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে॥'

বা,

> 'দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
> কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥'

এইরকম উদাহরণ অজস্র।

সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে। পণ্ডিত এবং ফারসি জানা মুন্‌শিদের হাতে। তাঁরা সকলের কাছেই বোধ্য একটি সাধারণ লিখবার ভাষা তৈরি করতে যত্ন নিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপরেই এঁরা নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'বেদান্তগ্রন্থ'-এ রামমোহন 'সাধুভাষা' শব্দটির সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ মানুষদের ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি **সাধুভাষা** বলে বিশেষিত করেছিলেন। এর পাশে মুখের ভাষার নাম ছিল **'অপরভাষা'**। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাংলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা অপরটির নাম 'অপর ভাষা একটি লিখিবার ভাষা দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম

ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাংলা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সহিত যুক্ত হইত।...অপর ভাষা সেদিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।" বঙ্কিম পরিষ্কার ভাবেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, সংস্কৃতাশ্রয়ী সাধুভাষার অবিরাম লেখন ও অনুশীলনের ফলে বাংলা গদ্য যে ব্যাকরণ ও অভিধাননির্ভর হয়ে কিছুটা জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিল এ কথা ঠিক। মুখের ভাষাকে লেখার মধ্যে আনবার চেষ্টা এরই প্রতিবিধানকল্পে। প্যারীচাঁদ বা কালীপ্রসন্ন সিংহরা এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে স্বয়ং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর পুরুষেরা এগিয়ে আসেন। উপভাষার গণ্ডী পার হয়ে কলকাতার ভাষাই অতঃপর হয়ে উঠল সর্বজনসম্মত শিষ্ট চলিত ভাষা (Standard Coloquial)। একটি বিশেষ অঞ্চলে চলিত কথা বলবার ভাষা অবলম্বনে এর সৃষ্টি বলে এর নাম 'চলিত ভাষা'। সাধুভাষার সঙ্গে এর সবচেয়ে বড় ভিন্নতা সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপে। বাংলা চলিত গদ্যে অপিনিহিতি-এর ব্যবহার নেই। পরিবর্তে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিরই ব্যবহার। এও লক্ষণীয় যে সাধুভাষায় অপিনিহিতি-র আগের যুগের ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু উদাহরণ : (ক্রিয়াপদের)

বলিতেছি—বলছি

বলিতেছিলাম—বলছিলাম

বলিয়াছি—বলেছি

বলিয়াছিলাম—বলেছিলাম

বলিতে—বলতে

বলিয়া—বলে

বলিলে—বললে

সর্বনাম পদের উদাহরণ :

যাহার—যার

যাহাদিগের—যাদের

ইহা—এ/এটি

এইরকম, সাধু ভাষার রূপ যেখানে 'বলিয়া', পূর্ব বাংলায় অপিনিহিতি-তে যেটি হয়েছে 'বইল্যা', চলিত ভাষার অভিশ্রুতির পর রূপান্তরিত প্রয়োগ—'বলে'। স্বরসঙ্গাতি-র আশ্রয়ে 'দেশী' হয়েছে 'দিশি', 'বিলাতি'—'বিলিতি'।

আরও কিছু বৈশিষ্ট্য :

১. চলিত ভাষায় দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা। যেমন : কর্‌ব, করিতেছি—করছি।

২. হ-স্বরের লোপপ্রবণতা। যেমন : মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।

৩. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার। যেমন : মিত্রমহাশয়—মিত্তির মশাই।

৪. সমীভবন প্রবণতা। যেমন : যতদিন—যদ্দিন, গল্প—গপ্পো।

৫. স্বরাগম। স্কুল—ইস্কুল, স্পর্ধা—আস্পর্ধা।

৬. অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব শব্দের বিপুল ব্যবহার।

৭. অন্ত্য ও মধ্য স্বরের লোপ প্রবণতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে না দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা আর একটাকে কথ্যভাষা ; কেউ বলে চল্‌তি ভাষা ; আমার কোনো কোনো লেখায় বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।

তবে এই আটপৌরে সাজাকেও একটু গুছিয়ে তুলতে হয়। কেননা অবিকল মুখের ভাষায় সাহিত্য হয় না।'

20.4 সারাংশ

সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা বাংলা গদ্যে বিশেষ করে দীর্ঘকালের এক বাস্তব সত্য। বর্তমান এককে ইতিহাসের পরম্পরাতেই তার উদ্ভব ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সাধু ও চলিত ভাষার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণও।

20.5 অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) আমরা ক'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করে থাকি ?

(খ) 'চর্যাপদ'-এ কি লিখবার ভাষা ও মুখের ভাষায় কোনো পার্থক্য ছিল ?

(গ) সাধুভাষার প্রকৃত সৃষ্টি কোন্‌ সময়ে ?

(ঘ) কোথায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ?

(ঙ) মুখের ভাষার কী নাম ছিল ?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় সাধু ও চলিত ভাষার অস্তিত্ব কীভাবে ছিল আলোচনা করুন।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহারের কয়েকটি দিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করুন।

20.6 গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

২. পার্বতী ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম)।

৪. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

একক 21 ❑ শব্দার্থতত্ত্ব

গঠন

21.1 উদ্দেশ্য

21.2 প্রস্তাবনা

21.3 শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

21.4 অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

21.5 ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

21.6 শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

21.7 শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

21.8 সুভাষণরীতি

21.9 শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

21.10 সারাংশ

21.11 অনুশীলনী

21.12 গ্রন্থপঞ্জি

21.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- শব্দ ও তার অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- শব্দের ব্যাবহারিক বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষাচর্চায় শব্দার্থতত্ত্বের গুরুত্ব কোথায় এবং কতটা তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- শব্দার্থ পরিবর্তনের সহায়ক কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শব্দের অর্থান্তর ঘটবার নানা প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা বাগধারায় অর্থপরিবর্তনের বিচিত্র পদ্ধতি হিসাবে 'সুভাষণ' রীতিটিকে চিনে নিতে পারবেন।
- ভাষায় ঐতিহাসিক তথ্যসংরক্ষণে শব্দার্থের ভূমিকা কতখানি তা জানতে পারবেন।

21.2 প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষারই দুটি প্রধান দিক হল : তার বাইরের প্রকাশরূপ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষার গঠনগত দিক, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যেটি তার ধ্বনিনির্ভর দিক। আর ভাষার অন্য প্রধান দিকটি হল তার ভিতরের ভাব বা অর্থ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের নানা মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভিতরের অর্থেরও নানা পরিবর্তন হয়। কোনো শব্দের সঙ্গো এই পরিবর্তনশীল অর্থের সম্পর্কে কতখানি নিকট সেই বিষয়টি এবার আমরা দেখব।

21.3 শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

শব্দ কোনো বস্তু বা ভাব সম্পর্কে আমাদের চেনাকে নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট করে। কোনা শব্দকে তার ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে, কোন্ অর্থ বোঝাবার জন্য তার উৎপত্তি তা বুঝতে পারা যায়। কখনও কখনও দেখা যায় একটি শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করকতে সক্ষম। যেমন—'রাগ' শব্দটি ক্রোধ অর্থে, প্রণয় অর্থে বা গানের নির্দিষ্ট স্বরসমন্বয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। একটি বস্তু বা একটি ভাব একাধিক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন নদী বোঝাতে তটিনী, স্রোতস্বিনী, গাঙ নানাধরেনর শব্দ প্রযুক্ত হয়। এর থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী কোনো ব্যাপার নয়। শব্দ সময়ে সময় পোষাক বদলের মত অর্থানুষঙ্গ বদল করে। আসলে সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ নিয়মে ভাষার ধ্বনিগত গঠনের দিকটি যেমন প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, সেই একই অনিবার্য কারণে অর্থের সঙ্গো শব্দের সম্পর্কসূত্রও শিথিল হয়ে উঠেছে। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের সীমান প্রসারিত হয়েছে, তার পরিচিত বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, যার ফলে অনেক সময়ই একটি শব্দ বা শব্দমূল একাধিক বস্তু বা ভাবের বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—যার প্রত্যক্ষ ফল—শব্দ ও তার অর্থের নির্দিষ্ট সম্পর্ক বন্ধন থেকে মুক্তি। শব্দের অর্থ পরিবর্তনও এরই ফলশ্রুতি। মোটের উপর আমরা বলতে পারি অর্থ শব্দের এমন এক শক্তি যা পরিবর্তনশীল। সময়ের গতির সাথে সাথে, সভ্যমানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়ে, শব্দের এই বিশেষ শক্তিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করেছে।

21.4 অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

অর্থকে শব্দের একটি বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করলাম। সেইসঙ্গো এও দেখলাম যে এই শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে। শব্দের অর্থশক্তির নানারূপ বৈচিত্র্যকেই অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—এই তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই তিনটি শক্তির মধ্যেই শব্দার্থের মূল রহস্য ধরা আছে। শব্দশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্রে এই তিনটি অর্থরূপ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল শাস্ত্রে যেভাবে এই তিনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই প্রকার—অভিধা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের এবং লক্ষণা দ্বারা গৌণার্থের বোধ জন্মায়। আর এই দুই শক্তি যে তাৎপর্যার্থ জ্ঞাপন করতে পারেন না, সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় ব্যঞ্জনশক্তি।

উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। ধরুন আমরা যখন বলি 'রিকসা' বা 'ট্যাকসি' তখন ওই বিশেষ যান দুটি সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট যে ধারণা তার দ্বারা অর্থবোধ ঘটে। এটি ওই শব্দদুটির অভিধা শক্তির দ্বারা ঘটেছে—আমরা এইভাবে বিষয়টি দেখতে পারি। আবার দেখুন ; পথচলতি অবস্থায় যখন এই যানগুলির প্রয়োজনে আমরা রিকসাচালক বা ট্যাকসিচালককে ডাকি, তখনও ডাক দিই শুধু মাত্র 'রকসা' বা ! এই রিকসা' কিংবা 'ট্যাকসি' বলে। বলাবাহুল্য নিষ্প্রাণ যানদুটি আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়, আমাদের লক্ষ্য তাদের চালক। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু 'ট্যাকসি' বা 'রিকসা' বলে ডাক দিলেও চালকরা বোঝেন যে তাঁদেরই ডাকা হচ্ছে। অর্থবোধের এই বিশিষ্টতা শব্দের লক্ষণাশক্তির প্রকাশ। প্রথম উদাহরণে অভিধা হিসাবে আমরা শব্দের মুখ্যার্থকে প্রধান হতে দেখছি। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে শব্দের গৌণার্থই লক্ষণা হিসাবে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এইবার অর্থের তৃতীয় রূপভেদটিতে আসুন। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী হিসাবে আমরা সবাই 'গাছ' এবং 'পাথর' শব্দদুটির অর্থ জানি। কিন্তু কথায় আমরা যখন 'গাছপাথর' শব্দটি প্রয়োগ করি (বয়সের গাছপাথর নেই) তখন উদ্ভিদ বা প্রস্তর—কোনোটিই অর্থে বজায় থাকে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ—অতিবৃদ্ধ, এমনই একটি অর্থবোধ ঘটে। তাৎপর্যগত অর্থ প্রকাশের এই বিশেষ ক্ষমতাকেই 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এইভাবে ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের অর্থগত ত্রিশক্তি লক্ষ্য করা যায়। ভাষাব্যবহারকারী মানুষ শব্দের কোন্ শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে, কোন্ অর্থটিকে বজায় রাখবেন, তা নির্ভর করে দেশকালানুযায়ী ভাষার ঔচিত্যবোধের উপর এবং ওই ব্যক্তির প্রকাশ ক্ষমতার উপর। মাতৃভাষায় আমাদের যে সহজাত অধিকার, তার উৎস আমাদের প্রতি মুহূর্তের শ্রবণ জাত অভিজ্ঞতা। এর থেকেই শব্দ ও তার অর্থ সম্পর্কে বোধের জন্ম ও ব্যবহারিক সক্ষমতার জন্ম।

21.5 ভাষা বিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

শব্দার্থতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্পর্কবিচার, অর্থপরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তিত অর্থের নানা শ্রেণিভেদ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্বের যে দিকটি গড়ে উঠেছে সেটিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার আওতায় আনতে প্রথমদিকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই নারাজ ছিলেন। তাঁদের মতে—অর্থপরিবর্তন আসলে মানুষের মনের খেলার ফলশ্রুতি এবং যেহেতু এই মনকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই শব্দ ও অর্থের বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ যেহেতু অর্থ ভাষার শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য গঠনের আভ্যন্তরীণ নির্মাণের প্রক্রিয়াটির (deep structure) সঙ্গো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে একটি জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট—তা হ'ল শব্দার্থই যে কোনো ভাষার প্রাণ। এই ভাব বা অর্থ বাদে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

21.6 শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

আমরা আগেই দেখেছি যে কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার অনেকটাই ঐ ভাষা ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুগ। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার বিবর্তন অনুযায়ী মানুষের মনের গঠন ও অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে। তারই ফলে মানুষ

যখন ভাষা ব্যবহার করে, তার নিজের সেই আভ্যন্তরীণ বদল ভাষার বাইরের কাঠামোটিকে যেমন বদলে দেয়, তেমনি তার ভিতেরর অর্থটিকেও পরিবর্তিত হতে বাধ্য করে। ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে তেমনি অর্থ পরিবর্তনেরও নানা কারণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই কারণগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে তাদের সবগুলিকেই একটিমাত্র আলোচনায় সীমিত করা কষ্টাসাধ্য। তবে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর পর্যালোচনা অনুযায়ী এই কারণগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় : (১) স্থূলকারণ এবং (২) সূক্ষ্ম কারণ। এই দুই ক্ষেত্রেই আবার নানা উপশ্রেণিতে বিভাজিত হবার মতো কারণসমূহও লক্ষ্য করা যায়।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ ঃ

দেশ-কাল, অনুযায়ী, ভাষায় শব্দ ব্যবহারকারী মানুষের অভিজ্ঞতার তারতম্যে শব্দের যে অর্থান্তর ঘটে, সেগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এবিষয়ে প্রভাবসৃষ্টিকারী কারণগুলিকে আমরা তিনটি সূত্রে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন—(১) ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ, (২) ঐতিহাসিক কারণ এবং (৩) উপকরণগত কারণ। আসুন, প্রথমে এই তিনটি কারণে কিভাবে শব্দ তার অর্থ বদলে নেয়, বাংলা ভাষার শব্দ অনুযায়ী আমরা তা লক্ষ্য করি।

ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ ঃ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন ফার্সিতে প্রচলিত 'মুর্গ', শব্দটির অর্থ যে কোনো পাখি। কিন্তু আগন্তুক শব্দ হিসাবে বাংলাভাষায় প্রবেশ করে এর প্রয়োগ বিশেষ একটিমাত্র পাখি—মোরগ বা মুরগি (এক কথায় তৎসম 'কুক্কুট' অর্থে) বোঝাতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। একইরকমভাবে ফার্সী 'দরিয়া' শব্দটি মূলে 'নদী' বোঝালেও, বাংলায় এই শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সমুদ্র'। অনুরূপ কারণেই লক্ষ্য করুন আরও কত শব্দে এজাতীয় অর্থন্তর লক্ষ্য করা যায়—বাংলায় 'শাক' বলতে ভোজ্য উদ্ভিদকে বোঝালেও, ভারতের হিন্দীভাষী অঞ্চলে 'শাক' নিরামিষ তরকারি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহাসিক কারণ ঃ

জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনেকসময়ই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে পিছনে সরিয়ে ভিন্নতর অর্থকে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি (ঋ + ন্যৎ = আর্য) অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ গমনধর্মী, বন থেকে বনান্তরে যাযাবরবৃত্তিধারী একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। পরে কৃষিনির্ভর, স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে উঠলেও তাদের 'আর্য' নামটিই থেকে যায়, যার পরিবর্তিত অর্থ হয়ে ওঠে 'ইন্দো ইউরোপীয় বংশের নৃজাতি'। এরকম অর্থ পরিবর্তনের আরও একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখতে পারেন 'বিবাহ' 'পাণিগ্রহণ' ইত্যাদি শব্দগুলিকে। আদিমকালে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বলপ্রয়োগে হরণ করা এবং বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল বলে এই বিশেষরূপে বহন কার অর্থে 'বিবাহ' এবং বলপ্রয়োগে গ্রহণ করা অর্থে 'পানিগ্রহণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এই বর্বর প্রথার অবসান ঘটলেও শব্দগুলি পরিবর্তিত অর্থ গ্রহণ করে ভাষায় টিকে রয়েছে। উল্লিখিত দুটি শব্দই এখন 'পরিণয়সূত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উপকরণগত কারণ ঃ

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয়, সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুযায়ী অনেকসময় ওই বস্তুটির নামকরণ হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরনো নামটিই বজায় থাকে। যেমন ধরুন 'কলম' শব্দটির মূল অর্থ 'শর' বা 'খাগ' যা একসময় লেখনী হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন শরের ব্যবহার অবলুপ্ত তো বটেই, উপরন্তু লেখনী নির্মাণে হেন বস্তু নেই যা ব্যবহৃত হয় না। অথচ সবকটি ক্ষেত্রেই 'কলম' শব্দটি ব্যবহার করতেই আমরা অভ্যস্ত।

লক্ষ্য করুন, পুরনো নামটির যোগ উপকরণটির সাথে। আর এই পুরনো নাম দিয়েই যখন নতুন জিনিসটিকে বোঝাচ্ছি, তখন তার সম্পর্ক আর ওই জিনিসটি কিসে তৈরি হয়েছে সেই উপকরণের সঙ্গো নয়, শুধুমাত্র জিনিসটির সঙ্গোই। এরকম অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আপনি আরও অনেক খুঁজে পাবেন। একসময় জল বা বালিভর্তি ঘড়ার সাহায্যে সময় নিরূপণ করা হত, তাই তার নাম ছিল 'ঘড়ি'। আধুনিক যান্ত্রিক সময়নির্ধারক যন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা একটি ব্যাপার হলেও তার নাম রয়ে গেছে 'ঘড়ি'। তুলো দিয়ে তৈরি হ'ত বলেই 'তুলি' বর্তমানে যা নাইলন তন্তু বা পশুলোম তৈরি হয়, কিন্তু তার 'তুলি' নামটি অপরিবর্তিত।

অর্থ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ ঃ

এই জাতীয় কারণটি মূলত ভাষা ব্যবহারকারীর প্রকাশসামর্থ্য ও ঔচিত্যবোধের উপর নির্ভর করে অর্থ পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রেও অর্থ পরিবর্তনের স্থূল কারণের মতই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়, যাদের আমরা শ্রেণিভুক্ত করতে পারে এইভাবে—(১) সাদৃশ্য, (২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, (৩) শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা ও অজ্ঞতা, (৪) অল্পায়াস প্রবণতা এবং (৫) আলংকারিক প্রয়োগ।

(১) সাদৃশ্য ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন সাদৃশ্যের ভূমিকা অনেকখানি, শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু দেহের সমস্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ অবস্থিত, সেই কারণে এই অর্থসাজুয্যে শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা বোঝাতে আমরা যথেচ্ছ 'মাথা' শব্দটিকে ব্যবহার করি। যেমন 'গাঁয়ের মাথা', 'গাছের মাথা', 'মাথায় রাখা', 'মোড়ের মাথা' ইত্যাদি। 'বড়' বা 'বৃহৎ' অর্থে 'রাম' শব্দটির ব্যবহার (রাম ছাগল, রামদা) বা অনুরূপভাবে 'রাজ' শব্দটির প্রয়োগও (রাজপথ, রাজহাঁস, রাজগাঁদা) এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। আকারের বিশালত্ব, রাজকীয়তা এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গো সমীকৃত হয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রেই।

(২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার ঃ

সাধারণ মানুষের ধারণা—অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশেই কোনো বিপজ্জনক বস্তু বা অশুভ বিষয়কে কোনো একটি শুভ বা শোভন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে আপনি সুভাষণ বলে অভিহিত করতে পারেন। এই প্রবণতায় অনেক সময়ই দেখা যায়—নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে তার অর্থগত পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন, 'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' বা 'সাপ'

বোঝাতে 'লতা', বসন্ত রোগকে 'মায়ের দয়া' বা 'শীতলায় দয়া', কুসীদজীবি'কে 'মহাজন' বলা এই বিশ্বাস বা সংস্কারচ্ছন্ন অর্থবিবর্তনেরই ফলশ্রুতি।

(৩) শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা ও অজ্ঞতা ঃ

কোনো শব্দের মূল অর্থটি না জেনে, তাকে ভিন্ন, সম্পূর্ণ আলাদা কোনো অর্থে প্রয়োগ করলে, অনবধানজনিত অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা সেখানে থাকে। যেমন ধরুন 'সোচ্চার' শব্দটি। আমরা আমাদের চারপাশে এই শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করি 'জোরে বলা' বা 'ঘোষণা করা' অর্থে। অথচ দেখুন শব্দটির মূল অর্থ আদৌ এর সঙ্গো জড়িত নয়। কারণ মূল অর্থটি হ'ল 'সশব্দ বমন'। ঠিক তেমনি 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী না বুঝিয়ে 'নিষ্ঠুর' অর্থে প্রয়োগ করা কিংবা অল্প বা ছোট বোঝায় এমন 'স্তোক' শব্দটিকে অজ্ঞাতবশত 'স্তোকবাক্য' হিসাবে ব্যবহার করা—আমাদের এই জাতীয় প্রবণতা থেকেই ভাষায় স্থায়ী হয়ে দেখা দেয়।

(৪) অল্পায়াস প্রবণতা ঃ

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বশে আমরা অনেকসময় কোনো একটি শব্দগুচ্ছের সবটুকু ব্যবহার না করে, তার অংশবিশেষ উচ্চারণ করেই কাজ চালিয়ে নিতে চেষ্টা করি। একে শব্দ-সংক্ষেপ বা শব্দের অঙ্গচ্ছেদ বলতে পারেন। যেমন—'দণ্ডবৎ প্রণাম' কালক্রমে 'দণ্ডবৎ'-মাত্র হয়েই প্রণামের প্রক্রিয়াটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। 'খবরের কাগজ' না বলে আমরা প্রায়শই শুধু 'কাগজ' বলে সংবাদপত্রের অর্থটিকে পরিস্ফুট করে তুলি। কিংবা 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' আমাদের কাচে হয়ে ওঠে 'সন্ধ্যা দেওয়া'।

(৫) আলংকারিক প্রয়োগ ঃ

বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে, আলংকারিক বাচনভঙ্গি ব্যবহারের ফলে বহু শব্দেরই মূল অর্থ পিছনে সরে গিয়ে, বিচিত্র অর্থ প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেমন—বাড়ি মাথায় করা, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, মামার বাড়ি (জেলখানা অর্থে), শ্রীঘর (ঐ একই অর্থে) বললে, আমরা ভুলেও মূল অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি না। কারণ এই দৃষ্টান্তগুলির আলংকারিক অর্থই আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। লক্ষ্য করুন, বিনয় বা নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতেও আমরা প্রায়ই শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ করি। নিমন্ত্রিতকে "দুটি ডালভাত" খাবার জন্য অনুরোধ করি, নিজের বাড়িকে বলি 'গরীবের বাড়ি'।

এইভাবে লক্ষ্য করুন বক্তা বা ভাষাব্যবহারকারী ব্যক্তি কীভাবে তাঁর বিবক্ষা অনুযায়ী শব্দ ও অর্থের সম্পর্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যে দৃষ্টান্তগুলি আমরা ইতপূর্বে দেখলাম, নজর করুন তাতে দুটি ধরনের পরিবর্তনসূত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রতমত শব্দ যেখানে নিজেদকে অপরিবর্তিত রেখে অর্থকে বদলে নিচ্ছে সময়ের সাথে সাথে ('কলম', 'আর্য বা 'দরিযা' জাতীয় শব্দ) দ্বিতীয়ত অর্থ তার প্রাধান্য বিস্তার করে, তার পরিচ্ছদস্বরূপ শব্দটিকে বদলে নিচ্ছে (মাথা, গঙ্গাপ্রাপ্তি, পাষণ্ড, কাগজ, শ্রীঘর ইত্যাদি শব্দের মতো দৃষ্টান্তে)। আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণগুলি প্রথম ক্ষেত্রে সক্রিয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে প্রধানত সক্রিয় হয়ে উঠেছে অর্থপরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব নির্ভর সূক্ষ্ম কারণগুলি।

21.7 শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

আমরা পূর্বে দেখেছি শব্দের প্রাথমিক বাচ্যার্থ অভিধারূপে, লক্ষ্যার্থ লক্ষণরূপে এবং ব্যঙ্গার্থ ব্যঞ্জনারূপে পরিস্ফুট হয়। হৈ সবকটি ক্ষেত্রেই শব্দের অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোনো শব্দ ভাষায় দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হতে হতে, কখনও তার অর্থের ব্যাবহারিক পরিসীমা সংকুচিত হয়, কখনও আবার এই পরিসীমা প্রসারিত হয়। এরই ফলকথা শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা ধারা। এই ধারাগুলিকে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পঞ্চমুখীরূপে দেখা যায়—

(১) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning)

(২) অর্থের অবনতি (Deterioration of meaning)

(৩) অর্থের সংকোচন (Reductiion of meaning)

(৪) অর্থের প্রসার (Expansion of meaning)

(৫) অর্থসংক্রম / অর্থসংশ্লেষ (Transfer of meaning)

আসুন, এইবার আমরা দেখি এই পঞ্চধারা কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

(১) অর্থের উন্নতি/অর্থোৎকর্ষ ঃ

কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবির্তত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে নতুন অর্থে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাবে তাকে অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ বলে। যেমন 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ গৃহ, অর্থোন্নতির ফলে 'দেবগৃহ'। একইভাবে 'ভোগ' খাদ্যসামগ্রীর সামান্যতা থেকে দেবতার আহার্যে উন্নীত। 'সম্ভ্রম' শব্দের মূল অর্থ 'ভয়', এখন তা 'মান্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দর্শন' এর অর্থ দেখা হলেও দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করাতেই এই শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করি।

(২) অর্থের উন্নতি/অর্থোপকর্ষ ঃ

কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, মূল অর্থ অপেক্ষা তুচ্ছ বা হীন কোনো বস্তু বা বিষয়কে, নতুন অর্থের দ্বারা বোঝান হচ্ছে, তবে তাকে বলে অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ। যেমন 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি হলেও প্রচলিত অর্থ 'সুদখোর'। 'ইতর' শব্দের বাচ্যার্থ 'অন্য' বা 'অপর', কিন্তু এখন 'ছোটলোক' বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'প্রীতি' মূল অর্থ 'প্রেম'কে বহন করলেও স্বরভক্তিজাত 'পীরিতি' কিন্তু 'অবৈধ প্রণয়' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখুন, অর্থোন্নতি এবং অর্থাবনতির উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থকে পিছনে সরিয়ে প্রচলিত বা প্রায়োগিক অর্থগুলিই ক্রমশ প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

(৩) অর্থের সংকোচ ঃ

প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবেকে বোঝায়, এবং কালক্রমে যদি তার অর্থ পূর্ব প্রচলিত অর্থের কোনো একটিমাত্র বস্তু বা ভাবের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ হয়ে ওঠে, তবে অর্থপরিবর্তনের

সেই প্রক্রিয়াকে বলে অর্থসংকোচ। যেমন—'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্যবস্তু' এখন শুধুই 'ভাত'। 'মৃগ' শব্দটিকেও 'পশু' অর্থের ব্যাপকতা থেকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে এখন শুধুমাত্র 'হরিণ' অর্থে আমরা প্রয়োগ করি। আরও দেখুন, সংস্কৃত থেকে আগত 'প্রদীপ' শব্দটি সবরকমের আলো বোঝাবার জন্য প্রস্তুত থাকলেও আমরা তার ব্যবহারসীমা কমিয়ে নিয়েছি একটি বিশেষ ধরনের আলোর ক্ষেত্রে, মাটি বা পিতলের বিশেষ পাত্রে তেল ও সলতে দিয়ে যে আলো জ্বালানো হয়।

(৪) অর্থের প্রসার/অর্থবিস্তার ঃ

শব্দের মূল অর্থ যখন কোনো কারণে তার উদ্দিষ্ট বস্তু বা ভাবকে অতিক্রম করে ওই প্রাথমিক বস্তু বা ভাব নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থের প্রসার ঘটে। অর্থাৎ এটি অর্থসংকোচের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি। অর্থের সঙ্কীর্ণতা কালক্রমে অধিকতর বস্তু ও ব্যাপকতর ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়ে যায়। যেমন কালো রঙের উপাদানে তৈরি লিখবার তরল উপাদান ছিল 'কালি'। এখন যেকোনো বর্ণের লিখন মাধ্যমই 'কালি'। 'গঙ্গা' শব্দজাত 'গাঙ' তার প্রায়োগিক অর্থসীমা বাড়িয়ে. নিয়েছে যেকোনো নদী অর্থে। 'লক্ষ্মী' শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়িয়েছে শান্তশিষ্ট। 'তৈল' শব্দের মূল অর্থ তিলের নির্যাস, এখন সর্ষে বা নারকেলের নির্যাসও তৈল বা 'তেল'।

(৫) অর্থ-সংক্রম/অর্থসংশ্লেষ ঃ

শব্দের অর্থপরিবপর্তন কতগুলি স্তর অনুযায়ী ঘটে। এই ধাপগুলি অতিক্রম করার পর শেষপর্যন্ত শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায়, সেই নতুন অর্থের সঙ্গে মূল অর্থের কোনো যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে ভিন্ন কোনো বস্তুতে সরে এসেছে। এইভাবেই অর্থসংক্রম ঘটে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হ'ল 'সন্দেশ' শব্দটি। এর মূল অর্থ ছিল 'সংবাদ, খবর'। প্রেরক সংবাদ নিয়ে যেতেন কিছু মিষ্টান্নসহ। এই অনুষঙ্গেই শব্দটি মূল অর্থটিকে হারিয়ে 'মিষ্টান্ন' অর্থটিকে আঁকড়ে ধরেছে। অনুরূপভাবে দেখুন 'পাত্র' শব্দটিরও পরিণতি। এর মূল অর্থ ছিল 'পান করার আধার', ক্রমশ এটি 'কন্যা দান করার আধার'-এ পরিণত হয়েছে অর্থ সংক্রমের ফলে।

উপরিউক্ত এই আলোচনায় আমরা দেখলাম যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই একটি অর্থ বোঝাবার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে,. সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনের অমোঘ নিয়মকে স্বীকার করে নিয়েছে তার অর্থবোধের ক্ষেত্রে। এতে ভাষার অর্থগৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহিত্য রচনায় শাব্দিক শুষমাবৃদ্ধির কাজেও এটি সহায়ক হয়ে উঠেছে। শব্দের অর্থপরিবপর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তাই মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও চিন্তাধারারই সাক্ষ্যবহনকারী।

21.8 সুভাষণরীতি

অকল্যাণসূচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত কিংবা বিপজ্জনক কোনো অর্থকে কল্যাণবাচক, ভদ্ররূপ দেবার জন্য মানুষ অনেকসময় প্রায় বিপীত বা পৃথক অর্থবোধক শব্দের আশ্রয় নেয়। একে এককথায় সুভাষণ (Euphemism) রীতি বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষ্যণীয়। যেমন ধরুন—গার্হস্থ্য জীবনে চাল না থাকা অমঙ্গলে। তাই চালের অভাব বোঝাতে 'বাড়ন্ত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় (চাল বাড়ন্ত)। বিদায় গ্রহণ প্রিয়জনের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ঘটনা। তাই কোথাও যাবার সময় 'আসি' শব্দটি প্রয়োগ করে 'যাই'-এর অর্থ বোঝানো হয়। বসন্ত রোগ যতই কষ্টকর হোক না কেন, তাকে 'শীতলার দয়া' বা 'মায়ের দয়া' বলে মেনে নেবার মানসিকতাও আমাদের মধ্যে দেখা যায়। নিম্নবর্ণের মানুষকে 'হরিজন' নামে অভিহিত করা, পাচককে 'ঠাকুর' বলে ডাকা বা সুদখোরকে 'মহাজন' রূপে চিহ্নিত করার মধ্যেও এই প্রবণতাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আবার দেখুন, কখনও কখনও অভিপ্রেত অর্থবোধক শব্দের থেকে পৃথক শব্দ ব্যবহার করেও আমরা বক্তব্যকে সুভাষিত করে তুলি। যেমন—সাপকে 'লতা' বা সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘকে 'বড় শিয়াল' বলার মধ্য দিয়ে, এদের প্রকৃত নামোচ্চারণে যাতে এদের সাক্ষাৎ না পেতে হয়, এমনই একটা স্বস্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে।

তবে সুভাষণের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আলংকারিক ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ প্রয়োগে। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে আমরা বলি 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি', মানুষের মৃত্যুর পর নশ্বর শরীরের পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার অমোঘ পরিণতির কথাই এখানে বিবৃত। সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে আবার এই অর্থেই 'তিরোভাব' 'মহাসমাধি', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি। শূন্য ভাণ্ড প্রকাশ করতে গিয়ে বলি—ভাঁড়ে মা ভবানী।

সুভাষণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখুন, একধরনের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাপ্রকাশের ব্যাপারটিও লক্ষ্য করা যায়। কন্যাসন্তান যাতে জন্মগ্রহণ না করে, তাই শেষ জাতিকার নাম 'আন্নাকালী' (আর না কালী) রাখার প্রথা এই বাংলাদেশেই প্রচলিত। মৃত্যুর পর চিরআনন্দময় স্বর্গে ঠাঁই পাবার ইচ্ছায় 'স্বর্গলাভ' কথাটি ব্যবহার করে মৃত্যুকে সহনীয় করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুপ্ত বাসনার ইঙ্গিত মেলে এই জাতীয় সুভাষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত সুভাষণের বিপরীত একটি রীতির কথাও কিন্তু আমরা এই অর্থপরিবর্তনের সূত্রে দেখতে পারি। ভালোকে মন্দরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকে ভাষায় সৃষ্টি হয় দুর্ভাষণ (pejoration) যার নিদর্শন বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও সুলভ। কখনও আদর জানাতেক, কখনও অমঙ্গালের হাতে থেকে রক্ষা করতেই দুর্ভাষণ প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। নাতিকে আদর করে 'শালা', বাৎসল্যের আতিশয্যে সন্তানকে 'দুষ্টু, পাজি, পাগলা', পুত্র বা পুত্রোপম ব্যক্তিকে 'বেটা' (যার প্রকৃত অর্থ বিনা মাইনের মজুর) সম্বোধন করার মধ্যে দুর্ভাষণের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আবার দেখুন, সন্তানকে যম যাতে স্পর্শ না করেন, তাই ঘৃণ্যবস্তু হিসাবে পরিচিতদানের উদ্দেশ্যে থেকে আদরের সন্তানের নাম রাখা হয় 'গুয়ে' বা 'গোবরা। অর্থাৎ মনের ভাব যাই থাকুক না কেন, উচ্চারিত নামে যেন তার বিপরীতভাব প্রকাশ করে, বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়।

21.9 শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

শব্দার্থতত্ত্ব ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি নতুন শাখা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, যাকে বলা যায় 'ভাষা-আধারিত প্রত্ন ইতিহাস' (Linguistic Palaeontology)। বিষয়টি ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ভাষা বিজ্ঞান—সকল দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক হলেও বাংলাভাষার আলোচনা প্রসঙ্গো এটির আবির্ভাব অনেক দেরিতে। বিজ্ঞানের নানা শাখায়, জীবাশ্মের অস্তিত্ব থেকে, পৃথিবীর আদিমপর্বের অথচ অধুনালুপ্ত বিভিন্ন জীববিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভাষাশাস্ত্রেও এইভাবেই বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থবৈচিত্র্যের নানা স্তর থেকে প্রাচীনকালের মানবসভ্যতার নানা চকমপ্রদ তথ্য অনুসন্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। একেই ভাষা আধারিত প্রত্ন ইতিহাস বলা হয়। অনক সময় একই ভাষার নানা শব্দের বিশ্লেষণে, আবার অনেক সময় বিভিন্ন ভাষা যারা পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হলেও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত (যেমন সংস্কৃত ইংরেজি ফরাসি) এমন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা থেকে সভ্যতার বিবর্তন ও ইতিহাসের অগ্রগতির একটি স্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের প্রদর্শিত কিছু দৃষ্টান্তকেই আমরা বর্তমান বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি অনুযায়ী যার অর্থ গতিশীল, ভ্রাম্যমাণ জাতি। কিন্তু অরণ্যনির্ভর এই জাতি ভারতবর্ষে এসে ক্রমশ কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং স্থিতিশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পরেও 'আর্য' নামটিই বহাল থাকে। আইদম এই জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রাথমিক উপায়টি চিরস্থায়ী হয়ে আছে এই নামটির মধ্যে।

ইন্দো-ইউরোপীয় এই সম্প্রদায় প্রধানত মৃগয়াজীবী এবং যাযাবর হলেও তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কসূত্র যে বেশ দৃঢ়বন্ধ অবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন—প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে-পিতা (পিতর্), মাতা (মাতর্), ভ্রাতা (ভ্রাতর), দুহিতা (দুহিতর) ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক শব্দগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজিত পক্ষের বিবাহযোগ্য কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে আসা হত। এই বিশেষরূপে নিয়ে আসার অর্থেই 'বিবাহ' শব্দটির প্রয়োগ ছিল। কালের অগ্রগতিতে এই প্রথা অবলুপ্ত। কিন্তু 'পানিগ্রহণ' বা 'বিবাহ' শব্দ এখনও সেই পূর্বপ্রথার স্মৃতি বজায় রেখেছে তাদের অস্তিত্বে।

'কলম' হিসাবে আজ আমরা যে বস্তু ব্যবহার করি তার আদিরূপ নির্মিত হয়েছিল শর বা খাগ দিয়ে, যাকে বোঝাবার জন্যই মূল 'কলম' শব্দটির উৎপত্তি। অথচ আজ দেখুন, ধাতু, কাঠ, প্লাস্টিক যাতেই কলম তৈরি হোক না কেন, প্রথম লেখনী হিসাবে শর বা খাগের ব্যবহৃত হবার ইতিহাস সংগোপনে রয়ে যায় 'কলম' শব্দটিকে এখনও ব্যবহার করার মধ্যে।

21.10 সারাংশ

শব্দ ও তার অর্থপ্রকাশক ক্ষমতাকে নিয়ে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, তার মূল সূত্রগুলিকে এবার সংক্ষেপে আর একবার দেখে নিই আসুন। আমরা দেখলাম শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো নিত্যসম্পর্ক নয়, বরং একটি পরিবর্তনশীল সম্পর্ক বিদ্যমান, যা নির্ভর করে আছে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থের উপর।

আমরা আরও দেখলাম—স্থান, কাল এবং বক্তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের উপর শব্দের অর্থপরিবর্তনের বিষয়টি নির্ভরশীল। একভাষার শব্দ অন্য ভৌগলিক প্রতিবেশে ব্যবহৃত হলে, ভাবাবেগের আতিশয্যে আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাসে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, সাদৃশ্যের প্রভাবে, সংস্কার বা বিশ্বাসের কারণে উচ্চারণপ্রয়াসে শৈথিল্যের ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে।

অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে শব্দের মোটামুটি পঞ্চমুখী গতি দেখা যায়। অর্থের উন্নতি ও অবনতি, অর্থের প্রসার ও সংকোচ এবং অর্থ সংক্রম—এই পাঁচটি উপায়ে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। এই সবকটি ক্ষেত্রেই, পূর্বোল্লিখিত কারণগুলির কোনো একটি বা একাধিক কারণ একযোগে অর্থান্তরের দায় বহন করে।

শব্দের অর্থ আমাদের অবচেতনেই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রাচীনকালে কোনো বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ, একালে ভিন্নতর অর্থে প্রযুক্ত হলেও, তার রূপগত গঠনে সুপ্ত থাকে আদিঅর্থের দ্বারা প্রকাশক তথ্য। শব্দার্থ তাই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবেও একটি পৃথক গুরুত্বের অধিকারী।

21.11 অনুশীলনী

১। অর্থপরিবর্তনের কোন্ বিশেষ কারণটি প্রযুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে বলুন ঃ

মহারাজ (পাচক অর্থে), রামধনু, ঝি, শাঁখা বাড়া, গবাক্ষ, অশ্রুবন্যা, সজ্জি।

২। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন ঃ

(ক) শব্দের লক্ষণাশক্তি

(খ) ব্যঞ্জনাগত অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ

(গ) দুর্ভাষণ

(ঘ) অর্থপরিবর্তনের আলংকারিক কারণ

৩। অর্থপরিবর্তনের কোন্ কোন্ ধারায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে, তা বলুন ঃ

বিভীষণ, থান (< স্থান), ফলার, নোয়া (স্ত্রীলোকের লৌহবলয়), উজবুক (< জাতিবাচক 'উজবেক')।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) অর্থের উন্নতি এবং অবনতি।

(খ) শব্দার্থে ঐতিহাসিক উপাদান।

(গ) অর্থের প্রসার এবং অর্থসংক্রম।

(ঘ) শব্দের অর্থ সংকোচন।

21.12 গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

২. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

একক 22 ❐ বাংলা শব্দভাণ্ডার

গঠন

22.1 উদ্দেশ্য

22.2 প্রস্তাবনা

22.3 শব্দাবলীর উৎসানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

22.4 বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত শব্দের উৎসনির্ণয়

22.4.1 উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দাবলি

22.4.2 সারসংক্ষেপ

22.5 আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ

22.5.1 সারসংক্ষেপ

22.6 নবগঠিত শব্দ

22.7 সারাংশ

22.8 অনুশীলনী

22.9 গ্রন্থপঞ্জি

22.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- ভাষার শব্দভাণ্ডার গড়ে ওঠার সাধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন।
- বাংলা শব্দ হিসাবে পরিচিত কিন্তু মূলত ভিন্ন প্রাদেশিক বা বিদেশি শব্দগুলিকে চিনে নিতে পারবেন।

22.2 প্রস্তাবনা

কোনো ভাষার সমৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে তার শব্দভাণ্ডারের উপর। যে ভাষার শব্দ-সম্ভার যত বেশি সেই ভাষাও ততবেশি সমযদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কোনো ভাষার শুধুমাত্র শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নেবার মতো মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আমরা এর পূর্ববর্তী এককে শব্দার্থের আলোচনা প্রসঙ্গো দেখেছি, শব্দরাশি যে শুধু ভাবপ্রকাশেরই উপাদান তা নয়, এর মধ্য দিয়ে ভাষা ব্যবহারকারী একটি জাতির আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এককথায় তার প্রাণরহস্যের সন্ধানও পাওয়া যায়।

সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ফলে, একদা সমাজ প্রচলিত অনেক জিনিস অচল হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় পুরনো ধ্যানধারণারও অবলুপ্তি ঘটে। আবার পাশাপাশি নতুন যুগের নতুন বস্তু, নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দেয়। যেগুলি অপ্রচলিত হয়ে যায়, সেগুলির অর্থপ্রকাশক শব্দাবলিও ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আবার নতুন বস্তু ও ধারণার উপযোগী শব্দ সেইস্থান অধিকার করে। যেমন একদা আমাদের সমাজে চিকিৎসার কাজে আয়ুর্বেদের বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা আমাদের কাছে আর আদৃত নয়। তাই আমরা ভুলেই গেছি একদা প্রচলিত, অতি-পরিচিত বেশ কিছু ওষুধের নাম যেমন 'বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত' বা 'বৃহৎ প্রাণেশ্বর'। বৈদিক যুগে যেসকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাঁদের অনেকের উপাসনাই আমরা আজ আর করি না। ফলে সেইসব দেবদেবীর নাম এখন অপ্রচলিত। যেমন—অদিতি, পর্জণ্য, পূষণ ইত্যাদি। একই সঙ্গে লক্ষ্য করুন—আসবাব হিসাবে কত নতুন জিনিসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি এবং তাদের গ্রহণও করেছি নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাবে। তাদের নামগুলিও এখন আমাদের কাছে নিত্যব্যবহার্য। অথচ ইংরেজরা আসার আগে ওই বস্তুগলির সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ইংরেজেদর মাধ্যমেই ওই বস্তুগুলি আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়েছে। যেমন—চেয়ার, টুল, ডিভান, সোফা ইত্যাদি।

এইভাবেই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কোনো একটি ভাষার শব্দ-সম্পদ গড়ে ওঠে। প্রয়োজনের নিরিখে শব্দাবলীর অস্তিত্ব নির্ভর করে যে কোনা ভাষায়।

22.3 শব্দাবলির উৎসানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত থেকে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা নানা দেশি ও বিদেশি শব্দ আত্মসাৎ করে তাদের নিজের ব্যাকরণ-শৃঙ্খলে আবন্ধ করেছিল। এই সকল শব্দাবলি অবিকৃত বা ধ্বনিগত বিবর্তনের স্তর পরম্পরা পার হয়ে বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে। উপরন্তু ঐতিহাসিক গতিতে যত বিদেশি জাতি এদেশে এসেছে এবং শাসকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের ভাষার শব্দাবলিও কালক্রমে বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে গেছে। এতরকম উৎস থেকে প্রাপ্ত শব্দাবলিকে তাই প্রাথমিকভাবে তিনট পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ (Inherited words)

(২) অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ (Loan\Borrowed words)

(৩) ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ ঃ

এই পর্যায়ভুক্ত শব্দগুলিকে 'মৌলিক শব্দ' নামেও অভিহিত করা হয়। যেহেতু ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা ও অনার্য-ভাশার শব্দাবলিই এই অঙ্গীভূত, সেইহেতু দেশজ ঐতিহ্যের দিকে নজর রেখে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগুলি কখনও মূল ধ্বনিসংগঠনের রূপ যথাযথ রেখে, কখনও আবার উচ্চারণবিকার

রূপান্তরিতভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে। এই বিকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পবে শব্দগুলিকে আমরা তিনটি উচ্চশ্রেণিতে সাজাতে পারি—(ক) তৎসম শব্দ (খ) তদ্ভব শব্দ এবং (গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ।

(২) অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ :

এই শব্দগুলি প্রাকৃতের স্তর পার হয়ে আসা, সংস্কৃতে একদা গৃহীত, প্রাচীন বিদেশিভাষার শব্দ নয়। এগুলি মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত, বিদেশি, ভিন্নভাষা ব্যবহারকারী শাসকের ভাষা থেকে গৃহীত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় থেকে এক দীর্ঘ পর্বের ইতিহাস এই বিদেশি শাসকবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দ এই সময়পর্বে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলিকেই আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় শব্দে কখনও মূল বানানোর সদৃশ উচ্চারিত রূপ, কখনও বাংলাভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্যরূপ প্রচলিত হতে দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে। এগুলিও এই একই শ্রেণিভুক্ত হবার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারেন সোভিয়েত রাশিয়ায় কিছু বছর আগেই যখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদারনীতির হাওয়া বইতে শুরু করেছি, তখন 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' শব্দদুটি এই পদ্ধতিতেই আমাদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

(৩) ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ :

বাংলাভাষায় কিছু শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি অন্যভাষাজাত নয়, বিবর্তনের ধারা পার হয়ে আসা দেশজ বা তৎসম শব্দও সেগুলির উৎস নয়।

শব্দ গঠন করতে গেলে রূপমূল ও প্রত্যয়বিভক্তি যুক্ত করার প্রচলিত রীতিটিকে বজায় রেখেই এখানে এমন কিছু শব্দ তৈরি করা হয়েছে যেগুলির রূপমূলটি কাল্পনিক অর্থাৎ সংস্কৃতে তার উৎস পাওয়া যায় না। এইসূত্রে আমরা আমাদের অতিপরিচিত একটি শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারি, যেমন—'প্রোথিত'। এর মূল যে 'প্রোথ্' ধাতু, সেটি কাল্পনিক, যার সঙ্গে 'ইত' যোগ করা হয়েছে 'প্রোথিত'। এই ধরনের শব্দগুলির এরকম বর্ণচোরা অস্তিত্বের কারণে ভাষাতাত্ত্বিকরা এগুলিকে 'ভুয়া শব্দ' নামে চিহ্নিত করতে চান। তৎসম শব্দের আচ্ছাদনে এরকম আরও কিছু শব্দ আছে সেগুলি হয় অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের অনূদিত রূপ, (যেমন—যোজনা < Planning, বিশ্ববিদ্যালয় <University ইত্যাদি) অথবা বহিরাগত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের যুগ্মরূপ (যেমন—মিনতি < আরবী 'মিন্নৎ' + বাংলা 'নতি', 'বিদা.' আরবী 'ওয়াদা', কিন্তু শব্দটি 'আদায়', 'প্রদায়' এর মত অবচীন সংস্কৃতেও ঢুকে গেছে।) এইভাবে ননোবদিত শব্দ প্রয়োজনের নিরিখেই শব্দ ভাণ্ডারের শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে।

22.4 বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত শব্দের উৎসনির্ণয়

আসুন, এইবারে শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করা শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে যে তিনটি ধারার সন্ধান পেলাম, বাংলাভাষার শব্দগুলিকে সেই ধারায় কীভাবে বিন্যস্ত করা যায় তা লক্ষ্য করি। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কথ্য

বাংলার বিভিন্ন শব্দাবলি আমাদের একান্ত অসচেতন প্রয়াসেই উচ্চারিত হয়ে চলে। অর্থপ্রকাশ বা ভাবের যথার্থ পরিস্ফুরণই সেখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। শব্দের উৎস, মূলরূপ ইত্যাদি নিয়ে আমরা সচরাচর মাথা ঘামাই না। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা চমকপ্রদ। বাংলা শব্দভাণ্ডারের যতখানি জুড়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত দেশজ বা সংস্কৃতজ শব্দ, প্রায় ঠিক ততটাই জুড়ে আছে বহিরাগত বিদেশি ভাষার শব্দ। একান্ত পরিচিত, কথ্যবাংলায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলিও দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে বিদেশি ভাষাজাত। আসুন, বাংলার ব্যবহৃত অতিপরিচিত শব্দগুলির মধ্য থেকেই এই ত্রিধারার বহমানতা অনুভব করি।

22.4.1 উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দাবলি

প্রথম শ্রেণি হিসাবে আমরা দেখেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দগুলিকে, যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব ও (গ) অর্ধতৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দগুলি। আমাদের পরিচিত, নিত্যব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্য থেকেই এই তিন উপশ্রেণির শব্দাবলি আমরা খুঁজে পেতে পারি। এই তিনটি উপশ্রেণিকে ক্রমান্বয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব এইভাবে—

(ক) তৎসম শব্দ ঃ

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক বা সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। 'তৎ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে মূল উৎসস্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে। অর্থাৎ 'তৎ-সম' মানে 'তাহার সমান' বা ঠিক তার মতো, এক কথায় অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় এই জাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক। যেমন—জল, বায়ু, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

এই তৎসম শব্দগুলির মধ্যে আবার দুটি শ্রেণি দেখা যায়, যে দুটিকে ভাষাবিদ্‌গণ 'সিদ্ধ' ও 'অসিদ্ধ' এই দুই বিশেষণে নির্দিষ্ট করেছেন। তাদের মতে—

সিদ্ধ তৎসম শব্দ হল সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং ব্যাকরণসিদ্ধ। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি।

আর অসিদ্ধ তৎসম শব্দ হল সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না বা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, অথচ প্রাচীনকালে কথ্য সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে এই নামে চিহ্নিত করা হয় যেমন—কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল (গাছের ডাল) ইত্যাদি।

(খ) তদ্ভব শব্দ ঃ

এই শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তীপর্বে প্রাকৃতের স্তর পেরিয়ে পরিবর্তিতরূপে বাংলাভাষায় এসেছে। এই জাতীয় শব্দ বাংলাভাশায় সংখ্যার দিক থেকে যেমন প্রচুর তেমনি এগুলির গুরুত্বও লক্ষ্যণীয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এই জাতীয় শব্দগুলি। যেমন—

ইন্দ্রাগার (সং) > ইন্দ্রাআর (প্রা) > ইন্দারা, ইঁদারা (বাং)

হস্ত (সং) > হত্থ (প্রা) > হাথ (প্রাচীন বাং) > হাত (বাং)

নপ্তক (সং) > ণত্তিঅ (প্রা) > নাতি (বাং)

রাজ্ঞিকা (সং) রন্নিআ (প্রা) রাণী (বাং)

তদ্ভব শব্দগুলিকেও দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি যথার্থ বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এগুলিকে কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক 'নিজস্ব তদ্ভব' বলে চিহ্নিত করেন। যেমন—

কৃষ্ণ (সং) > কণ্‌হ (প্রা) > কাণ্‌হ (প্রা. বাং) > কান (ম. বাং)

পরে আদরার্থে 'উ' বা 'আই' প্রত্যয়যোগে কানু, কানাই।

উপাধ্যায় (সং) > উবজ্ঝাঅ (প্রা) > ওঝা (বাং) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টিতে বৈদিক বা সংস্কৃতভাষার এমনকিছু শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেগুলি সর্বপ্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের কোনো ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কোনো বংশের ভাষা থেকে এসে বৈদিক বা সংস্কৃত অনুপ্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সেগুলি প্রাকৃতের পথেই বিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় এসেছে। তবে যেহেতু বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ এগুলি নয়, বরং বলা ভালো ঋণকৃত, তাই এই জাতীয় শব্দের বিবর্তনের ধারায় প্রাপ্ত তদ্ভব শব্দগুলিকে কেউ কেউ 'কৃত ঋণ তদ্ভব' বলে উল্লেখ করতে চান। যেমন—

- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যভাষাজাত :

  গ্রিক -'দ্রাখমে' > দ্রম্য (সং) > দম্ম (প্রা) > দাম (বাং)

  প্রাচীন পারসিক-'কর্শ' > কার্ষাপণ (সং) > কাহাবণ (প্রা) > কাহন (বাং)

- ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য ভাষাবংশের কোনোভাষাজাত :

  দ্রাবিড় বংশের তামিল 'পিল্লে' > পিল্লিক (সং) > পিল্লিঅ (প্রা) > পিলে (বাং)

  'মুটে' > মুটুক (সং) > মুডঅ (প্রা) > মোট (বাং)

  অস্ট্রিক ভাষা বংশের থেকে আগত সংস্কৃত 'ঢক্ক' > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলায় ঢাকা।

  মোঙ্গল ভাষাবংশের থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলায় তুরুক্ক।

মনে রাখবেন, এই যে শব্দগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল, এগুলি বাংলায় এসেছে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার পথ বেয়ে অর্থাৎ ঘুরপথে, সরাসরি নয়। এখানেই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দের সঙ্গো এগুলির তফাত।

(গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ :

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক/সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী প্রাকৃতের স্তর পার না হয়ে, সোজাসুজি বাংলায় এসেছ এবং আসর পর কালোচিত বিকৃতি ও পরিবর্তন লাভ করেছে, সেই শব্দগুলিকে অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে আমরা বিকৃত তৎসম' শব্দ বলে অভিহিত করতে পারি। আমাদের আটপৌরে ভাষারীতিতে এই জাতীয় শব্দের অস্তিত্বও প্রচুর। যেমন—কৃষ্ণ (সং) > কেষ্ট (অর্থতৎ),

নিমন্ত্রণ > নেমতন্ন, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, পুরোহিত > পুরুত, বৈষ্ণব > বোষ্টম, মহোৎসব > মোচ্ছব, যজ্ঞ > যজ্ঞি ইত্যাদি।

22.4.2 সারসংক্ষেপ

এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রথম উৎস হিসাবে যেদিকটি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করে নিতে পারি এইভাবে—বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে—

সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা থেকে, প্রাকৃতের পথ বেয়ে আগত শব্দাবলি, যার মধ্যে আছে তিন শ্রেণির শব্দ—

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশজাত বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ

(খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাবংশজাত শব্দ (দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল)

আর আছে প্রকৃতের পথে না এসে, বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার থেকে সরাসরি বাংলায় গৃহীত শব্দাবলি যেগুলি

(ক) কখনও অবিকৃত উচ্চারণে, মূলের যথাযথ রূপ বজায় রেখেই ব্যবহৃত হয়।

(খ) আমবার কখনও বাংলায় নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতির কারণে খানিকটা বিকৃত রূপে ব্যবহৃত হয়।

সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে রাখবেন, কোনো শব্দ শুধু তৎসম রূপে, কোনোটি তদ্ভব রূপান্তরে বা কোনোটি ভগ্ন-তৎসম বিকারে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি একই সঙ্গে দুটি বা তিনটি রূপেই কোনো কোনো শব্দ ভাষায় প্রচলিত থাকতে পারে। যেমন—

তৎসম	অর্ধতৎসম্য	তদ্ভব
বৈদ্য	বদ্দি	—
গৃহিনী	গিন্নি	ঘরনী
চন্দ্র	চন্দর	চাঁদ
রাত্রি	রাত্তির	রাত
কৃষ্ণ	কেষ্ট	কানু
জ্যোৎস্না	জোছনা	—

22.5 আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ

আসুন, এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠনে দ্বিতীয় উৎসটিকে তার শব্দাবলি সহ চিনে নেবার চেষ্টা করি। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে—বৈদিক বা সংস্কৃতভাষা থেকে সলাসরি বা প্রাকৃতের পথ বেয়ে যে শব্দাবলি বাংলায় এসেছে, তাছাড়া অন্য সমস্তই শব্দগুলিই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ। এক কথায় আমরা বলতে পারি—এগুলি কোনো অবস্থাতেই বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষাজাত শব্দ নয়, অন্যভাষা থেকে সংস্কৃতের পথ বেয়ে প্রাকৃতের

বিবর্তনধারা পার হয়ে আসা শব্দও নয়, এগুলি ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের বা বিদেশি কোনো ভাষার থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দাবলি।

মনে রাখবেন 'কৃতঋণ তদ্ভব' শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষায় আগে এসেছিল, তারপর বাংলাভাষায়। কিন্তু আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দগুলির গায়ে সংস্কৃতের ছোঁয়াচ লাগেনি, সেগুলি সরাসরি বাংলায় এসেছে তাদের উৎস ভাষা থেকে।

এই আগন্তুক শব্দগুলিও আবার তিনটি শেঅরণিতে বিন্যস্ত হতে পারে (১) দেশি, (২) প্রাদিশেক, (৩) বিদেশি।

(১) দেশি শব্দ—ভারতবর্ষে আর্যরা আসার আগে যে যে গোষ্ঠী এদেশে বাস করত, তাদের নিজস্ব ভাষার কিছু কিছু শব্দ আমরা বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষায় গ্রহণ করেছিলাম। এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথা থেকে আসে তা জানা না থাকলেও আধুকিন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীকে এগুলির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগেই দেখেছেন, এইসব ভাষার বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে তৎসম শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যান্য আরো কিছু শব্দ বাংলাভাষায় সরাসরি প্রবেশ করে 'দেশি শব্দ' হিসাবে আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় দেখতে পাবেন এদের—

দ্রাবিড় ভাষাজাত— ইডলি, চেট্টি, চুরুট, আকাল ইত্যাদি।

অষ্ট্রিক ভাষাজাত— ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেংকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, খড়, ডিঙ্গা, মুড়ি, কুলা, চুলা ইত্যাদি।

ভোট-বর্মী ভাষাজাত— লুঙ্গী, লামা ইত্যাদি।

(২) প্রাদেশিক শব্দ—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত নব্যভারতীয় আর্যভাষার বেশ কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিও আগন্তুক বা কৃতঋণ পর্যায়ভুক্ত। যেমন—

পাঞ্জাবী ভাষা থেকে— শিখ, চাহিদা প্রভৃতি।

মারাঠী ভাষা থেকে— বর্গীর, পাটিল।

গুজরাটী ভাষা থেকে— হরতাল, গরবা, খাদি, তকলি ইত্যাদি।

হিন্দী ভাষা থেকে— কুত্তা, পানি, লাগাতার, বন্ধ, ঝণ্ডা, মিঠাই, সমঝোতা, বদলা, খতম, জলদি ইত্যাদি।

(৩) বিদেশি শব্দ—যেসব শব্দ ভারতবর্ষের বাইরের অন্য কোনো দেশে প্রচলিত ভাষার থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেইসব শব্দগুলি বিদেশি কৃতঋণ শব্দ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশি জাতি এদেশে আসে এবং শাসনতান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষার বেশ কিছু শব্দ এই সহাবস্থানের ফলে বাংলাভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং বর্তমানে বাংলাভাষার দেহে তারা এমনভাবে মিশে গেছে যে এদের আর বিদেশি বলে চেনার উপায়ও নেই।

এই সূত্রে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হতে পারে তুর্কি-মুঘল-পাঠান জাতীয় মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে

আগত আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দাবলি। প্রায় হাজার বছর আগে আসা এইসব ভাষা ব্যবহারকারী মুসলমানরা রাজনৈতিক কারণে এদেশে প্রায় সাতশ বছর শাসক হিসাবে ছিলেন। ফলে রাজভাষা হিসাবে এইসব ভাষাগুলির এদেশে একসময়ে যথেষ্ট অর্থকরী জনপ্রিয়তা এবং প্রতিপত্তি ছিল। এই কারণেই অতি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে এইসব ভাষার শব্দাবলি বাংলাভাষায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমেই কিছু তুর্কি ও আরবি শব্দকে বাংলাভাষা আত্মীকরণ করে নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় আড়াই হাজার ফারসি ও ফারসি-মাধ্যমে আগত আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। যেমন—

ফারসি শব্দ—হাওয়া, রোজ, হপ্তা, উকিল, জমি, মজুর, আন্দাজ, জাহাজ, পেয়ালা, খুব, জোর দূরবীন, সিন্দুক প্রভৃতি।

আরবি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)—আইন, আক্কেল, কেচ্ছা (কস্‌সা), কিতাব, জেলা, তাজ্জব, নিক্তি, আতর ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)—চাকু, তকমা, বাহাদুর, কাঁচি, কুলী, উর্দু, কাবু, বিবি, বোচকা, আলখাল্লা, ইত্যাদি।

এরই দ্বিতীয় পর্যায় দেখা দিল উনবিংশ শতক থেকে যখন ইংরেজি শাসনকর্মের ভাষা হিসাবে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। তখন ইংরেজি ভাষা শুধুই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিমের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। ফলত ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা দিল এবং বাংলাভাষায় এর বহু সংখ্যক শব্দ ক্রমশ এমনভাবে প্রবেশ করল যে বর্তমানে সেগুলি, সমার্থক তৎসম বা তদ্ভব শব্দের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ও জোরালো। লক্ষ্য করে দেখবেন, এই শব্দগুলির অধিকাংশেরই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই (যেমন—টিকিট, সাইকেল, ইঞ্জিন, টেবিল, গ্লাস, ট্রাম, বাস, ইঞ্জেকশন, বাল্ব ইত্যাদি)। অর্থাৎ এরকম ইংরেজি শব্দগুলি আমাদের কাছে অপরিহার্যরূপে বিবেচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত কথা বলি, তার সিংহভাগই জুড়ে আছে ইংরেজি শব্দ—আপিস (Office), লণ্ঠন (Lantern), বাকস (Box), হাসপাতাল (Hospital), ডাক্তার (Doctgor), স্কুল (School), পুলিশ (Police), চেয়ার (Chair), টেবিল (Table), ক্লাস, জাঁদরেল (General), স্যার (Sir) ইত্যাদি।

সংখ্যাগত দিক থেকে এরপরই আসে পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত শব্দাবলির প্রসঙ্গ। প্রশাসনিক দিক থেকে নয়, বরং অন্য এক বিচিত্র সম্পর্কে বাংলাভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এদেশের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বস্তু ও নবসংস্কৃতির পরিচয় পর্তুগিজ শব্দের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। যেমন—অঙ্গাতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, কেরানি, চাবি, কপি, আলকাতরা, তোয়ালে, জানালা, বোতল, বালতি, কামরা, বেহালা, পেঁপে, মিস্ত্রি, সাবান, গামলা, পেরেক, সাগু, তামাক ইত্যাদি।

ফরাসিরাও পর্তুগিজ ও ইংরেজদের মতো এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় কিছু ফরাসি শব্দও বাংলাভাষায় এসে গেছে। যেমন—কার্তুজ, কুপন, কাফে, রেস্তোরাঁ, রেনেশাঁস, বুর্জোয়া, আঁতাত, ম্যাটিনি, বিস্কুট, মেনু, ওমলেট ইত্যাদি।

সংখ্যালঘু ওলন্দাজ শব্দাবলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র তাসখেলার ক্ষেত্রেই সীমাবন্ধ হয়ে রয়েছে। যেমন—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ।

এগুলি ছাড়াও আরও কিছু বিদেশিভাষার শব্দ প্রধানত ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন—

রুশ ভাষা থেকে	—	সোভিয়েত, বলশেভিক, স্পুটনিক
ইতালীয় ভাষা থেকে	—	কোম্পানি, গেজেট, ম্যাজেন্টা, ফ্যাসিস্ট।
জার্মান ভাষা থেকে	—	নাৎসী।
স্পেনীয় ভাষা থেকে	—	কমরেড
চীনা-ভাষা থেকে	—	চা, চিনি
জাপানি ভাষা থেকে	—	রিকসা, জুজুৎসু
মালয়ী-ভাষা থেকে	—	গুদাম
বর্মী ভাষা থেকে	—	ঘুগনি, লুঙ্গি।

শব্দ সম্পদ হিসেবে বিদেশি এতগুলি ভাষার কাছে বাংলাভাষা ঋণী। কিন্তু শুধু এখানেই বিদেশি ভাষাগুলির ঋণদান থেমে থাকেনি। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে যুগোপযোগী এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে যুতসই নতুন শব্দ গড়ে নিতেও বাংলাভাষা কতবার কতরকমভাবে হাত বাড়িয়েছে বিদেশি ভাষার ভাণ্ডারে। আসুন, আমরা এবার বিচিত্র পথে আসা বিদেশি শব্দের প্রভাবটিকে দেখি—বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রে।

(ক) লিঙ্গান্তর সাধনে—ফারসি ভাষার প্রভাবে পাওয়া মদ্দা-কুকুর, মাদী-কুকুর।

(খ) প্রত্যয় হিসাবে— ফারসি 'আনা', 'গিরি', 'দার', 'বাজ', 'সই' প্রভৃতি যোগ করে তৈরি হয়েছে বিবিআনা, বাবুগিরি, কেরানিগিরি, বাজনদার, চালবাজ, ধড়িবাজ, মাপসই, টেঁকসই ইত্যাদি শব্দাবলি।

(গ) উপসর্গ হিসাবে—ফরাসি থেকে আগত উপসর্গ 'ফি', 'বে', 'গর' ইত্যাদি যোগে ফিসন, ফিহপ্তা, বেমানান, বেহাত, গররাজি, গরহাজির—এই জাতীয় শব্দগুলির উৎপত্তি। আবার ইংরেজি কিছু শব্দও এইভাবে উপসর্গের ভূমিকা পালন করে। যেমন—'হাফ্'-(হাফ-হাতা, হাফ্-আখড়াই), 'ফুল' (ফুল-হাতা, ফুল-মোজা) বা 'হেড' (হেড-পণ্ডিত, হেড মিস্ত্রী)।

(ঘ) সমাসবন্ধ পদগঠনে—ফারসি এবং ইংরেজি উভয় ভাষার কাছেই বাংলার ঋণ এ ব্যাপারে প্রায় সমান। আমাদের কথ্য বাংলাভাষায় প্রতিনিয়ত কত যে এই গোত্রীয় শব্দ আমরা ব্যবহার করে চলেছি। তা খুঁজে পেতে দেখলে চমকে যেতে হয়।

ফারসি প্রভাবজাত এরকম শব্দ—রাজা-উজির, হাট-বাজার, শাকসব্জী, ধন-দৌলত, কাগজপত্র, আইন-আদালত ইত্যাদি। ইংরেজি প্রভাবজাত এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে দেখতে পাবেন—মাস্টারমশাই, ডাক্তারবাবু, উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি শব্দগুলিকে।

(ঙ) ব্যাক্যাংশের আদি বর্ণ সমবায়ে 'শীর্ষক শব্দ' গঠনে—এ বিষয়ে ইংরেজির প্রভাব একচ্ছত্র বলা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করতে পারবেন। যেমন—বি.এ., এম.এ., গ.সা.গু, ল.সা.গু। এখনকার এম.এল.এ. বা এম. পি.-রাও এই একই ধারায় জাত।

শব্দভাণ্ডারের আসল সম্পদ হিসাবে আমরা এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলিকে অভিহিত করতে পারি। কারণ এতক্ষণের আলোচনা প্রসঙ্গো একটি বিষয় নিশ্চয় আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভাষার সজীবতা নিহিত রয়েছে ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারের মধ্যে, আর শব্দভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধিতে অন্যতম সহায়ক এই কৃতঋণ শব্দগুলি। মানুষের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য যত বেশি তাকে নিজের গণ্ডির বাইরে টেনে আনে, তত বেশি সে দেশ-দুনিয়ার সঙ্গো পরিচিত হয়। সেই নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত শব্দে কাজ না হলেই, অন্যভাষার থেকে লাগসই শব্দ সে খুঁজে নেয়, নিজের মতো করে তাকে গড়ে পিটে, উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক রূপে সাজিয়ে স্থায়ী আসন দান করে নিজের ভাষার ক্ষেত্রে।

22.5.1 সারসংক্ষেপ

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলি তিনটি ধারা থেকে আগত—(১) প্রাচীন প্রাগার্য অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটবর্মী ভাষাজাত, (২) ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাজাত এবং (৩) বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষাজাত যেগুলির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে ফারসি এবং ইংরেজি।

তবে এই তিনটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করুন—আমরা এই সবগুলি শব্দকেই প্রায় আমাদের নিজস্ব উচ্চারণপ্রবণতার ছাঁচে ঢেলে এমনভাবে নবরূপ দিয়েছি যাতে সেগুলিকে আর বহিরাগত বলে চেনাই যায় না। যেমন—

তুর্কি 'কোয়ামচি' > বাংলা 'কঞ্চি'

আরবি 'জালা-ওয়াতন' > বাংলা 'জ্বালাতন'

ফারসি 'খুল' + আরবি 'মাল' > বাংলা 'গোলমাল'

ফারসি 'আহিস্তা' > বাংলা 'আস্তে'

পর্তুগিজ 'আনান্' > হাংসা 'আনারস'

ইংরেজি 'লর্ড', 'ল্যাম্প', 'সেন্ট্রি' > বাংলা 'লাট', 'লম্ফ', 'সান্ত্রী'।

এমনভাবে চেহারা পাল্টে ফেলায় বিদেশি শব্দগুলিও আজ আর মূলভাষার কথা মনে পড়ায় না। উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা এই শব্দগুলির সঙ্গো এমনভাবে খাপ খেয়ে গেছে যে এগুলি বর্তমানে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেইকারণে বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-বিভক্তিও এগুলিতে যোগ করা হচ্ছে, যেমন—মাস্টারি, জজিয়তী, ডেপুটিপনা ইত্যাদি।

22.6 নবগঠিত শব্দ

সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবচেতনার প্রকাশোপযোগী শব্দেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বলব্ধ ভাষাজ্ঞানের থেকে তখন নতুন শব্দ তৈরি করে নেবার প্রবণতা দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন ইতিপূর্বে দেখেছেন 'প্রোথিত' শব্দটির উৎপত্তি। 'নিরঞ্জন' শব্দটির উৎসও অনেকটা তেমনি—নীরমঞ্জন (সং) > নীরজ্জণ (প্রা) > নিরঞ্জন। বাংলাভাষায় এইরকম আরও বেশ কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন—'বিধবা' শব্দের সাদৃশ্যে 'সধবা' ('ধব' অর্থ স্বামী ধরে নিয়ে), 'অতিরেক' ('অতিরিক্ত' অর্থে), কহতব্য, মোক্ষম, অতিষ্ঠ, আবাহন ইত্যাদি।

অনেক সময় আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ বা শব্দাংশ একত্র জুড়েও বাংলায় নবগঠিত শব্দাবলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এগুলিকে আমরা মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ (Hybrid Word) বলতে পারি। যেমন—

হেড (ইংরেজি) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেডপণ্ডিত

ফি (ফার্সি) + বছর (বাংলা) = ফি-বছর

দাদা (বাংলা) + গিরি (ফার্সি) = দাদাগিরি

বাবু (বাংলা) + আনা/আনী (ফার্সি) = বাবুয়ানা/বাবুয়ানী

জমি (বাংলা) + দার (ফার্সী) = জমিদার

নবগঠিত শব্দাবলির তৃতীয় ধারাটি মূলত অনুবাদ-প্রক্রিয়াজাত। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি প্রভাবিত নবসৃষ্ট এই শব্দগুলিকে বলা চলে অনুদিত ঋণ। এই শব্দগুলি শুনতে অনেকটা তৎসম শব্দের মতো হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানে এগুলির ঠাঁই নেই। কারণ এগুলি একান্তভাবে আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট। যেমন ধরুন—বিশ্ববিদ্যালয়, সিংহভাগ (Lion's Share) সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), পাদপ্রদীপ (Foot light) শীর্ষ সম্মেলন (Summit Conference)। কাঁদানে গ্যাস (Tear Gas), বাতিঘর (Light house), হাতঘড়ি (Wrist-watch) ইত্যাদি শব্দগুলিও এই একইরকমভাবে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত, তবে এগুলির আকৃতি তদ্ভব শব্দের মতো।

22.7 সারাংশ

এইবারে আসুন, সমগ্র এককটিতে আলোচিত বিষয়কে আর একবার আমরা ফিরে দেখি। দেশজ ও বৈদেশিক অবদানে বাংলাভাষার যে বৃহৎ শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তার একটি সারণি আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারি—

বাংলা শব্দভাণ্ডার

- মৌলিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শব্দাবলি
  - তৎসম শব্দ
    - সিদ্ধ
    - অসিদ্ধ
  - অর্ধতৎসম বা
  - তদ্ভব শব্দ
    - নিজস্ব তদ্ভব
    - কৃতঋণ বা বিদেশি তদ্ভব (দ্রাবিড়, অস্ট্রিক) ইত্যাদি
- আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দাবলি
  - দেশিশব্দ (দ্রাবিড়, অস্টিক ভোটবর্মী)
  - প্রাদেশিক শব্দ (হিন্দু, মারাঠী গুজরাটী, পঞ্জাবী)
  - বিদেশি শব্দ (ফারসি, ইংরেজি পর্তুগিজ, ফরাসি, রুশ, জার্মান, স্পেনীয়, চীনা, জাপানি ইত্যাদি
- নবগঠিত শব্দাবলি
  - ভুয়া শব্দ
  - মিশ্র বা সংকর শব্দ
  - অনূদিত বিদেশি শব্দ

মনে রাখবেন, শব্দভাণ্ডারের এই গড়ে ওঠা এক অনন্ত প্রক্রিয়া। ব্যাকরণের নিয়মবদ্ধতা এখানে সবসময় খাটে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনই এখানে শেষকথা। তাই সংবাদপত্রের সূত্রে, দেশি-বিদেশি সাহিত্যের সূত্রে, অধুনা দূরদর্শনের প্রভাবেও অহরহ নতুন শব্দ চলে আসছে আমাদের ভাষায়। এইভাবে বহু নদীধারাপুষ্ট সমুদ্রের মতোই বাংলা শব্দভাণ্ডারও দিনে দিনে স্ফীত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

22.8 অনুশীলনী

১। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন ঃ

(ক) সংকর বা মিশ্র শব্দ।

(খ) অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ।

(গ) অনূদিত কৃতঋণ শব্দ।

(ঘ) ভুয়া শব্দ।

২। নিম্নোক্ত শব্দগুলির উৎস নির্ণয় করুন ঃ

মানানসই, বেআক্কেলে, দাদাগিরি, হাঁসপাতল, লেডিকেনি, লামা, বাগান, গেরাহ্যি, সেমাখ, সোয়ামি, খড়গহস্ত, ঢেউ, ডাহা, ওজা, ইঁদারা।

৩। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ

(ক) কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ এবং কৃতঋণ / আগন্তুক শব্দ।

(খ) অসিদ্ধ তৎসম শব্দ এবং তৎসমকল্প 'ভুয়া' শব্দ।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ সম্পদ।

(খ) বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দাবলি।

(গ) নবগঠিত শব্দাবলি।

22.9 গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

২. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা।

NOTES